Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ

শিপ্রা সরকার
পিএইচ. ডি. গবেষক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
নিবন্ধন নম্বর : ৩২/২০১৯-২০ (পুন.)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. মো. আব্দুল মালেক
অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারি ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, 'বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত এ অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

(শিপ্রা সরকার)
পিএইচ. ডি. গবেষক
নিবন্ধন নম্বর : ৩২/২০১৯-২০ (পুন.)
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শিপ্রা সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি কিংবা প্রকাশ করেননি।

(ড. মো. আব্দুল মালেক)
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

ভূমিকা ॥ ১০

প্রথম অধ্যায় : প্রস্তাবনা ১৩

১.১ পটভূমি

১.২ সমস্যা নির্বাচন

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ গবেষণার পরিধি

১.৫ গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১.৬ প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ পর্যালোচনা

১.৭ অধ্যায়সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১.৮ অভিসন্দর্ভ-সংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রত্যয়ের সংজ্ঞার্থ

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণা পদ্ধতি ॥ ৩১

তৃতীয় অধ্যায় : নারীশিক্ষা : পটভূমি ও তাত্ত্বিক কাঠামো ॥ ৩৬

চতুর্থ অধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজমানস : প্রকৃতি ও বহুমাত্রিকতা ॥ ৬২

পঞ্চম অধ্যায় : উনিশ শতকে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান ॥ ৯৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা পরিস্থিতি ॥ ১২৬

সপ্তম অধ্যায় : নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্ম ॥ ১৫৭

অষ্টম অধ্যায় : নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও উদ্যোগের সামাজিক তাৎপর্য ও প্রভাব ॥ ২১৯

নবম অধ্যায় : আধুনিক জেন্ডার ধারণার নিরিখে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মের মূল্যায়ন ॥ ২৩১

গবেষণার ফলাফল ॥ ২৪৯

সুপারিশসমূহ ॥ ২৫৩

উপসংহার ॥ ২৫৫

পরিশিষ্ট ॥ ২৫৯

গ্রন্থপঞ্জি ॥ ৩১৯

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে 'বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ' বিষয়ে পিএইচ. ডি. গবেষণাকর্মে আমি যোগদান করি ২০১৫ সালের মার্চ মাসে। বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করতে প্রায় দুই বছর অতিরিক্ত সময় লেগে গেল। আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও প্রাক্তন পরিচালক ডক্টর মো. আব্দুল মালেক। অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডক্টর মো. আব্দুল মালেক-এর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, নির্দেশনা ও মীমাংসা আমার গবেষণাকর্মকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। গবেষণাকালে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও আমি ব্যবহার করেছি। গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডক্টর মো. আব্দুল মালেক-এর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম।

গবেষণাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী আমাকে যে উপদেশ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। গবেষণার শর্ত হিসেবে দুটি সেমিনার-প্রবন্ধ উপস্থাপন কালে যে-সব সম্মাননীয় শিক্ষক আমাকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যে-সব বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, চিন্তাবিদ এবং জেন্ডারতাত্ত্বিক আমাকে সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন, তাদের কাছে আমি জ্ঞাপন করি গভীর কৃতজ্ঞতা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজমানস ও নারীশিক্ষাচিন্তা বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক-চিন্তাবিদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান ও ডক্টর রফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর অনুপম সেন, কথাসাহিত্যিক ও জেন্ডার-বিশেষজ্ঞ সেলিনা হোসেন, প্রয়াত নারীনেত্রী আয়শা খানম, নারী-সংগঠক সীমা মোসলেম, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর পবিত্র সরকার, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর লায়েক আলী খান, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বেলা দাস, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর তপন মণ্ডল প্রমুখের নাম। এইসব বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। এঁদের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গবেষণাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই অভিসন্দর্ভের কম্পিউটার বর্ণবিন্যাসক রাগীব সাফওয়ানকে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমাকে এক বছরের শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। অভিসন্দর্ভ সমাপ্তির বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ-খবর নেওয়া এবং নানামাত্রিক সহযোগিতার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর মীজানুর রহমান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ফরিদা আক্তার খানম, অধ্যাপক ডক্টর লীমা হক, অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান প্রমুখকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা বিষয়ে আমি মোট এগারো জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। পরিশিষ্টে বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকারের বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে। যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, তাদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের নাম-পরিচয় অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করা হয়নি। কোন ছদ্মনামও নয়, ১ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী, ২ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী—এইভাবে তাদের পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন, তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিবারের সদস্যবর্গ আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের সহযোগের কথাও আমি সানন্দচিত্তে স্মরণ করছি।

(শিপ্রা সরকার)

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারমর্ম

উনিশ শতকে সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন মুক্তচিত্তদ্রোহী ও মানবতাবাদী চিন্তানায়ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কূপমণ্ডূক বাঙালি সমাজে তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবেই একজন আলোকিত মানুষ। রক্ষণশীল সমাজ-প্রতিবেশে আবির্ভূত হয়েও অনেকটা একক প্রচেষ্টায় তিনি যে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, প্রায় দু'শ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও এখনো তা আধুনিক ও প্রাগ্রসর বলে বিবেচিত হয়। প্রগতিশীল মানবতাবাদী এই সমাজসংস্কারক প্রধানত বাঙালি নারীর নানামাত্রিক কল্যাণ ও উন্নতির কথা চিন্তা করে আরম্ভ করেছিলেন তাঁর সংস্কার আন্দোলন। বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ—এসব ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, তারই অনুষঙ্গে তিনি বাঙালি নারীর শিক্ষার জন্য চিন্তা করেছেন এবং গ্রহণ করেছেন নানামাত্রিক উদ্যোগ।

সমাজসংস্কারের সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের কাছে অনিবার্যভাবে মুখ্য হয়ে উঠেছিল নারীশিক্ষার বিষয়টি। সমকালে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রভাবে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি সমাজে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীশিক্ষার বিস্তার। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার জন্য পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছেন একের পর এক বালিকা বিদ্যালয়। নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রচুর সময় দিয়েছেন, অর্থ ব্যয় করেছেন, সরকারের সঙ্গে নানামাত্রিক যোগাযোগ করেছেন। বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যেসব উদ্যোগ এককভাবে গ্রহণ করেছেন, আজকের দিনে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন মহান মানবতাবাদী চিন্তাবিদ। মানবতাবাদী চিন্তা তাঁর মানসস্রোতে ক্রিয়াশীল ছিল বলে মানুষকে তিনি মানুষরূপে বিবেচনা করেছেন, নারীকেও দেখেছেন মানুষরূপে। নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ে তিনি বিবেচনা করেননি, তাঁর ভাবনায় নারী আবির্ভূত হয়েছেন জেন্ডার দৃষ্টিকোণে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে রেখেই তিনি নারীকে বিবেচনা করেছেন। আচারনিষ্ঠ সনাতন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করলেও, আপন বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল সনাতন সংস্কারবিমুক্ত মন। একারণে সামাজিক স্রোতের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে নারীকে তিনি মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নারীর সামাজিক মুক্তির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগকে উদার নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে অনায়াসেই বিশ্লেষণ করা যায়। কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ, বিধবাবিবাহ চালু এবং বাল্যবিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

নিষিদ্ধের জন্য বিদ্যাসাগরের আন্দোলন উদার নারীবাদী চিন্তার সঙ্গে একান্তই সাদৃশ্যপূর্ণ। নারীশিক্ষার জন্য তিনি যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন, তা উদার নারীবাদী চেতনার বিশিষ্ট উদাহরণ। প্রচলিত সমাজকাঠামোর মধ্যে থেকেই নানামাত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথা সংশোধন ও পরিবর্জনের কথা ভেবেছেন বিদ্যাসাগর। বহুবিবাহ বন্ধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ এবং নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্ম প্রকৃত প্রস্তাবেই উদার নারীবাদী চেতনার সঙ্গে একান্তই অভিন্ন এবং সাদৃশ্যপূর্ণ।

নারীশিক্ষাকে বিদ্যাসাগর সমাজ-উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। শিক্ষার অভাবেই যে নারী পারিবারিক-সামাজিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে—একথা শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি প্রায়শই বলতেন। শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন যে পরস্পর সম্পর্কিত, একশ' পঁচাত্তর বছর আগেও সে-কথা অব্যর্থভাবে বুঝেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নারীমুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে তিনিই প্রথম শিক্ষাকে শনাক্ত করেছিলেন। অনেকটা আধুনিক জেন্ডারচেতনায় বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন নারীশিক্ষার ফলে বৃদ্ধি পায় নারীর পারিবারিক-সামাজিক ক্ষমতায়ন, নারীকে দাঁড় করায় তার নিজের মৃত্তিকার উপর—পুরুষের চোখ দিয়ে নয়, সে নিজের চোখ দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখতে পায়। বিদ্যাসাগর যে তাঁর সময়ের অগ্রবর্তী মানুষ ছিলেন, তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনার এসব বৈশিষ্ট্য সেকথাই প্রমাণ করে।

উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে যখন নারীশিক্ষা ছিল প্রায়-নিষিদ্ধ, তখন নারীশিক্ষার পক্ষে বিদ্যাসাগরের চিন্তার প্রাগ্রসরতা একুশ শতকের মানুষকেও বিস্মিত না করে পারে না। নারীশিক্ষা চিন্তায় গোটা এশিয়াতেই তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। উনিশ শতকের অবরুদ্ধ পরিবেশে বসে বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা বিষয়ে যে প্রাগ্রসর ভাবনা ভেবেছেন, একুশ শতকের নারীবাদী তাত্ত্বিকদের ভাবনার সঙ্গেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ নারীশিক্ষা ভাবনায় বিদ্যাসাগর অব্যাহতভাবে প্রাসঙ্গিক ও আধুনিক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনা রীতিমতো বিস্ময়কর।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১খ্রি.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষাচিন্তক। বিদ্যাসাগরের সকল কর্ম ও উদ্যোগের পশ্চাতে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর সমাজসংস্কার বাসনা। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তারও মূল প্রেরণা তাঁর সমাজসংস্কার চেতনা ও সামাজিক অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার একটা বড় অংশ জুড়েই রয়েছে তাঁর নারীশিক্ষা-বিষয়ক ভাবনা ও কর্মপ্রচেষ্টা। বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ অনুসন্ধানই বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

'বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ'-বিষয়ক এই অভিসন্দর্ভে 'উপসংহার' ব্যতীত মোট নয়টি অধ্যায় রয়েছে। 'প্রস্তাবনা' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, তাত্ত্বিক কাঠামো, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে গবেষণা পদ্ধতি উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নারীশিক্ষার পটভূমি ও তাত্ত্বিক কাঠামো বর্ণিত হয়েছে। নারীশিক্ষার সঙ্গে নারীবাদী চিন্তা ও আধুনিক জেন্ডারচেতনার মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তৃতীয় অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজমানস : প্রকৃতি ও বহুমাত্রিকতা'। এই অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের জীবনী, জীবনদর্শন, সমাজমানস, প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের জীবন-ইতিহাস ও মানসগঠনের প্রধান পর্বগুলো পর্যালোচনা করে তাঁর মানসতায় নারীশিক্ষা চিন্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম যথাক্রমে 'উনিশ শতকে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান' এবং 'উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা পরিস্থিতি'। এই দুই অধ্যায়ে উনিশ শতকে বাঙালি নারীর সামূহিক অবস্থা ও সামাজিক-পারিবারিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান শনাক্ত করার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ সমীক্ষার জন্য তাঁর সমকালীন বাঙালি নারীর সামাজিক-পারিবারিক অবস্থা ও অবস্থান পর্যালোচনা অতি জরুরি বিষয় বলে আমরা বিবেচনা করি। সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্ম'। এই অধ্যায়ের তিনটি অংশ রয়েছে। অংশগুলো এরকম—ক. বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা, খ. বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা, এবং গ. বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা-বিষয়ক কর্মোদ্যোগ। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে নারীশিক্ষা ভাবনা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। সমাজসংস্কারের পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি নারী জাতিকে প্রকৃত শিক্ষার আলোয়

Dhaka University Institutional Repository

আলোকিত মানুষ হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন, নারী শিক্ষিত হলেই সমাজ ক্রমে শিক্ষিত হয়ে উঠবে। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা বিষয়ে কেবল চিন্তাই করেননি, সে-চিন্তাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। নারীশিক্ষার জন্য তিনি একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, অনেক প্রতিষ্ঠানকে দান করেছেন পৃষ্ঠপোষকতা, নারীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর এসব উদ্যোগ উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের প্রেক্ষাপটে ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক। সে-আমলের চিন্তকসমাজ নারীকে যেখানে মানুষ হিসেবেই দেখতে পারেননি, সে-সময় বিদ্যাসাগর নারীদের জন্য নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করে তাঁর চিন্তার প্রাগ্রসরতাকেই তুলে ধরেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন কর্মযোগী মানুষ। তাই যে-কোনো চিন্তাকেই বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন। বস্তুত, নারীসমাজের শিক্ষা ও উন্নয়নই ছিল তাঁর কর্মযজ্ঞের প্রধান বিষয়। এ অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর নানামুখী কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত পরিচয় ও মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। 'নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও উদ্যোগের সামাজিক তাৎপর্য ও প্রভাব' শীর্ষক অষ্টম অধ্যায়ে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের উত্তরপ্রভাব আলোচিত হয়েছে। আধুনিক নারীশিক্ষাচিন্তা, জেন্ডারচেতনা এবং নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে প্রায় দু'শ বছর পূর্বে নারীর উন্নয়ন ও শিক্ষা বিষয়ে যে চিন্তা ও উদ্যোগ বিদ্যাসাগর গ্রহণ করেছেন, এখানে তা মূল্যায়নের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। নবম অধ্যায়ের শিরোনাম 'আধুনিক জেন্ডার ধারণার নিরিখে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মের মূল্যায়ন'। এ অধ্যায়ে আধুনিক জেন্ডারচেতনার আলোকে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মের মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষাচিন্তা-বিষয়ক বক্ষ্যমাণ গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। 'উপসংহার' অংশে উপস্থাপিত হয়েছে সমগ্র আলোচনার সারাৎসার।

ব্যক্ত হয়েছে যে, বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তা ও শিক্ষাভাবনার মধ্যে রয়েছে একটা নিবিড় সম্পর্ক। এ কারণে বর্তমান অভিসন্দর্ভে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ সন্ধান করতে গিয়ে আমরা তাঁর সমাজসংস্কার চেতনা এবং মানবভাবনার উপরও বিস্তৃত আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে, আমাদের মনে হয়েছে, দু'টি বিষয় পরস্পর সম্পর্কিত এবং পরিপূরক। বস্তুত, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার চেতনা এবং মানবভাবনাকে বাদ দিয়ে তাঁর নারীশিক্ষা চিন্তার কথা কল্পনা করা যায় না। বিদ্যাসাগর ছিলেন উনিশ শতকে বাঙালির সীমাবদ্ধ নবজাগরণের মানসসন্তান। নবজাগরণের প্রভাবে তাঁর চেতনায় দেখা দিয়েছিল মুক্তচিন্তা এবং নানামাত্রিক প্রাগ্রসর ভাবনা। নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর ভাবনার ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত অভিমত সমানভাবে প্রযোজ্য। এ কারণে বর্তমান অভিসন্দর্ভে বিদ্যাসাগরের মানসগঠন ও জীবনসাধনার উপর বিশদ আলোকপাতের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমকালে, তাঁর পূর্বকালীন এবং উত্তরকালীন শিক্ষাচিন্তকমণ্ডলী নারীশিক্ষা বিষয়ে কী ভেবেছেন, এখানে সে-সম্পর্কেও আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাবনার স্বকীয়তা সন্ধানে এ প্রসঙ্গটি জরুরি বলে আমাদের মনে হয়েছে। লক্ষ করা গেছে যে, সমকালে বা উত্তরকালে নারীসমাজের শিক্ষা বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো কোনো শিক্ষাচিন্তকই সেভাবে মনোযোগ দেননি। তবু, বিদ্যাসাগরের চিন্তার প্রাতিস্বিকতা সন্ধানে এ বিষয়টিও ছিল আমাদের সতর্ক সমীক্ষার অন্তর্গত। এ আলোচনা নারীশিক্ষা বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ অনুধাবনে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনার পাঠ (Text) গৃহীত হয়েছে কলকাতার তুলি-কলম প্রকাশিত *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড : ১৯৯৪ ; দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯৯৪) থেকে। কোনো-কোনো পাঠ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ* (ঢাকা : ২০০৪) কিংবা গোপাল হালদার সম্পাদিত *বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার*—১-৩ খণ্ড, (কলকাতা : ২০১১) থেকে সংকলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

১.১ পটভূমি

যে-সব বাঙালি চিন্তাবিদ শিক্ষার স্বরূপ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গভীর চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম। বস্তুত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সমাজচিন্তক। শিক্ষার স্বরূপ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষার সঙ্গে কর্ম ও জীবনের সম্পর্ক, নারীশিক্ষা, গণশিক্ষা, শিক্ষা ও উন্নয়ন এবং জাতিগঠনে শিক্ষার ভূমিকা এসব বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে তত্ত্ব ও মতবাদ প্রকাশ করেছেন, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো তা প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বিদ্যাসাগরের প্রাগ্রসর ও মানবতাবাদী সমাজচিন্তা বর্তমান কালেও সমান মাত্রায় চর্চাযোগ্য। নারীশিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে, শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নের প্রশ্নে, সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এখনো আমাদের পথ দেখাতে পারেন, তাঁর মতবাদ ও ভাবনা থেকে আমরা খুঁজে নিতে পারি শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক নানা তত্ত্ব ও সূত্র।

বাঙালি শিক্ষাচিন্তক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। তিনি ছিলেন মুক্তচিত্তদ্রোহী এবং প্রগতিশীল মানবতাবাদী সমাজচিন্তক। তাঁর শিক্ষাচিন্তা তথা নারীশিক্ষা চিন্তারও মূল বৈশিষ্ট্য ওই দ্রোহী মানসিকতা এবং প্রগতিশীল মানবতাবাদী সমাজভাবনা। জনশিক্ষা বিস্তারে তাঁর ঐতিহাসিক অবদান এক সময়ে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। এদেশের মানুষকে, বিশেষত নারীসমাজকে, প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করার জন্য বিদ্যাসাগর আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার মূল উৎস ছিল উনিশ শতকের বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট। আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় তিনি বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় নানামাত্রিক সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, মানবতাবাদ, ইহজাগতিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, আধুনিক জীবনচেতনা− বিদ্যাসাগরের মানসলোকের এসব বৈশিষ্ট্য তাঁর শিক্ষাচিন্তায় ছিল সদা ক্রিয়াশীল। বস্তুত, এসব বৈশিষ্ট্যই তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তার দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার চেতনা ও শিক্ষাচিন্তার মধ্যে রয়েছে এক গভীর আত্মিক সম্পর্ক। তাঁর সমাজ এবং শিক্ষাভাবনা বৃহৎ অর্থে মানবভাবনারই ভিন্নার্থক প্রকাশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজসংস্কারের জন্য তিনি শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন, বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন, স্থাপন করেছেন একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তায় শিশু ও নারীশিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পারিবারিক শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার একটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তায় ভারতের ঐতিহ্যিক জ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ উদ্দেশ্যেই তাঁর প্রণীত পাঠক্রমে ভারতের পাশাপাশি ইউরোপীয় গ্রন্থকেও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন (আব্দুল মালেক, ২০১২ : ৮৬)। জনশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যাসাগর এদেশের শিশু-কিশোরদের জন্য অনেক প্রাইমার বা শিশুশিক্ষার বই রচনা করেছেন। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণেরও চিন্তা করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শিক্ষকরা যাতে অধিকতর যোগ্য হয়ে ওঠেন, সে-জন্য তিনি চাকরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আধুনিক মনো-বৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতির ভাবধারার সঙ্গে, শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রশ্নে, বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে বহুমাত্রিক সাদৃশ্য রয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষা পদ্ধতি, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যশিক্ষা, নারীশিক্ষা, বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রভৃতি ধারায় বিদ্যাসাগর যে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনো তা আমাদের জন্য নানামাত্রায় প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার অব্যাহত এই প্রাসঙ্গিকতাই আধুনিক প্রাগ্রসর শিক্ষাচিন্তক হিসেবে তাঁকে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেয়।

উপনিবেশিত সমাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন আলোকিত মানুষ। বাঙালি হিন্দুসমাজের নানা কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূকতা দূর করার চিন্তা থেকে বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার কর্মযজ্ঞে উদ্যোগী হন। সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা থেকেই সমাজ-চিন্তাবিদ হিসেবে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। নারী-শিক্ষা ও নারী-উন্নয়ন, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ বন্ধ, বহুবিবাহ রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কর্ম ও সাধনা তাঁকে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজচিন্তক হিসেবে খ্যাতি এনে দিয়েছে। বাংলার নারীসমাজকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করার জন্য তিনি অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, কিংবা বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবোধ এবং যৌক্তিক জীবনাদর্শ ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সমাজের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য বিদ্যাসাগর বাংলার নারীসমাজের উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিদ্যাসাগর নারীদের দুর্দশা-দুরবস্থা দূরীকরণের যেমন চেষ্টা করেছেন, তেমনি নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারেরও প্রয়াস পেয়েছেন। নারীর মানসলোকে তিনি আধুনিকতার আলোক সঞ্চারের নানামাত্রিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের মানুষ হয়েও বিদ্যাসাগর নারীসমাজকে মানবিক পুঁজির একটি বিশাল সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মনে করতেন, নারীসমাজ শিক্ষিত হয়ে উঠলেই জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠবে। আজ থেকে অনেক পূর্বেই বিদ্যাসাগর উদার নারীবাদী তত্ত্ব (Liberal Feminism) ও সামাজিক জেন্ডারের দৃষ্টিকোণে নারীকে বিবেচনা করার আহ্বান

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়েছিলেন। নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ে না দেখে তিনি দেখেছেন সামাজিক জেন্ডার দৃষ্টিকোণে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তায় তাঁর নারী-বিষয়ক এইসব ভাবনা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। নারীশিক্ষা এবং নারী-উন্নয়নের জন্য বিদ্যাসাগরের প্রয়াসসমূহ বর্তমান কালের জন্যও প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন মানুষ তার মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠুক। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষার সুযোগ পেলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এ লক্ষ্যে তিনি নারীসমাজকে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জনতাত্ত্বিক পরিবর্তন, পারিবারিক আয় এসব ক্ষেত্রেও যে শিক্ষার ভূমিকা রয়েছে, তা অনুধাবন করেছিলেন। এ কালের শিক্ষা-তাত্ত্বিকেরা শিক্ষায় বেশি বিনিয়োগ স্বাস্থ্য ও আয়বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে যে মত প্রকাশ করেছেন (Grossman, www.quora.com)। সার্ধ-শত বছরেরও অধিককাল পূর্বে বাঙালি চিন্তাবিদ বিদ্যাসাগর তা উপলব্ধি করতে পেয়েছিলেন। কালোত্তীর্ণ শিক্ষাবিদ হিসেবে, প্রকৃত প্রস্তাবেই, বিদ্যাসাগরের অবদান ঐতিহাসিক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ও সমাজচিন্তা বিষয়ে ইতঃপূর্বে অনেক গবেষক নানামাত্রায় গবেষণা করলেও বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ বিষয়ে বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে উচ্চতর কোনো গবেষণা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ এ বিষয়টি বিস্তৃত গবেষণার দাবি রাখে। বিশেষত, একুশ শতকের এই নারী-জাগরণের সময়খণ্ডে প্রস্তাবিত বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যবহ বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রায় দু'শ বছর পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি নারীর সামূহিক উন্নতি এবং তাদের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের যে প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন, আধুনিক নারীশিক্ষাচিন্তা ও জেন্ডারচেতনার আলোকে সেসব প্রয়াস মূল্যায়নেরও সুযোগ রয়েছে। সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনে নারীর ক্ষমতায়ন বিশ্বজুড়ে আজ স্বীকৃতি পেয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। উনিশ শতকের মানুষ হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারী-জাগরণের জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর সেই চিন্তা আজকের দিনের জন্যও প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে।

১.২ সমস্যা নির্বাচন

নারী তথা সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার ভূমিকার কথা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। আজ থেকে সার্ধশত বছরেরও পূর্বে বাঙালি মনীষা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। যে সমাজে

নারীকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না, যে সমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে নারী শিক্ষা লাভ করলে গণিকা বা অসতী হয়ে যাবে– সেই সমাজের মানুষ হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা প্রচলনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন, রচনা করেছেন নারীর পাঠোপযোগী গ্রন্থ, আর্থিক দুরবস্থা থাকা সত্ত্বেও নারীশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ সচল রাখার জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, দ্বারে দ্বারে ঘুরে চাঁদা তুলেছেন, গ্রামের মানুষকে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়েছেন। উনিশ শতকে বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের এ প্রচেষ্টা ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক।

বর্তমান পৃথিবীতে নারীর বহুমাত্রিক জাগরণ ঘটেছে। কেবল শিক্ষা নয়, মানব-উন্নয়নের বিভিন্ন শাখাতেই নারীসমাজ রেখে যাচ্ছেন তাদের দক্ষতা, ক্ষমতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর। লেখাই বাহুল্য যে, উপযুক্ত এবং যুগোপযোগী শিক্ষার ফলেই নারীর সামূহিক জাগরণ সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য সমানভাবে প্রযোজ্য। নারীর সামূহিক জাগরণের ফলেই সামাজিক বিকাশের সকল সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি দৃশ্যমান। ভাবতে বিস্ময় লাগে, উনিশ শতকের জগদ্দল সমাজের মানুষ হয়েও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আজকের বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও গতিশীল করার প্রশ্নে নারীসমাজের জন্য যথার্থ শিক্ষা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ প্রেক্ষাপটে পূর্বসূরি বাঙালি শিক্ষাচিন্তাবিদগণ নারীশিক্ষা বিষয়ে কী ভেবেছেন কিংবা তারা কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা জানা অতীব জরুরি। সন্দেহ নেই, এ প্রসঙ্গে বাঙালি শিক্ষাচিন্তাবিদগণের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে উচ্চার্য। অথচ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতে হয় যে, বিদ্যাসাগরকে নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা হলেও, বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর কী ভেবেছেন কিংবা কী করেছেন তা নিয়ে বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে উচ্চতর কোনো গবেষণা হয়নি। আধুনিক নারীশিক্ষাচিন্তা ও জেন্ডারচেতনার আলোকে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ বিষয়ে পূর্বসূরি গবেষকবৃন্দ কোনো ধরনের আলোকপাতের চেষ্টা করেননি। উনিশ শতকের মানুষ হয়েও বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও কর্মোদ্যোগে যেভাবে সামাজিক জেন্ডারের দৃষ্টিকোণে নারীর শিক্ষা ও সামূহিক জীবনকে মূল্যায়ন করেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এ বিষয়ে গবেষণা করার সমূহ সুযোগ রয়েছে। শিক্ষা-বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি প্রস্তাবিত বিষয়টিও গবেষণার দাবি রাখে। এই উপলব্ধি থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ‘বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ’ বিষয়টি পিএইচ. ডি. গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন, দার্শনিক ভাবনা, সমাজসংস্কার চেতনা, নারীভাবনা, শিক্ষাচিন্তা এসব বিষয় নিয়ে পূর্বসূরি গবেষকবৃন্দ অনেক কাজ করেছেন, তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে অনেক বই। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলি এবং তাঁর জীবন ও কর্মের উপরে লেখা গবেষণাগ্রন্থ এবং অগ্রথিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠ করার পর আমাদের মনে হয়েছে প্রস্তাবিত বিষয়ে গবেষণা করার সুযোগ আছে। পূর্বসূরি লেখকদের গবেষণাকর্ম ও গ্রন্থাবলি পর্যালোচনা করে বর্তমান গবেষণাকর্মের বিষয় নির্বাচন করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

'বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ'-বিষয়ক বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

মূল উদ্দেশ্য

বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগকে শিক্ষা-সমাজতত্ত্ব এবং আধুনিক জেন্ডারচেতনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন।

বিশেষায়িত উদ্দেশ্য

ক. উনিশ শতকে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান শনাক্ত করা;

খ. উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষার পটভূমি বিশ্লেষণ করা;

গ. নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ, গৃহীত উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনা এবং উত্তর-প্রভাব মূল্যায়ন করা;

ঘ. আধুনিক নারীশিক্ষাচিন্তা ও জেন্ডারচেতনার আলোকে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষাচিন্তা ও কর্মোদ্যোগ মূল্যায়ন করা।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে যথার্থ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হলে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ইতিহাস এবং নারীশিক্ষা বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমরা মনে করি। উনিশ শতকের সমাজ প্রতিবেশে বসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা বিষয়ে যা ভেবেছেন এবং যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, সে-সূত্রে তাঁকে নবজাগরণের আলোকিত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করাও হবে বর্তমান গবেষণার একটা উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য।

১.৪ গবেষণার পরিধি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনকালে বাংলার সমাজে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্ম, শিক্ষা—ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা বর্তমান গবেষণাকর্মের পরিধি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রথমে তাঁর রচনাসমূহ পাঠ করে উদ্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত নানা দলিল-চিঠিপত্র-রিপোর্ট থেকে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগসমূহ শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনদর্শন ও রচনা পাঠ্যতালিকাভুক্ত। বর্তমান কালে নারীজাগরণের যে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা দিয়েছে, সে-প্রেক্ষাপটেও প্রস্তাবিত বিষয়টি সদর্থক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের মনে হয়। প্রস্তাবিত বিষয়ের উপর সফল গবেষণা সমাজের নানা ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিকতার উৎস হতে পারে।

১.৫ গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোকিত মানুষ। কালকে অতিক্রম করা তিনি এক কালোত্তীর্ণ প্রতিভা। তাঁর চিন্তা ও কর্মে রেনেসাঁস-উত্তর আধুনিক চেতনা ও মানবতাবাদী ভাবনার পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি ছিলেন বাঙালি সমাজের সর্বকালের অন্যতম সেরা সংস্কারক। সমাজসংস্কারের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই যেন বিদ্যাসাগরের জন্ম। প্রসঙ্গত সমালোচক লিখেছেন : 'তিনি [বিদ্যাসাগর] তাঁর বিজ্ঞান মনস্ক, বাস্তব, ইহজাগতিক ও মানবমুখীন চিন্তা ও কর্ম দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত বাঙালী সমাজে বিরাজমান সামাজিক ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা চালিয়েছেন। কৌলিক সংকীর্ণতার হাত থেকে বাঙালী সমাজকে মুক্ত করতে তিনি সমস্যার মর্মমূলে আঘাত হেনেছেন' (আব্দুল মালেক, ১৯৯২ : ৩)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সময়ের চেয়ে প্রাগ্রসর মানুষ। তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তার কথা একুশ শতকের এই শুভার্থী মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে গেলে বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। শিক্ষার অভাবকেই তিনি সমাজের অনুন্নয়নের প্রধান কারণ বলে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নারীশিক্ষার অভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। ব্রিটিশ-বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। নারীজাতির শিক্ষাকে তিনি বিশেষভাবে বিস্তারের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন নারীর কল্যাণ কামনায়। নারীর কল্যাণকে তিনি জাতির কল্যাণ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় সমালোচকের এই অভিমত : 'বাবা তো থাকতেন কলকাতায়। ফলে কড়া শাসন তেমন ছিল না। বরং বাবার অনুপস্থিতিতে মায়ের সঙ্গে তাঁর [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] মমতার গভীর বন্ধন তৈরি হয়েছিল। আমৃত্যু মায়ের প্রতি তাঁর মমতা ও ভক্তি ছিল প্রগাঢ়। শুধু তা-ই নয়, মায়ের জাত নারীর জন্য তাঁর সহানুভূতি ছিল অশেষ। আজীবন নারীর কল্যাণে কাজ করার প্রেরণা শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে উঠলেন নারী-কল্যাণের এক মহীরুহ' (আবুল মোমেন, ২০১৪ : ১২)।

Dhaka University Institutional Repository

জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলার কোনো দরকার নেই। তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল সব দেশেই নারীশিক্ষার জন্য এখন নেওয়া হচ্ছে নানামাত্রিক উদ্যোগ। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই ভাবতে বিস্ময় লাগে যে, সার্ধশত বছরেরও আগে বাঙালি পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের চেতনায় নারীশিক্ষার চিন্তা নির্ভুলভাবে দেখা দিয়েছিল। জাতীয় উন্নয়ন এবং নারীসমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যাসাগরের চিন্তা একুশ শতকের এই সময়খণ্ডেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বাংলাদেশে এখন নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের জন্য নেওয়া হচ্ছে নানামাত্রিক উদ্যোগ। এইসব উদ্যোগের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাবনা সম্পৃক্ত করতে পারলে একটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করা সম্ভব। সেদিক বিবেচনায় বক্ষ্যমাণ গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সব কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, এ কালে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তাহলে নিশ্চয়ই নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার জন্য আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। এ ধরনের চিন্তা বর্তমান সময়ের জন্যও একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক। এ বিষয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করা এখন বিশেষ জরুরি। সে-দৃষ্টিকোণে বিচার করলেও বর্তমান গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

১.৬ প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ-পর্যালোচনা

সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক—নানা কারণেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি সমাজে সমধিক পরিচিত একজন মানুষ। সে-কারণে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমান গবেষণাকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ সম্পর্কে এখানে একটি পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মে বিদ্যাসাগরের জীবন সম্পর্কে মোট সাতটি গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলো হচ্ছে : বিহারীলাল সরকারের *বিদ্যাসাগর* (১৮৯৫), ঋষি দাসের *বিদ্যাসাগর* (১৯৭১), এস. কে. বোসের *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* (১৯৭২), বিপ্রদাস বড়ুয়ার *বিদ্যাসাগর* (১৯৮৮), অমিয়কুমার সামন্তের *বিদ্যাসাগর* (২০০৪), অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিদ্যাসাগর* (২০১১) এবং আবুল মোমেনের *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* (২০১৪)। এসব গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের জীবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর শিক্ষাভাবনা তথা নারীশিক্ষাচিন্তার পরিচয়।

বিহারীলাল সরকারের *বিদ্যাসাগর* একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বিহারীলালের *বিদ্যাসাগর*। অবতরণিকা এবং পরিশিষ্ট ছাড়াও এই গ্রন্থে রয়েছে পঁয়তাল্লিশটি অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাসাগরের জন্ম ও বংশ-পরিচয়, শিক্ষা, সমাজসংস্কার আন্দোলন, কর্ম ও সাহিত্যজীবন, চরিত্রবৈশিষ্ট্য—ইত্যাদি বিষয় এখানে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। উত্তরকালে যারাই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে গবেষণা করেছেন, সকলেই এই গ্রন্থটিকে আকর উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা থাকলেও, নারীশিক্ষাচিন্তা এবং নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে এখানে তেমন কোনো তথ্য বা আলোচনা পাওয়া যায় না। বর্তমান অভিসন্দর্ভে বিদ্যাসাগরের জীবনের অনেক তথ্য আলোচ্য গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের মানসবৈশিষ্ট্য ও কর্ম সম্পর্কে ঋষি দাসের *বিদ্যাসাগর* একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এখানে স্বল্প-পরিসরে বিদ্যাসাগরের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের একটি সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক। সমকালীন সমাজ-প্রবণতার জন্য বিদ্যাসাগর যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেননি, সে-কথা লেখক ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

> বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা তাঁদের একটি অতি প্রয়োজনীয় ভূমিকা কালের রঙ্গমঞ্চে সাধন ক'রে গেছেন—তা যতোই সীমাবদ্ধ হ'ক। বিদ্যাসাগরের চিন্তা-ভাবনার যে সীমাবদ্ধতা তার জন্য তাঁর যুগই দায়ী ছিল। নিজের যুগকে কেউ-ই অতিক্রম করতে পারেন না, তিনি যতোই প্রতিভাবান হ'ন। তাই বিদ্যাসাগরও পারেননি (ঋষি দাস, ১৯৭১ : ভূমিকা)।

ঋষি দাসের আলোচ্য গ্রন্থে নারীর জন্য, নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন কর্মোদ্যোগের কথা সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হয়েছে। বিশেষত, যেসব নারী-প্রতিষ্ঠান চালানোর কাজে বিদ্যাসাগর পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এই গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদী চেতনা গভীর ব্যঞ্জনায় বিশ্লেষিত হয়েছে। মানুষের প্রতি বিদ্যাসাগরের সংযোগসূত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ঋষি দাসের মন্তব্য এখানে উদ্ধরণযোগ্য : 'বিশাল বনস্পতি তার শির আকাশে উচ্চ করে থাকতে পারে তার মূল মৃত্তিকার গভীরে সঞ্চারিত থাকে ব'লেই। বিদ্যাসাগরের মহিমাও আকাশস্পর্শী হয়েছিল তাঁর হৃদয়ের বন্ধন মাটির কাছাকাছি মানুষদের সঙ্গে সুদৃঢ় ছিল বলেই।' (ঋষি দাস, ১৯৭১ : ১১৩)

এস. কে. বোসের *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* এবং বিপ্রদাস বড়ুয়ার *বিদ্যাসাগর* গ্রন্থদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনী। এই দুটো গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের নানা ঘটনা ও তাঁর কীর্তি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এস. কে. বোস গতানুগতিক কোনো জীবনী লেখেননি। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক বাস্তবতায় বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন। যেমন, বিধবা বিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগরের অবস্থান মূল্যায়ন করতে গিয়ে এস. কে. বোস লিখেছেন : 'বিদ্যাসাগর দুটি কঠিন সমস্যার সামনে এসে দাঁড়ালেন—একদিকে সংস্কারবাদের তরঙ্গ, অন্যদিকে কঠোর গোঁড়ামী। পথ বেছে নেওয়া সহজ

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। প্রগতির পথ নেবেন কি প্রগতি বিরোধের পথ নেবেন! বিদ্যাসাগর প্রথম পথটাই বেছে নিলেন। তিনি স্থির করলেন যে, বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত সে কথা তিনি প্রমাণ করবেন' (এস. কে. বোস, ১৯৭২ : ২৩)। অন্যদিকে, বিপ্রদাস বড়ুয়া বিদ্যাসাগরের নানামুখী ভাবনা সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে। বিদ্যাসাগরের মানবভাবনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিপ্রদাস লিখেছেন : 'কোনো ধর্মমতকে বিদ্যাসাগর নিন্দা করেননি, প্রশংসাও করেননি। নিছক ধর্মমতের জন্য কারো ওপর তিনি সন্তুষ্টও হননি, বিরূপও হননি। মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেছেন তিনি। জাত ও ধর্মের চেয়ে মানুষই তাঁর কাছে বড় ছিল' (বিপ্রদাস বড়ুয়া, ১৯৮৮ : ৩৬-৩৭)। আবুল মোমেনের *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের বিশদ পরিচয় সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে গাল-গল্পের চেয়ে মূল্যায়ন প্রাধান্য পেয়েছে। মূল্যায়নে আবুল মোমেন নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। নবজাগরণের মানস-প্রতিনিধি বিদ্যাসাগরের ভূমিকা নির্দেশ করতে গিয়ে আবুল মোমেন যা লিখেছেন, এ প্রসঙ্গে তা উদ্ধৃত করা যায় :

> বাংলার যে নবজাগরণের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় হয়েছিল, তার কুশীলবদের প্রায় সবাই ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা এবং প্রায় ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। বিদ্যাসাগর একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি এসেছেন প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে। কিন্তু নবজাগরণের সংগঠকদের মধ্যে তিনি ব্যতিক্রমী ও অনন্য সে কারণে নয়, অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে তাঁর একক ভূমিকা ছিল বাঙালির আধুনিক সমাজ গঠনে যুগান্তকারী। সে তিনটি ক্ষেত্র আমরা জানি—বাংলা গদ্য ও সাহিত্যের বিকাশ, বাংলায় আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, বিধবাবিবাহ, নারীশিক্ষাসহ নারীর অনুকূলে সমাজসংস্কার (আবুল মোমেন, ২০১৪ : ৫৩)।

অমিয়কুমার সামন্তের *বিদ্যাসাগর* গ্রন্থটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম। আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে লেখক বিদ্যাসাগর ও ঔপনিবেশিক প্রশাসন, বিদ্যাসাগর ও নারীমুক্তি, লেখক-ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগরের বাড়ি, বিদ্যাসাগর ও ডিরোজিয়ানগণ, বিদ্যাসাগরের অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের জগৎ, বিদ্যাসাগরের পারিবারিক জীবন ও উত্তরাধিকারের সমস্যা, বিদ্যাসাগরের পৌরুষ—ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পরিশিষ্ট অংশে সংযুক্ত হয়েছে বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত নানা তথ্য ও দলিলপত্র, যা বিদ্যাসাগর-গবেষণায় উত্তরকালের গবেষকদের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। নারীমুক্তি বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মোদ্যোগকে অমিয়কুমার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নারীমুক্তি প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের অবদান মূল্যায়ন করতে গিয়ে অমিয়কুমার সামন্তের বিশ্লেষণ এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> সতীপ্রথা, অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তান হত্যা, পরিবারে কন্যাসন্তানের অবহেলা, বিধবার অশেষ শারীরিক যন্ত্রণা ও অকালমৃত্যু ইত্যাদির ফলে বহুদিন ধরে ভারতীয় সমাজে নারীদের দৈহিক অস্তিত্বই ছিল সঙ্কটাপন্ন। ...এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

> নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। প্রথমদিকে ন্যূনতম পারিবারিক প্রয়োজনেই নারীশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল; সত্তরের দশকে অবশ্য উচ্চশিক্ষার দ্বারও অবারিত হয়। বিদ্যাসাগর এই ব্যবস্থাকে শুধু সমর্থনই করেননি, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে তিনি অভিনন্দিত করেছিলেন। পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারের প্রশ্ন তখনও অনালোচিত। কিন্তু সেই সময়েই সম্পত্তিতে নারীর অধিকার এবং নারীর তথাকথিত সতীত্বকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের নিয়ামকরূপে স্বীকার না করে নারীর অধিকার ও মর্যাদাবোধে একটি অন্য মাত্রা যোগ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমানাধিকারের দাবি উচ্চারণ করেছিলেন নারী আন্দোলনের অগ্রণী মহিলারাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগর নারীর কল্যাণে ব্যক্তিগত উদ্যাগে যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাতে সমানাধিকারের স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। (অমিয়কুমার সামন্ত, ২০১২ : ১০৪)

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বিদ্যাসাগর* গ্রন্থটিও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের শৈশবজীবন, শিক্ষাজীবন, সমাজসংস্কার আন্দোলন, নারীভাবনা, ধর্মচিন্তা ও দেশপ্রেমের কথা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন আকর গ্রন্থ থেকে তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করে অনিলচন্দ্র লিখেছেন আলোচ্য গ্রন্থ। ফলে উত্তরকালীন গবেষকদের কাছে অনিলচন্দ্রের *বিদ্যাসাগর* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে আদৃত হয়েছে। নারী-শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ধারণা অনিলচন্দ্র তুলে ধরেছেন এভাবে : 'হিন্দুসমাজে একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রনিষিদ্ধ। বিদ্যাসাগর এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য এক বিচিত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। মনু বলেছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' (পুত্রের মত কন্যাকেও সযত্নে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে)। দূর থেকে বেথুন স্কুলের ছাত্রীদের আনার জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ী ছিল। বিদ্যাসাগর সেই গাড়ীর পাশে ঐ শাস্ত্রবচনটি খোদাই করে দিলেন। বই বা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে অথবা বক্তৃতা করে শাস্ত্রের নির্দেশ এত কার্যকরভাবে প্রচার করা সম্ভব হত না। হিন্দুসমাজকে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল থেকে মুক্ত করতে হলে বিশুদ্ধ যুক্তির পাশাপাশি তাঁর সমার্থক শাস্ত্রবচন উপস্থিত করতে হবে, একথা বিদ্যাসাগর জানতেন। বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রসঙ্গে তিনি এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন।' (অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১ : ১১৯)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারা ও কর্মের মূল্যায়নধর্মী যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বিনয় ঘোষের *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (১৯৭৩) গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর-গবেষণায় এটি আকর গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-পটভূমিতে কেমন করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো অনন্যসাধারণ মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হলো, বিনয় ঘোষ ইতিহাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা বিশ্লেষণ করেছেন বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিনয় ঘোষের এই গ্রন্থ সে-যুগের বাঙালি সমাজের পরিচয়জ্ঞাপক অমূল্য দলিলের মর্যাদা পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের জীবন-ইতিহাসের পাশাপাশি

তাঁর শিক্ষাচিন্তা, নারীভাবনা, সমাজসংস্কার বাসনা, সাহিত্য ও ভাষাশিল্পী এবং মানবতাবাদী বিশ্ববীক্ষা বিশদভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক অবদানের কথা বলতে গিয়ে বিনয় ঘোষ যা বলেছেন, এ প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে :

> ...রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল যুগের আদর্শকে বিদ্যাসাগর বাস্তবে পরিণত ক'রে তার সার্থক পরিণতির পথ দেখিয়েছিলেন। এইখানেই বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনের ও আদর্শের ঐতিহাসিক সার্থকতা। বহুবিবাহ আইনত রহিত করার প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। বিধবাবিবাহও সমাজে তেমনভাবে প্রচলিত হয়নি তখন, আজও হয়নি। সেদিক দিয়ে তাও অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। কিন্তু কোনো গতিশীল সামাজিক আদর্শের সংগ্রামের ব্যর্থতা কেবল তার সাময়িক অনুষ্ঠানের ফলাফল দিয়ে বিচার করা যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনের 'হিউম্যানিস্ট' বা মানবমুখিন আদর্শ যেমন তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে তেমনি তাঁর সাহিত্যকর্মে, শিক্ষাসংস্কারে এবং সমাজকল্যাণের গণতান্ত্রিক কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্র সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি। সেইখানেই তাঁর আসল ঐতিহাসিক সার্থকতা (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৪৩০)

বদরুদ্দীন উমরের *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ* (১৯৭৪) বিদ্যাসাগরের চিন্তাজগৎ ও সমাজকর্ম বিশ্লেষণের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বদরুদ্দীন উমর দুটো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রচনা করেছেন বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ। প্রথমত, মার্কসবাদী তত্ত্বের আলোকে ও মার্কসবাদী পদ্ধতিতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটা সংক্ষিপ্ত সামগ্রিক মূল্যায়ন করা। দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের সামাজিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত নানা সামাজিক চিন্তা ও সংস্কার আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন কীভাবে মধশ্রেণির চিন্তাকে গঠন করে তুলেছে, তা ব্যাখ্যা করা। এই উভয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে বদরুদ্দীন উমর মেলাতে চেয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্ম ও সাধনাকে, তাঁর চিন্তন-প্রক্রিয়াকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ইতি-নেতি চিন্তাভাবনার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ শেষে বদরুদ্দীন উমর অন্তিম মন্তব্য করেছেন—'...উনিশ শতকের বাঙলাদেশের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর প্রগতিশীলতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭০ : ৮৮)।

সফিউদ্দিন আহমদের *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা* (২০০৬) গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের নানাবিধ চিন্তাভাবনা বিশ্লেষিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও শিক্ষাভাবনা বিশ্লেষণই এই গ্রন্থে রচয়িতার মূল উদ্দেশ্য ছিল। নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকে লেখক গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। নারীশিক্ষা নিয়ে উনিশ শতকের কলকাতায় যখন ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক চলছে, বিদ্যাসাগর তখন একাগ্রচিত্তে নারীশিক্ষা বিস্তারে নিজের কাজ করে চলেছেন। এ প্রসঙ্গেই সফিউদ্দিন আহমদ লিখেছেন—'বাংলাদেশে নারীশিক্ষা আন্দোলন নিয়ে যখন...তোলপাড়—বিদ্যাসাগর তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাংলাশিক্ষা প্রচার ও প্রসার কল্পে মডেল স্কুল স্থাপন এবং যোগ্য বাংলা শিক্ষক নিয়োগে ব্যস্ত আর অন্যদিকে

নারীশিক্ষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন' (সফিউদ্দিন আহমদ, ২০০৫ : ১৪৬)। সমাজসংস্কার বাসনার পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও ভাষাচিন্তা বিশ্লেষণও আলোচ্য গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত *বিদ্যাসাগর* (২০১১) গ্রন্থে বারো জন লেখকের চৌদ্দটি রচনা পত্রস্থ হয়েছে। গ্রথিত রচনাগুচ্ছে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও সাধনার নানাদিক বিশ্লেষিত হলেও নারীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ও কর্মোদ্যোগ বিষয়ে তেমন কোনো বিশ্লেষণ এখানে পাওয়া যায় না। তবে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর : সংস্কারক এবং শিল্পী' প্রবন্ধটিতে নারী-উন্নয়ন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাবনা চকিতে উদ্ভাসিত হয়েছে এভাবে—'লক্ষ করবার বিষয় বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন মুখ্যত ছিল নারীমুক্তি আন্দোলন। মানবের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নারী-সমাজকে ন্যায্য অধিকার দিয়ে বিদ্যাসাগর প্রকৃতপক্ষে নতুন দেশ গঠনের পথ প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন।' (গোলাম মুরশিদ, ২০১১ : ৪৪)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে Ashim Mukhopadhyay-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *The Golden Book of Vidyasagar* (1993) শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারকগ্রন্থ। দেশি-বিদেশি অনেক লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে নানা তথ্য ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভূমিকায় সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় যা লিখেছেন, তা থেকে গ্রন্থটির মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> The Golden Book of Vidyasagar provides a proof, if at all a proof is needed, of the relevances of Vidyasagar even after one hundred years of his death. We cannot but wonder at the advent in Bengal of such a modern man in the mid-nineteenth century. In those days several persons were awarded the title 'Vidyasagar' but to the people of India this appellation refers to Iswarchandra alone. A number of biographies of Vidyasagar have been written, and they have given us a wealth of information. But it seems that they are not sufficient to unfold the versatile personality that Vidyasagar was. Hence, this attempt to publish *The Golden Book of Vidyasagar*. (Ashim Mukhopadhyay, 1993 : Foreword)

Asok Sen-এর *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones* (2016) বিদ্যাসাগরের জীবনদর্শন ও কর্মসাধনা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অশোক সেন আর্থ-সামাজিক-

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের নানামাত্রিক চিন্তা ও কর্মোদ্যোগকে আলোচ্য গ্রন্থে মূল্যায়ন করেছেন। বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের উত্তরপ্রভাব সম্পর্কে অশোক সেন লিখেছেন :

> ...things were not what they appeared to Vidyasagar in his perspective of humanism and national order. Here Vidyasagar was entangled in a causality which he could not fully clarify, but whose effects destroyed his ideals. The fact of the British empire troubled intellectual upbringing in nineteenth-century Bengal. Reason for the unproductive few was mixed up with unreason for the productive multitude. This was so not merely because the toiling peasantry and workmen suffered ; their deprivation has borne the cross of many other enlightenments in history. In this case, they suffered not for nothing. Reason was thereby denuded of its social significance. Vidyasagar entered this world of anomalies, while believing he entered a world of potential reason. He thus found himself wandering on a deceptive road, where reason was reduced to mimicry. Vidyasagar boldly endealvoured to improve the fruits of enlightenment, but without fully comprehending or being able to remove the primal sources of their mangling. All his milestones had been elusive. (Asok Sen, 2016 : 165)

নারীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ বিষয়ে গবেষণার জন্য নারীবাদ-বিষয়ক গ্রন্থ পর্যালোচনাও অনিবার্য হয়ে ওঠে। বর্তমান গবেষণার জন্য নারীবাদ-বিষয়ক অনেক গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Mary Wollstonecraft-এর *A Vindication of the Rights of Woman* (1792), John Stuart Mill-এর *The Subjection of Women* (1869), Simone de Beauvoir-এর *The Second Sex* (1949), Kate Millet-এর *Sexual Politics* (1978), Shulamith Firestone-এর *The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Revolution* (1970), Kira Cochrane-এর *All the Rebel Women : The Rise of the Fourth Wave of Feminism* (2013) প্রভৃতি গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে নারীবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বহুমাত্রিক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

Mary Wollstonecraft-এর *A Vindication of the Rights of Woman* গ্রন্থে নারীবাদ সম্পর্কে প্রথম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নির্মিত হয়েছে। নারীকে অধিকারবঞ্চিত ও অশিক্ষিত রেখে সমাজ যে অগ্রসর হতে পারে না, একথা Mary Wollstonecraft-ই প্রথম ঘোষণা করেন। তিনিই প্রথম ব্যাখ্যা করেন কীভাবে দূর করা যায় নারী-পুরুষের অসাম্য। নারীমুক্তির পথে নানামাত্রিক সামাজিক বাধা এবং নারীর অধস্তনতার কারণগুলো Wollstonecraft-এর রচনাতেই প্রথম শনাক্ত হয়। বস্তুত, Wollstonecraft-এর ব্যাখ্যার মধ্য দিয়েই উদার নারীবাদী ভাবনার তাত্ত্বিক কাঠামো প্রথম রচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকে নারীবাদী তত্ত্ব বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন John Stuart Mill (১৮০৬-১৮৭৩)। লিঙ্গসমতা আনয়নের ক্ষেত্রে Mill-এর *The Subjection of Women* উন্মোচন করে নারীমুক্তির নতুন দিগন্ত। Wollstonecraft-এর মতো Mill-ও নারীদের শিক্ষার অধিকার, ভোটের অধিকার, সম্পত্তির অধিকারসহ প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রসমূহে নারীদের জন্য সমান সুযোগ লাভের দাবি উত্থাপন করেন। বস্তুত তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই যুক্তরাজ্যে নারীদের ভোটাধিকার আইনি স্বীকৃতি লাভ করে। জন স্টুয়ার্ট মিলই প্রথম পুরুষ-দার্শনিক যিনি ভিক্টোরীয় সমাজে নারীর সমতার জন্য লেখনি ধারণ করেছেন। মিল তাঁর গ্রন্থে একথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মানবপ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে অধীনতার সংস্কৃতি। নারীকে এই অধীনতা থেকে তিনি মুক্তি দিতে চেয়েছেন। নারীকে অধস্তন রেখে তার উপর শক্তি ও পরাক্রম প্রয়োগের তীব্র বিরোধিতা করেছেন জন স্টুয়ার্ট মিল।

Simone de Beauvoir-এর *The Second Sex* নারীবাদ-বিষয়ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক গ্রন্থ। নারীবাদের মৌল দর্শন বলতে গিয়ে এই গ্রন্থে Beauvoir লিখলেন এই ঐতিহাসিক উচ্চারণ : 'One is not born, but rather becomes, a woman.' (Simone de Beauvoir, 1974 : 17)। নারীর হারিয়ে যাওয়া অস্তিত্বকে পুনরায় আবিষ্কারের সাধনায় Simone de Beauvoir-এর এই বই সঞ্চার করেছে বিপুল শক্তি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে Simone de Beauvoir সমগ্র পৃথিবীতে নারীবাদী ভাবনার ক্ষেত্রে নতুন প্রতিবাদী আন্দোলন সৃষ্টি করেন। লৈঙ্গিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেভাবে সমাজে নারীদের দুর্বল জীবে পরিণত করেছে, Simone de Beauvoir অত্যন্ত জোরালোভাবে তার মনস্তাত্ত্বিক এবং ইতিহাসগত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে।

Sexual Politics গ্রন্থে Kate Millet সংস্কৃতি ও রাজনীতির গভীরে প্রোথিত পরাক্রমশীল পুরুষতন্ত্রের আসল পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন প্রবল হয়ে ওঠা এই পুরুষতন্ত্রকে অস্বীকার করার জন্য নারী-বিপ্লব সংঘটন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। Millet-এর ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী ধারা বিকাশ লাভ করে। Millet তাঁর ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বিপ্লব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকেই পাল্টে দিলেন—তাঁর মতে বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে নারী আর পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা দূর করা।

Shulamith Firestone নারীবাদ সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা দিলেন *The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Revolution* গ্রন্থে। বস্তুত, এই গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়েই নারীবাদের তৃতীয় ঢেউয়ের যাত্রা শুরু। Millet-এর মতো Firestone-ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নারী-বিপ্লবের কথা উচ্চারণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন তাঁর গ্রন্থে। তিনি মনে করেন লৈঙ্গিক বিভাজনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নারীকে বঞ্চিত রাখার মূল উৎস। তাই দূর করতে হবে এই লৈঙ্গিক বৈষম্য। এবং সে-জন্য প্রয়োজন নারী-বিপ্লব।

Kira Cochrane-র *All the Rebel Women : The Rise of the Fourth Wave of Feminism* গ্রন্থ নারীবাদের বিকাশে রাখে উল্লেখযোগ্য অবদান। Cochrane-র এই বই প্রকাশের মধ্য দিয়েই নারীবাদের চতুর্থ ঢেউয়ের যাত্রা শুরু হয়। তিনি বলতে চেয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব-নব আবিষ্কার মানুষকে এমন এক যুগে নিয়ে যাবে সেখানে অবলুপ্ত হবে নারী ও পুরুষ বিষয়ক বৈষম্যমূলক ধারণা।

বিদ্যাসাগরের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও প্রাসঙ্গিক আরও অনেক বই পর্যালোচনা করা হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য। উল্লেখ্য, সেসব গ্রন্থ সরাসরি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত নয়, প্রসঙ্গক্রমে তাঁর কর্ম ও চিন্তা সেখানে উল্লেখিত হয়েছে।

১.৭ অধ্যায়সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘প্রস্তাবনা’। এ অধ্যায়ে গবেষণার সমস্যা-নির্বাচন, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘গবেষণা পদ্ধতি’। বর্তমান অভিসন্দর্ভে গবেষণা পদ্ধতি এই অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘নারীশিক্ষা : পটভূমি ও তাত্ত্বিক কাঠামো’। এ অধ্যায়ে আধুনিক নারীশিক্ষার শিক্ষা-সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নারীশিক্ষার সঙ্গে নারীবাদী চিন্তা ও আধুনিক জেন্ডার ধারণার মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তাও এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজমানস : প্রকৃতি ও বহুমাত্রিকতা’ শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের জীবনদর্শন, কর্ম ও সাধনা, তাঁর সমাজমানসের প্রকৃতি ও বহুমাত্রিকতা—ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের জীবন-ইতিহাস ও মানসগঠনের প্রধান পর্বগুলো পর্যালোচনা করে তাঁর মানসতায় নারীশিক্ষা চিন্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ কীভাবে অনুপ্রবিষ্ট হল, তা শনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘উনিশ শতকে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান’। এ অধ্যায়ে উনিশ শতকে বাঙালি নারীর সামূহিক অবস্থা ও সামাজিক-পারিবারিক প্রেক্ষাপটে তাঁদের অবস্থান বিশ্লেষণ করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান প্রথা, জাতিভেদ প্রথা—এসব প্রবণতা উনিশ শতকে বাঙালী নারীর সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা কীভাবে ক্ষুণ্ন করেছে, এ অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম 'উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা পরিস্থিতি'। এ অধ্যায়ে উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রচল রক্ষণশীল সমাজের জড়তা ভেঙ্গে উনিশ শতকে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সূচিত হয়েছিল, তা এ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্ম'। এ অধ্যায়ে নারীশিক্ষা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও তাঁর গৃহীত উদ্যোগসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে।

'নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও উদ্যোগের সামাজিক তাৎপর্য ও প্রভাব' শীর্ষক অষ্টম অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাবনা, নারীশিক্ষা-বিষয়ক উদ্যোগ ও তার সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আরও আলোচিত হয়েছে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের উত্তরপ্রভাব।

'আধুনিক জেন্ডার ধারণার নিরিখে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মের মূল্যায়ন' শীর্ষক নবম অধ্যায়ে আধুনিক নারীশিক্ষা চিন্তা, জেন্ডার ধারণা এবং নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে সার্ধ-শত বছর পূর্বে নারীর উন্নয়ন ও শিক্ষা বিষয়ে যে চিন্তা ও উদ্যোগ বিদ্যাসাগর গ্রহণ করেছিলেন, তা মূল্যায়নের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

'উপসংহার' অংশে উপস্থাপিত হয়েছে সমগ্র আলোচনার সারাৎসার।

১.৮ অভিসন্দর্ভ-সংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রত্যয়ের সংজ্ঞার্থ

নারীশিক্ষা

যে-কোনো সমাজে মোট জনগোষ্ঠীর কম-বেশি অর্ধেক মানুষ নারী। এই নারী-জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য যে ব্যবস্থা ও পদ্ধতি একটি দেশ অনুসরণ করে, সহজ কথায় তা-ই নারীশিক্ষা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সময়খণ্ডে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়নি, স্বীকার করা হয়নি তার পড়ালেখা করার প্রয়োজনীয়তা। পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই নারীকে একসময় কল্পনা করা হয়েছে সন্তান উৎপাদন এবং লালন-পালনের একটা বস্তু হিসেবে—তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা থেকেছে

উপেক্ষিত। এই পরিস্থিতিতে নারীর শিক্ষার কথা কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। তবে এ অবস্থার পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই নারীশিক্ষা বিষয়ে কিছু কিছু ভাবনা ও প্রয়াসের কথাও এখানে স্মরণ করতে হয়। সমাজ যতই অগ্রসর ও উন্নত হয়েছে, নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্যোগ গ্রহণ ততই উপলব্ধ হয়েছে, নারীশিক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে নানামাত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস।

নারীশিক্ষার সঙ্গে নারীর স্বাধীনসত্তা ও অস্তিত্বের বিষয়টি গভীরভাবে সম্পর্কিত। নারীকে মানুষ হিসেবে সমাজস্থ পুরুষ স্বীকৃতি না দিলে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটি সামনে আসতে পারে না। কেননা, যদি নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেই স্বীকার করা না হয়, তাহলে তার শিক্ষার বিষয়টি হয়ে যায় একান্তই অবান্তর। তাই নারীশিক্ষার সঙ্গে সমাজে নারী-পুরুষের সমতার ধারণাটিও এই সঙ্গে আলোচ্য হয়ে ওঠে। একসময় ভাবা হতো গৃহস্থালি কাজ আর সন্তান লালন-পালনের শিক্ষাই হলো নারীশিক্ষা। সামান্য অক্ষরজ্ঞান শেখা, চিঠিপত্র লেখা ও পাঠ করতে পারা—এটাকেই ভাবা হতো নারীশিক্ষার বিষয়। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম থেকেই এই ধারণার গুণগত পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। এ সময় থেকেই নারী সমাজস্থ পুরুষের সঙ্গে সমতার সম্পর্ক কল্পনা করতে থাকে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকর্মক হয়ে ওঠে, দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান রাখতে চায়। এ প্রেক্ষাপটে নারীশিক্ষার ধারণায় এলো ব্যাপক পরিবর্তন।

নারীবাদ

নারীবাদ হচ্ছে নারীর চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখার একটি সমাজদর্শন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে নারীবাদ নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যমূলক পুরুষকেন্দ্রিক একটি সমাজব্যবস্থা হিসেবেই বিবেচনা করে। বস্তুত, অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর জন্য পুরুষের মতো সমান অধিকার নিশ্চিত করার সমন্বিত উদ্যোগকেই নারীবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নারীবাদ হচ্ছে এমন একটি বিশ্বাস, যে বিশ্বাস থেকে সমাজস্থ একজন নারীর পুরুষের সমান অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে যাওয়াকে বুঝায়। লৈঙ্গিক পরিচিতি ছাড়াই মানুষের স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের কথা বলে নারীবাদ। নারী ও পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে নারীবাদ। নারীবাদ নারীকে নারী হিসেবে নয়, বরং মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে। প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচিতির ঊর্ধ্বে উঠে নারীবাদ নারীকে বিবেচনা করতে শেখায় সামাজিক জেন্ডারচেতনায়।

জেন্ডারচেতনা

নারী ও পুরুষের মধ্যকার সামাজিক বৈষম্য সন্ধান করা এবং পরাক্রমশালী পুরুষতন্ত্র থেকে নারীকে মুক্ত করার দার্শনিক বিষয়ই হলো জেন্ডারচেতনা। লিঙ্গ (Sex) ও জেন্ডারের (Gender) পার্থক্য নিরূপণ জেন্ডারচেতনার বিশেষ লক্ষ্য। জন্মগত বা প্রাকৃতিকভাবে একজন মানুষের যে লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্য তা-ই হচ্ছে Sex বা লিঙ্গ। সমাজে একজন নারী সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হয়, তার অনেকটাই লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়,

Dhaka University Institutional Repository

বরং তা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চাপিয়ে দেওয়া। সমাজস্থ পুরুষতন্ত্র নারীকে যেভাবে দেখতে শেখায়, নারী সম্পর্কে সমাজের ধারণা তা-ই হয়ে ওঠে। জেন্ডারচেতনায় নারীকে দেখা হয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে—লিঙ্গ এখানে কোনো নির্ধারক নয়। নারীর প্রকৃত মুক্তি কোথায়, কীভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে নারীর অধিকার, নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার দর্শন কী—এসব বিষয় অনুসন্ধান করাই জেন্ডারচেতনার মূল লক্ষ্য।

জেন্ডারচেতনা ও নারীশিক্ষা

সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা বিকাশের প্রশ্ন যখন তীব্র হয়ে উঠল, নারীশিক্ষায় তখন দেখা গেল মৌলিক গুণগত পরিবর্তন। জেন্ডাচেতনার আলোকে নারীশিক্ষার ভাবনা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। জেন্ডারচেতনার সঙ্গে নারীশিক্ষা সংশ্লিষ্ট হয়ে উঠল। জেন্ডারচেতনা নারীশিক্ষা তথা নারীর উপর ফেলল নতুন আলো। এখন নারী হয়ে উঠল মানুষ—তার শিক্ষাকেও দেখা হলো জেন্ডারের আলোকে। নারীশিক্ষার সঙ্গে জেন্ডারচেতনা সংশ্লিষ্ট হবার ফলে নারী এখন আর নিজেকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক প্রেক্ষাপটে অবলোকন করল না, বরং এখন সে নিজেকে দেখতে শিখল সামাজিক জেন্ডারচেতনার আলোকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্য (Sex-inequality) চলে আসছিল দীর্ঘ দিন ধরে। দীর্ঘকাল ধরে পুরুষ ও নারীকে ভিন্ন ভিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো। জেন্ডারচেতনা ও নারীবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে এই লিঙ্গ-বৈষম্যের কৌশল ও মৌল কারণ শনাক্ত করে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা প্রথম দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করে। সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণ নারীবাদের অন্যতম লক্ষ্য।

নারীর ক্ষমতায়ন

শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে ক্ষমতায়নের স্তরে নিতে চায় নারীবাদ। নারী সিদ্ধান্তগ্রহণে সকর্মক হয়ে উঠুক, পুরুষের বাধা অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা করুক নিজের অধিকার ও মর্যাদা—এমনটাই লক্ষ্য নারীবাদের। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী স্বাধীন ও সকর্মক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হয়ে ওঠাকে নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে শনাক্ত করে নারীবাদ।

জেন্ডারসমতা ও নারীর অধিকার

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে অধস্তন করে রাখার নানা কৌশল আবিষ্কার করেছে। জেন্ডারচেতনা ও নারীবাদ পুরুষতন্ত্রের এই কৌশল ভেঙে সমাজে নারী-পুরুষের সমতা বিধান ও নারীর বহুমাত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডারসমতা ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সঞ্চার করে নতুন আলোক।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা-পদ্ধতি

শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান (Education-Sociology) বিষয়ে গবেষণা করতে হলে সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণা পদ্ধতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেই গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গবেষক তার মৌল সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সঠিক গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচনের উপরেই নির্ভর করে একটি গবেষণাকর্মের প্রত্যাশিত সফলতা। বর্তমান গবেষণাকর্মের জন্যও নির্বাচন করা হয়েছে সুনির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতি, যা নিচে উল্লেখ করা হলো।

বর্তমান গবেষণাকর্মটির মূল ক্ষেত্র হচ্ছে ঐতিহাসিক শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান (Historical Education-Sociology)। ফলে এটি সম্পাদনে ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Historical Documents Analysis Method) অবলম্বন করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং জেন্ডার-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গবেষকদের সাথে সাক্ষাৎকার/কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এসব দিক বিচারে বর্তমান গবেষণার পদ্ধতিগত ভিত্তি হচ্ছে গুণগত বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা (Qualitative Analysis Research)।

ঐতিহাসিক শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান (Historical Education-Sociology) পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এবং সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশধারা ব্যাখ্যা করা হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক বিকাশ ও অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এই পদ্ধতি গবেষকদের কাছে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়েছে। ইতিহাসের ধারাক্রমে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে শিক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কারিকুলাম পরিমার্জন, শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতি, সর্বোপরি শিক্ষার মাধ্যমে চেতনার বিকাশ—এসব বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়।

ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে (Historical Documents Analysis Method) শিক্ষা সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে গবেষণার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যাদি, দলিল, বিভিন্ন সরকারি নোট, গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়। এসব দলিল বা দালিলিক উৎস পর্যালোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ। গবেষক ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে তার প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে প্রমাণ করার প্রয়াস গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতিতে গবেষক নিষ্ঠার সঙ্গে পুরোনো তথ্য এবং দলিলপত্র পর্যালোচনা করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান অভিসন্দর্ভে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে ঐতিহাসিক শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। উনিশ শতকে নারীশিক্ষা ও বাঙালি সমাজের সার্বিক পরিস্থিতিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজবিকাশের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা এবং নানামাত্রিক উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও এ-সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহ প্রধানত ঐতিহাসিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লক্ষ করা গেছে, বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা বিষয়ক চিন্তা ও উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদিতে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য-উপাত্ত রক্ষিত আছে। উপর্যুক্ত দুই পদ্ধতির সংমিশ্রণে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের মূল্যায়ন বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে উপস্থাপিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার তথ্য-উপাত্তের প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) নিম্নরূপ :

২. তথ্যের উৎস

২.১ প্রাথমিক উৎস

প্রাথমিক উৎসের জন্য নিম্নোক্ত দুটো কৌশল অনুসৃত হয়েছে :

ক. বিদ্যাসাগর-লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ, পুস্তিকা, চিঠিপত্র ইত্যাদি

বাসুদেব চরিত (আনুমানিক প্রকাশকাল : ১৮৪২), *বেতাল পঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭), *বাংলার ইতিহাস* (১৮৪৮), *জীবনচরিত* (১৮৪৯), *বাল্যবিবাহের দোষ* (১৮৫০), *বোধোদয়* (১৮৫১), *সংস্কৃত উপক্রমণিকা* (১৮৫১), *ঋজুপাঠ* (১-৩ খণ্ড, ১৮৫১), *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৩), *ব্যাকরণ কৌমুদী* (১-২ ভাগ, ১৮৫৩ ; ৩য় ভাগ, ১৮৫৪), *শকুন্তলা* (১৮৫৪), *বর্ণপরিচয়* (১ম-২য় ভাগ, ১৮৫৫), *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১ম পুস্তক, ১৮৫৫ ; ২য় পুস্তক, ১৮৫৫), *Marriage of Hindu Widows* (১৮৫৬), *কথামালা* (১৮৫৬), *চরিতাবলী* (১৮৫৬), *সীতার বনবাস* (১৮৬০), *আখ্যানমঞ্জরী* (১৮৬৩), *ভ্রান্তিবিলাস* (১৮৬৯), *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার* : প্রথম পুস্তক (১৮৭১), *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার* : দ্বিতীয় পুস্তক (১৮৭৩), *আত্মচরিত* (১৮৯০) এবং *প্রভাবতী সম্ভাষণ* (১৮৯২)।

বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র এবং উইলে নারীশিক্ষা এবং নারী-পুরুষ সমতা বিষয়ে নানা তথ্য পাওয়া যায়। এ কারণে তাঁর চিঠিপত্র ও উইলও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এজন্য ব্যবহৃত হয়েছে সফিউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত *বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী চিঠিপত্র ও উইল* (২০০৮) গ্রন্থটি।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাসাগরের কতিপয় অপ্রধান রচনাও রয়েছে। এগুলো হচ্ছে : *ব্রজবিলাস* (১৮৮৪), *অপূর্ব্ব ইতিহাস* (১৮৮৫), *নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস* (১৮৮৮), *সংস্কৃত রচনা* (১৮৯০), *শ্লোকমঞ্জরী* (১৮৯০), *ভূগোল খগোল দর্শন* (১৮৯২), *রামের রাজ্যাভিষেক* (১৯০৯) এবং *শব্দসংগ্রহ* (১৯০১)।

খ. সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন

বর্তমান গবেষণাকর্মের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নারীশিক্ষা, জেন্ডারচেতনা, শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ/গবেষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। একাধিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে ; করোনা মহামারিজনিত কারণে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার জুম ভিডিও কমিউনিকেশনের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের কাছে লিখিতভাবেও অভিমত পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত থেকে মোট এগারো জন বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ সাত জন আর ভারতের বিশেষজ্ঞ চার জন। বিষয়-বিশেষজ্ঞ হিসেবে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশেষজ্ঞ : তিন জন (বাংলাদেশ থেকে একজন এবং ভারত থেকে দুই জন)।

নারীশিক্ষা বিশেষজ্ঞ : তিন জন (বাংলাদেশ থেকে দুই জন এবং ভারত থেকে একজন)

জেন্ডারবিশেষজ্ঞ : চার জন (বাংলাদেশ থেকে তিন জন এবং ভারত থেকে একজন)

শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ : একজন (বাংলাদেশ)

২.২ মাধ্যমিক উৎস

বর্তমান গবেষণার জন্য মাধ্যমিক উৎস হিসেবে নিম্নবর্ণিত উৎসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে :

ক. বাংলায় নারীর সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, গবেষণাসন্দর্ভ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও সেখান থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এরূপ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিচে দেওয়া হলো :

অরবিন্দ পোদ্দার, *ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঠক* (১৯৭৩), আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে* (২০০০), আব্দুল মালেক, *বাঙালির সমাজচিন্তায় শিক্ষা প্রসঙ্গ* (২০১২), জয়ন্তী মণ্ডল, *ঊনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য* (২০১৪), দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ-১ম খণ্ড* (১৯৯৩), ধনঞ্জয় ঘোষাল

(সম্পাদক), *নবচেতনায় বঙ্গনারী : প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব,* (২০১৫), নমিতা চক্রবর্তী, *বঙ্গদেশে শিক্ষাপ্রসার* (১৯৮০), নিহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব* (১৯৯৫), বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ* (১৯৯০), বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (২০১১), বিনয়ভূষণ রায়, *অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা* (১৯৯৮), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* (১৯৯৫), রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন* (১৯৮১), রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (২০০২), শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহ্মিনা আখতার, জাহান আরা বেগম, *নারীশিক্ষা : উদ্ভব ও বিকাশ* (১৯৯৮), সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে : উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা* (২০১০), সুকোমল সেন, *ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ* (১৯৯৩), স্বপন বসু, *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস* (২০০১), A. F. Salahuddin Ahmed, *Bangladesh : Tradition and Transformation* (1987), A. S. Altekar, *The Position of Women in Hindu Civilization* (1991), David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind* (1979), Ghulam Murshid, *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization : 1849-1905* (1983), Humaun Kabir, *Educaiton in New India* (1959), Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*-Vol. II (1967), Syed Nurullah and J. P. Naik, *A Student's History of Education in India* (1949), Usha Chakraborty, *Condition of Bengali Women around 2nd half of the 19th Century* (1973), William Adam, *Peoples of the State of Education in Bengal* (1995) ইত্যাদি।

খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যেসব বই মাধ্যমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে নিম্নোক্তগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর* (২০১১), অমিয়কুমার সামন্ত, *বিদ্যাসাগর* (২০১২), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর* (১৯৭০), ঋষি দাস, *বিদ্যাসাগর* (১৯৭১), খন্দকার রেজাউল করিম, *বিদ্যাসাগর* (২০১৬), গোলাম মুরশিদ (সম্পাদক), *বিদ্যাসাগর* (২০১১), বদরুদ্দীন উমর, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ* (১৯৯০), বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (২০১১), বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর* (২০১৬), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* (১৯৫৫), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চারিত্রপূজা* (১৯৭৬), সফিউদ্দিন আহমদ, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা* (২০১৫), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* (১৯৭১), Ashim Mukhopadhyay (editor), *The Golden Book of Vidyasagar* (1993), Asok Sen, *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones* (2016), Subal Chandra Mitra, *Iswar Chandra Vidyasagar : A Story of His Life and Work* (1975) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বর্তমান গবেষণার জন্য নারীবাদ ও জেন্ডারচেতনা বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের অনেক বই পর্যালোচনা করা হয়েছে। নারীবাদ ও জেন্ডারচেতনা-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

আয়শা খানম, *বাংলাদেশের নারী আন্দোলন : প্রাসঙ্গিক ভাবনা* (২০০৯), আয়শা খানম, *নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের পথে* (২০১৫), কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ : নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান* (২০০০), মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন* (২০০২), রাশিদা আখতার খানম, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট* (২০০০), সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি* (২০০৮), হুমায়ুন আজাদ, *নারী* (২০০৪), Clara Zetkin, *Towards a Socialist Feminism* (1948), Estelle B. Freedman, *No Turning Back : The History of Feminism and the Future of Women* (2003), John Stuart Mill, *The Subjection of Women* (2012), Judith Butler, *Undoing Gender* (2004), Kira Cochrane, *All the Rebel Women : The Rise of the Fourth Wave of Feminism* (2013), Mary Wollestonecraft, *A Vindiction of the Rights of Woman* (1983), Shulamith Firestone, *The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Revolution* (1982), Simone de Beauvoir, *The Second Sex* (1974), Suzanne Marilley, *Women's Suffrage and the Origins of Liberal Feminism in the United States : 1820-1920* (1996), Ti-Grace Atkinson, *Radical Feminism* (2000), United Nations, *United Nations & The Advancement of Women : 1945-1995* (1995) ইত্যাদি।

ঘ. বর্তমান গবেষণার জন্য নারীশিক্ষা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো :

আবু হামিদ লতিফ, *শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা* (২০০৩), আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম ও শেখ শাহবাজ রিয়াদ, *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা* (২০০৭), জয়ন্তী মণ্ডল, *উনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য* (২০১৪), বিনয়ভূষণ রায়, *অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা* (১৯৯৮), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা* (১৯৭৫), শরীফা খাতুন, *দর্শন ও শিক্ষা* (১৯৯৯), শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহ্‌মিনা আখতার, জাহান আরা বেগম, *নারীশিক্ষা : উদ্ভব ও বিকাশ* (১৯৯৮), সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (২০০২), Humaun Kabir, *Education in New India* (1959), James Long (editor), *Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar* (1968), Sunanda Ghosh, *Bethune : His School and Nineteenth Century Bengal* (2006), William Adam, *Peoples of the State of Education in Bengal* (1995) ইত্যাদি।

বিভিন্ন উৎস এবং সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত যথাযথ মূল্যায়ন, বিচার ও বিন্যাস করে মূল অভিসন্দর্ভ প্রণীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নারীশিক্ষা : পটভূমি ও তাত্ত্বিক কাঠামো

যে-কোনো সমাজে মোট জনগোষ্ঠীর কম-বেশি অর্ধেক মানুষ নারী। এই নারী-জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য যে ব্যবস্থা ও পদ্ধতি একটি দেশ অনুসরণ করে, সহজ কথায় তা-ই নারীশিক্ষা। নারীশিক্ষার ক্রমিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অনেক ক্ষেত্রেই হতাশ হতে হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সময়খণ্ডে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়নি, স্বীকার করা হয়নি তার পড়ালেখা করার প্রয়োজনীয়তা। পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই নারীকে একসময় কল্পনা করা হয়েছে সন্তান উৎপাদন এবং লালন-পালনের একটা বস্তু হিসেবে—তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা থেকেছে উপেক্ষিত। এই পরিস্থিতিতে নারীর শিক্ষার কথা কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। তবে এ-অবস্থার পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই নারীশিক্ষা বিষয়ে কিছু কিছু ভাবনা ও প্রয়াসের কথাও এখানে স্মরণ করতে হয়। সমাজ যতই অগ্রসর ও উন্নত হয়েছে, নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্যোগ গ্রহণ ততই উপলব্ধ হয়েছে, নেওয়া হয়েছে নারীশিক্ষার জন্য নানামাত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস।

নারীশিক্ষার সঙ্গে নারীর স্বাধীনসত্তা ও অস্তিত্বের বিষয়টি গভীরভাবে সম্পর্কিত। নারীকে মানুষ হিসেবে সমাজস্থ পুরুষ স্বীকৃতি না দিলে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটি সামনে আসতে পারে না। কেননা, যদি নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকেই স্বীকার করা না হয়, তাহলে তার শিক্ষার বিষয়টি হয়ে যায় একান্তই অবান্তর। তাই নারীশিক্ষার সঙ্গে সমাজে নারীর সমতার ধারণাটিও একই সঙ্গে আলোচ্য হয়ে ওঠে। একসময় ভাবা হতো গৃহস্থালি কাজ আর সন্তান লালন-পালনের শিক্ষাই হলো নারীশিক্ষা। সামান্য অক্ষরজ্ঞান শেখা, চিঠিপত্র লেখা ও পাঠ করতে পারা—এটাকেই ভাবা হতো নারীশিক্ষার বিষয়। কিন্তু বিশ শতকের প্রথম থেকেই এই ধারণার গুণগত পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। এ সময় থেকেই নারী সমাজস্থ পুরুষের সঙ্গে সমতার সম্পর্ক কল্পনা করতে থাকে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকর্মক হয়ে ওঠে, দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান রাখতে চায়। এ অবস্থায় নারীশিক্ষা ধারণায় এলো ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তন। বিশ শতকে নারী সম্পর্কে সামাজিক ধারণার পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময় থেকেই বাংলাদেশে নারীশিক্ষার জন্য আলাদা পাঠক্রমের ধারণা অবলুপ্ত হলো—ছেলেদের মতো মেয়েরাও একই পাঠক্রমে ক্লাস করা ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করল। নারীশিক্ষার বিরোধী শক্তি আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে আরম্ভ করে, তবে সে-শক্তি যে একেবারে অবলুপ্ত হলো—এমন কথা বলা যাবে না। নারীশিক্ষার বিরোধী শক্তি অব্যাহতভাবেই ক্রিয়াশীল থাকল তাদের নেতিবাদী ধারণা নিয়ে। বিশ শতকের আগে ও পরে নারীশিক্ষার মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, নিম্নে সূত্রকারে তা উপস্থাপিত হলো :

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের পূর্ববর্তী নারীশিক্ষা :

(ক). বিশ শতকের পূর্ববর্তী নারীশিক্ষা ছিল প্রধানত মেয়েদের নিজস্ব গৃহকেন্দ্রিক। গৃহশিক্ষকের কাছে মেয়েরা পাঠাভ্যাস করত।

(খ). প্রাচীন কাল থেকে এই সময়খণ্ড পর্যন্ত নারীশিক্ষা বিষয়ে সমাজে নেতিবাচক ধারণা প্রচলিত ছিল। নারী শিক্ষালাভ করলে তাঁদের কমনীয়তা বিনষ্ট হবে, পরিবর্তিত হবে তাদের শারীরিক অবয়ব–এমন ধারণা সমাজস্থ মানুষ বিশ্বাস করত।

(গ). নারী শিক্ষালাভ করলে বিধবা হবে—এমন ধারণাও প্রচলিত ছিল সমাজে। শিক্ষালাভ করলে গৃহস্থকর্মে নারী তার কর্তব্য ভুলে যাবে, পতিসেবা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে, গুরুজনদের তারা মানবে না—নারীশিক্ষা বিরোধীরা এ ধরনের কথা বলেও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

(ঘ). যে-সব উদারপন্থী মানুষ নারীশিক্ষার পক্ষে কথা বলেছেন, তাঁদের অধিকাংশই সীমিত পরিসরে নারীর শিক্ষার কথা বলেছেন। নারীকে ততটুকুই শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে তারা পতিসেবা ও সন্তান লালন-পালনের কথা শিখতে পারে, এর বেশি নয়। কেউ কেউ আবার গৃহস্থালি কর্ম যাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারে, নারীর জন্য এমন শিক্ষার কথা বলেছেন।

(ঙ). প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারীশিক্ষার প্রধান ও একমাত্র পাঠ্য-বিষয় ছিল শাস্ত্রকথা শিক্ষালাভ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের নির্বাচিত অংশ নারীদের শিক্ষা দেওয়া হতো।

(চ). আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কোনো- কোনো উদারপন্থী ব্যক্তি অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও সামান্য পাটিগণিত, বাংলা ভাষা, ধর্মকথা এবং আনুষঙ্গিক বিষয় নারীশিক্ষার জন্য নির্বাচন করে।

(ছ). উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারীশিক্ষা গৃহের সীমানা ছাড়িয়ে ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানমুখী হয়ে ওঠে। পূর্বের মতো মাত্র একজন শিক্ষক নয়, এখন থেকে মেয়েরা স্কুলে একাধিক শিক্ষকের কাছে বিদ্যা লাভ করত। ছেলেদের মতোই তাদের পাঠক্রমে নানা বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকত।

বিশ শতক ও উত্তরকালীন নারীশিক্ষা :

(ক). বিশ শতকের নারীশিক্ষা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠান বা স্কুলকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এসময় গৃহাভ্যন্তরে নারীশিক্ষার প্রবণতা দূর হয়।

(খ). নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য স্বতন্ত্র স্কুল থাকলেও, এ-সময়ে অনেক স্কুলে সহশিক্ষা চালু হয়। অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ে একই সঙ্গে একই স্কুলে পড়ালেখা করত।

Dhaka University Institutional Repository

(গ). বিশ শতক থেকে স্কুলে নারীশিক্ষার জন্য ছেলেদের মত একই পাঠক্রমে শিক্ষা দেওয়া হতো। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র পাঠক্রম আর অনুসরণ করা হতো না।

(ঘ). মুসলিম নারীদের জন্য মাদ্রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় স্বতন্ত্র পাঠক্রম শিক্ষা দেওয়া হতো। অবশ্য মধ্যযুগেও মুসলিম মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র পাঠক্রম চালু ছিল।

(ঙ). মাঝে-মধ্যে ছেলে-মেয়েদের পাঠক্রমে আংশিক পার্থক্য দেখা যেত। যেমন, ছেলেদের পড়ানো হতো কৃষিশিক্ষা, আর মেয়েদের গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সূচিশিল্প ইত্যাদি।

(চ). মেয়েদের স্কুলে নারী-শিক্ষক নিয়োগের প্রবণতা বৃদ্ধি পেল।

(ছ). প্রাচীন কাল থেকে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে মাসিক বেতন বলে কিছ ছিল না, কিন্তু বিশ শতকে নারীদের মাসিক বেতন দিয়ে পড়ালেখা করতে হতো। সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে মাসিক বেতন বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। একুশ শতকে এসে দেখা যাচ্ছে, নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য স্কুল-কলেজে নারী-শিক্ষার্থীকে আর বেতন দিতে হয় না, সরকারই সব ব্যয় বহন করেন।

বিশ শতকের আগ পর্যন্ত বিরুদ্ধ সামাজিক পরিস্থিতির কারণে নারীশিক্ষার জন্য প্রগতিশীল উদার মানবতাবাদী শিক্ষাচিন্তকেরা বেশি কিছু কল্পনা করতে পারেননি। ফলে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর সামূহিক উন্নতি, নারীর ক্ষমতায়ন, পুরুষের সঙ্গে সমতাচেতনা, অধিকার সচেতনতা—নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এসব প্রসঙ্গ একান্তই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বিষয়। এখন আর নারীশিক্ষাকে নারীর অক্ষরজ্ঞান, গৃহস্থালিকর্ম এবং সন্তান লালন-পালনের দৃষ্টিতে দেখা হয় না, বরং দেখা হয় জেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই এ কালে নারীশিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে :

> Female education is a catch-all term for a complex set of issues and debates surrounding education for females. It includes areas of gender equality and access to education, and its connection to the alleviation of poverty. Also involved are the issues of single-sex education and religious education, in that the division of education along gender lines, and religious teachings on education, have been traditionally dominant, and are still highly relevant in contemporary discussion of female education as a global consideration. (UNESCO, 2017)

নারীশিক্ষাকে এই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা কেবল বিগত শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয়েছে। জেন্ডার দৃষ্টিকোণে নারীশিক্ষাকে দেখার কথা বিশ শতকের পূর্বে কল্পনা করাই যেত না। তবু দু'একজন অলোকসামান্য চিন্তাবিদ নারী প্রগতির সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে উনিশ শতকেই নারীশিক্ষার কথা ভেবেছেন এবং নানা কর্মোদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নারীশিক্ষার বর্তমান অগ্রগতি বহু শতাব্দীর সাধনার ফল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমালোচকবৃন্দের নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ :

> বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে যে ধরনের শিক্ষা বোঝায় সেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশিদিন আগে থেকে শুরু হয়নি। যদিও মানুষের জন্মের পর থেকেই শিক্ষা শুরু হয়, অর্থাৎ প্রবহমান সময়, পরিবেশ, সমাজ, সংস্কার সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে নারী যে জ্ঞান অর্জন করে সেটাই নারীশিক্ষা। ...নারীর পুঁথিগত শিক্ষা অর্জন একদিন, দুইদিন বা একবছর, দু'বছরে নয়—যুগ যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।...বিবর্তনের ধারায় দেখা গেছে যে, নারীর মর্যাদার সাথে তার শিক্ষার্জনের সুযোগ জড়িত, যা আজও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যমান। (শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, ১৯৯৮ : ভূমিকা)

নারীশিক্ষা বিকাশের সঙ্গে উদার ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি উদার ও উন্নত না হলে নারীশিক্ষা তথা নারী-উন্নয়নের কথা কল্পনা করা যায় না। পুরুষকেন্দ্রিক পৃথিবীতে দীর্ঘকাল নারীকে অধস্তন করে রাখা হয়েছে, অস্বীকৃত হয়েছে শিক্ষাসহ তার যাবতীয় অধিকার। শিক্ষার অভাবের ফলেই নারীর মনোলোকে বাসা বেঁধেছে অধস্তন চেতনা। শিক্ষা যে অধিকার, অনেক সমাজে নারী সে-কথা উপলব্ধি করতেই পারেনি। পুরুষতন্ত্রই তাদের সরিয়ে রেখেছে শিক্ষা থেকে অনেক দূরে; আবার কখনো-কখনো নারীর জন্য তারা ততটুকু শিক্ষার কথা বলেছে, যাতে তাদের স্বার্থের কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়। এর ফলেই সমাজে দেখা দিয়েছে নানা প্রকার বৈষম্য, লিঙ্গভিত্তিক শোষণ ও অসমতা। লিঙ্গভিত্তিক এই অসমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হচ্ছে নারীশিক্ষা। পুরুষতন্ত্র যেমন নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, আবার আলোকিত মানবতাবাদী পুরুষরাই নারীশিক্ষা প্রসারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। গবেষক লিখেছেন : "বাংলাদেশে মধ্যযুগ থেকে চলে আসা অমানবিক প্রথাগুলি সংস্কারের পথে নেমেছিলেন পুরুষরা। তখনও মেয়েরা অসূর্যস্পর্শা (অসূর্যম্পশ্যা?), অশিক্ষা, চাপিয়ে দেওয়া দানবীয় প্রথার ভারে ন্যুব্জ। তাদেরকেও মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন উদার, মহৎ কিছু পুরুষ। সতী প্রথা উচ্ছেদ করলেন রামমোহন, বিধবাবিবাহ প্রথা চালু করলেন বিদ্যাসাগর। মহর্ষি মেয়েকে দিবালোকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে স্ত্রী শিক্ষার প্রদীপটিকে উস্কে দিলেন। মহর্ষিপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের স্ত্রী স্বাধীনতার পাঠ দিলেন নিজ স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে। স্ত্রী শিক্ষার জন্য বই লিখে ফেললেন পুরুষেরাই।" (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ১০)

বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যেটুকু নারীশিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, তা ছিল বৈষম্যপূর্ণ ও অসমতা-আকীর্ণ। রক্ষণশীল সমাজ নারীর জন্য স্বাভাবিক শিক্ষার কথা কল্পনাও করতে পারত না। গবেষক লিখেছেন :"উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের একটি ধারাবাহিক অভিযোগ ছিল এই যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ হয়ে উঠছে। এই মনোভাব থেকে একটি প্রয়াস দেখা দিল যে মেয়েদের সেই ধরনের শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের মধ্যে পুরুষালি গুণাবলীর আবির্ভাব না ঘটে। অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রগত পার্থক্যের যুক্তি দিয়ে পাঠ্য তালিকায়ও এক ধরনের বিভাজন-নীতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল” (সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, ১৯৯৫ : ৬১)। বিশ শতকের আগ পর্যন্ত ধর্ম-নিরপেক্ষ নারীশিক্ষার কথা কেউ ভাবতেই পারেননি। ধর্ম অর্থে এখানে বিশেষ কোনো ধর্মমত নয়, সংসারের ব্যবহারিক বিধি ও সদাচারের নিয়ম-কানুনের কথা বোঝানো হয়েছে। নারীশিক্ষার জন্য এ সময় একটি নতুন তত্ত্ব জোরে-শোরে প্রচার করা হয়েছিল : “স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা কখনই এক হইতে পারে না। কারণ, পুরুষের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় তত ক্ষতি নেই, যতটা আছে মেয়েদের বেলায়। কারণ মেয়েদের ও ছেলেদের সামাজিক দায়িত্ব পৃথক। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের ওপরই সংসার ও পারিবারিক নীতি রক্ষার দায়িত্ব : বিশ্বনিয়ন্তা রমণীজাতির উপরে এই গুরুভার [পরিবার রক্ষা করা] অর্পণ করিয়া তাহাদের জীবন ধন্য করিয়াছেন” (সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, ১৯৯৫ : ৭৮)। যেহেতু নারীশিক্ষার ধারণা প্রথম এসেছিল পশ্চিম থেকে, রক্ষণশীল সমাজ তাই নারীশিক্ষাজনিত সব ‘অধঃপাতের’ জন্য দায়ি করত পশ্চিমের সভ্যতাকে। বিশ শতকের প্রথম থেকেই রক্ষণশীল সমাজের এই ধারণা ভাঙতে শুরু করে। এসময় নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে পৃথিবী জুড়ে অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে নারীশিক্ষা। নারীর সাক্ষরতার দাবি উঠতে থাকে সারা পৃথিবীতে। তখন বলা হলো এইকথা—নারী শিক্ষালাভ করলে সমাজে দেখা দেবে নিম্নোক্ত ইতিবাচক প্রবণতাগুলো :

(ক). নিজের অধিকার সম্পর্কে নারীর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়;

(খ). সামাজিক ও সাংসারিকভাবে নারী কীভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে তা বুঝতে পারে;

(গ). নিজের সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পায়;

(ঘ). পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতায় সহযোগিতা করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়;

(ঙ). প্রসবকালীন মায়েদের মৃত্যুহার কমে;

(চ). স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় নারীর গড়-আয়ু;

(ছ). জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা বুঝতে পারে; এবং

(জ). সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি—সব ক্ষেত্রেই শিক্ষিত নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। (শক্তি মণ্ডল, ২০১৪ : ৩৫৬)

বিশ শতকের আলোকিত নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন—"স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে" (রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ২০১৪ : ৩২৩)। নারীর সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে নারীশিক্ষার বিষয়টি বিজড়িত বলেই মনে করেছেন রোকেয়া। নারীমুক্তির জন্য তাই নারীশিক্ষাকে বিশ শতক থেকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলো। এ প্রেক্ষাপটেই পাল্টে যায় নারীশিক্ষার সংজ্ঞার্থ ও ধারণা। একালে নারীকে জৈবিকভাবে কেবল নারী ভাবা হয় না, ভাবা হয় পুরুষের মতোই মানুষ হিসেবে। এ কারণে নারীশিক্ষা কথাটাও পড়ে প্রবল প্রশ্নের মুখে। 'What is women education?' —এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শিক্ষাবিদ Danial Schwarz Carigiet চমৎকার উত্তর দিয়েছেন :

> Allow me to assume that this question comes from a non-western cultural context. Because in he west, this is a non-question. There isn't any such thing as 'women's education'. There is just education. But to answer your question : In cultures where women are not (yet) recognised as normal human beings, where they are treated as property, where they exist primarily for a sexual gratification of men. ...There is this strange idea that women don't need education. Because they only exist to be fucked and to produce children. So why bother? It would be like sending a cow to school. Or a camel. So small steps are happening, small steps like fighting to allow girls to attend school and learn to read and write. Small steps such as allowing women to speak. Allowing women to drive. In such a centext, it makes sense to fight for girl's and women's rights to education. (www.quora.com)

সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা বিকাশের প্রশ্ন যখন তীব্র হয়ে উঠল, নারীশিক্ষায় তখন দেখা গেল মৌলিক গুণগত পরিবর্তন। জেন্ডারচেতনার আলোকে নারীশিক্ষা প্রসঙ্গটি শিক্ষাচিন্তকদের ব্যাখ্যায় প্রাধান্য পেল। উনিশ শতকের রক্ষণশীল সমাজের জড়তা ভেঙে বাঙালি নারীরা পুরুষদের পাশাপাশি নারীপ্রগতির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নারীশিক্ষা প্রসারের ফলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীদের কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে উঠল। এই প্রেক্ষাপটেই নারীশিক্ষার সঙ্গে জেন্ডারচেতনা তথা নারীবাদ সংশ্লিষ্ট হয়ে উঠল। এখন নারী হয়ে উঠল মানুষ—তার শিক্ষাকেও দেখা হলো জেন্ডারের আলোকে, নারীবাদী দর্শন খুলে দিল তার চোখ। এখন সে নিজেকে আর প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক প্রেক্ষাপটে অবলোকন করল না, বরং এখন সে নিজেকে দেখতে চাইলো সামাজিক জেন্ডারচেতনার আলোকে। নারীবাদী তত্ত্ব নারীশিক্ষার উপর ফেলল নতুন আলো। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য Henry Giroux এবং Paulo Freire-র অভিমত :

Dhaka University Institutional Repository

> Faminist theory aims to understand the mechanisms and roots of gender inequality in education, as well as their societal repercussions. Like many other institutions of society, educational system are characterized by unequal treatment and opportunity for women. Almost two-thirds of the world's 862 million illiterate people are women. (www.tandfonline.com)

শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্যের (gender inequality) কৌশল ও মৌল কারণ শনাক্ত করাই নারীবাদী তত্ত্বের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজক্ষেত্রে নারীর প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান নির্দেশ করাও নারীবাদী তত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য। সমাজের অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের (institutions) মতো শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নারীদের অধিকার ও সুযোগ পেতে বৈষম্যের স্বীকার হতে হয়। ২০০৭ সালের ইউনেস্কোর হিসাব মতে, পৃথিবীর ৮৬২ মিলিয়ন নিরক্ষর মানুষের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের এই বৈষম্যের হার এশিয়া ও আফ্রিকাতেই সবচেয়ে বেশি। নারীরা যখন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তখন সমঅধিকার অর্জন এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অথচ একথা স্বীকৃত সত্য যে সমাজ-উন্নয়নের জন্য নারীশিক্ষা হচ্ছে একটা বড় শক্তি। নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩) বলেছেন : "Education is the most powerful weapon we can use to change the world." (Nelson Mandela, 1994 : 96)। 'Educaiton' বলতে ম্যান্ডেলা নিশ্চয়ই নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষার কথাই বলেছেন। পক্ষান্তরে Jim Grossman বলেছেন : "A society that dosen't educate its girls and women is simply cutting its labor-force in half to spite feminine achievement." (www.quora.com)। নারীবাদী লেখক Maryam Arif বলেছেন : "It is clear and obvious fact that no society can make progress without women education." (www.quora.com)। শিক্ষা পেলেই জাতিগঠনে ভূমিকা রাখতে পারে নারী। নারী-শিক্ষার দ্বিমাত্রিক উপযোগিতার কথা বলেছেন গবেষক Niskarsh Dwivedi। তাঁর মতে শিক্ষা পেলে জাতিগঠনে যেমন ভূমিকা রাখতে পারে নারী, তেমনি নিজের সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যও আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাঁর ভাষায় :

> Female education is very important for any nation. There are many benefits for female education :
>
> (1). If an individual girl is educated, then she can contribute to the nation.
>
> (2) If she is educated, in future her children will also be educated, and we already know that a child is mainly connected to his mother.

(3). Education saves and improves the lives of girls and women, ultimately leading to more equitable development, stronger families, better services, better child health (www.quora.com)

বর্তমান সময়ে নারীশিক্ষা উপযোগিতা পৃথিবীর সব দেশই স্বীকার করে নিয়েছে। সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও যথাযথ শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন প্রায় সব শিক্ষাচিন্তক। এ বিষয়ে ইউনিসেভও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পৃথিবীর দেশে দেশে নারীশিক্ষার জন্য জাতিসংঘের এই সংস্থাটি কাজ করে চলেছে। নারীশিক্ষা সমাজের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করে। ইউনিসেভ প্রভাবের এই মাত্রাসমূহকে পাঁচটি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করেছে। প্রধান এই ভাগসমূহ হচ্ছে :

Educating girls has a wide-ranging impact on society and human development. Long-term benefits include :

Enhanced economic development : decades of research have found an important link between the expansion of basic education and economic development. Girl's education has an even more positive effect.

Education for next generation : Educated girls who become mothers are more likely to send their children to school, passing on and multiplying benefits.

The multiplier effect : Education has a positive influence in a child's life from health to protection from HIV/AIDS exploitative labour and trafficking.

Healthier families : When mothers are educated their children are better nourished and get sick less often.

Fewer maternal deaths : Women who have been educated are less likely to die during childbirth because they tend to have fewer children, better knowledge of health services during pregnancy and birth, and improved nutrition. (unicef. org)

সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য নারীশিক্ষার গুরুত্বের এই প্রেক্ষাপটে এসে যায় নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি। নারীর শিক্ষা ব্যতীত তার ক্ষমতায়নের প্রশ্ন আসে না, আবার নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া সমাজের উন্নতি তথা সামাজিক দারিদ্র্য দূর করাও যায় না। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় ইউনিসেভের রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ এই বাক্যটি : "Poverty cannot be reduced in any substantial manner without promoting women's empowerment." (unicef. org)। এই সূত্রেই নারীশিক্ষা-বিষয়ক আলোচনায় অনিবার্যভাবে এসে যায়

জেন্ডারচেতনা ও নারীবাদের (Feminism) কথা। নারীবাদী তত্ত্ব পৃথিবী জুড়ে নারীদের জন্য শিক্ষা-অধিকার সংরক্ষণ ও প্রয়োগের কথা ব্যক্ত করে (Madeleine Arnot, 2007 : 207)। শিক্ষায় নারীবাদী তত্ত্ব মনে করে লিঙ্গ বা জেন্ডার হচ্ছে সামাজিক বিষয়, অতএব তা একটি সামাজিক নির্মাণ (social construction)। নারীবাদী তত্ত্ব সমাজের কোন ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীকে ঠেলে দেওয়া হয় প্রান্তে, তা ব্যাখ্যা করে এবং প্রান্তবর্তী নারীকে আনতে চায় কেন্দ্রে—পুরুষের অধস্তনতা থেকে মুক্তি দিতে চায় নারীকে (Henry Giroux and Paulo Freire, 2017, www. tandfonline.com)। নারীবাদী আন্দোলন নারীশিক্ষাকে প্রবলভাবে সামনে নিয়ে এলো—বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি করল প্রবল অভিঘাত। এই অভিঘাত সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> While the feminist movement has certainly promoted the importance of the issues attached to female education, discussion is wide-ranging and by no means confined to narrow terms of reference : it includes for example AIDS, Universal education, meaning state-provided Primary and Secondary education independent of gender, is not yet a global norm, even if it is assumed in most developed countries. (https : //www. definitions.net)

নারীশিক্ষার সঙ্গে নারীবাদী তত্ত্বের সরাসরি সম্পর্কের কথা সমালোচকেরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কেননা, নারীবাদই শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার-অসমতার কথা প্রথম গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করে। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় নিম্নোক্ত ভাষ্য : “Feminist theory aims to understand the mechanisms and roots of gender inequality in education, as well as their societal repercussions. Like many other institutions of society, educational systems are characterized by unequal treatment and opportunity for women. Almost two-thirds of the world’s 862 million illiterate people are women, and the illiteracy rate among women is expected to increase in many regions, especially in several African and Asian countries. ... When women face limited opportunities for education, their capacity to achieve equal rights, including financial independence, are limited. Feminist theory seeks to promote women’s rights to equal education (and its resultant benefits) across the world. (www.unesco. org.)

শিক্ষার নারীবাদী সমাজতত্ত্ব (Feminist Sociology of Education) শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন করে। শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণই শিক্ষার নারীবাদী সমাজতত্ত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য। সামাজিক স্তরবিন্যাস ও শিক্ষার অসমতা (social stratification and educational inequality), জ্ঞানের ক্রমোচ্চপর্যায় এবং পাঠক্রমের অভ্যন্তরে অযৌক্তিক মূল্যচেতনা (the

hierarchies of knowledge and the arbitrary values underlying the curriculum), এবং আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে রাষ্ট্র, অর্থনীতি এবং পরিবারের ভূমিকা (the role of state, economics and family in modern education systems)—এই ত্রিবিধ বিষয় ব্যাখ্যা করতে চায় শিক্ষার নারীবাদী সমাজতত্ত্ব। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য Jo-Anne Dillabough এবং Madeleine Arnot-এর বক্তব্য :

> Feminist sociology of education is one of the richest veins within the discipline today. Although its specific contribution is the analysis of gender relations in education, it has added substantially to an understanding of the broader relationship between education and society. ... Bearing many of the hallmarks of the postwar social democratic period in which the women's movement gathered pace, feminist sociology of education has engaged vigorously and with some success in the analysis of, for example : educational inequality and social stratification ; the hierarchies of knowledge and the arbitrary values underlying the curriculum ; and the role of the state, economy and family in modern education systems. (Jo-Anne Dillabough and Madeleiene Arnot, 2001 : 30)

শিক্ষার সঙ্গে নারীবাদের এই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নারীশিক্ষা চিন্তায় এনেছে ব্যাপক পার্থক্য। প্রাক-বিশ শতকী নারীশিক্ষার সঙ্গে বিশ শতকী বা তার পরবর্তী নারীশিক্ষার গুণগত ও মৌলিক পার্থক্য গড়ে দিয়েছে নারীবাদী চিন্তা ও জেন্ডারচেতনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ বর্তমান কালের চোখ দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে, তাই নারীবাদের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

নারীবাদ (Feminism) হচ্ছে নারীর চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখার একটি সমাজদর্শন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে নারীবাদ নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যমূলক পুরুষকেন্দ্রিক একটি সমাজব্যবস্থা হিসেবেই বিবেচনা করে। *Oxford Advanced Learner's Dictionary*-তে নারীবাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে : "the belief and aim that women should have the same rights and opportunities as men." (*Oxford Advanced Learner's Dictionary,* 2000 : 466)। পক্ষান্তরে *Cambridge Dictionary*-তে বলা হয়েছে : নারীবাদ হচ্ছে "An organized effort to give the women same economic, social and political rights as men". (*Cambridge Dictionary,* 2007 : 336)। বস্তুত, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর জন্য পুরুষের মতো সমান অধিকার নিশ্চিত করার সমন্বিত উদ্যোগকেই নারীবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নারীবাদ হচ্ছে এমন একটি বিশ্বাস, যে বিশ্বাস থেকে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজস্থ একজন নারীর পুরুষের সমান অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে যাওয়াকে বুঝায়। লৈঙ্গিক পরিচিতি ছাড়াই মানুষের স্বাধীনতা আর সমান অধিকারের কথা বলে নারীবাদ। নারী ও পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে নারীবাদ। নারীবাদ নারীকে নারী হিসেবে নয়, বরং মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে। প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচিতির উর্ধ্বে উঠে নারীবাদ নারীকে বিবেচনা করতে শেখায় সামাজিক জেন্ডারচেতনায়। মুক্ত জ্ঞানকোষ উইকিপিডিয়া নারীবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে :

> Feminism is a range of political movements, ideologies, and social movements that share a common goal : to difine, establish, and achieve political, economic, personal and social equality of sexes. This includes seeking to establish educational and professional opportunities for women that are equal to such opportunities for men. (https : //en. wikipedia. org./wiki/Feminism).

নারীবাদী দর্শন ও আন্দোলনের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য সমাজে বিদ্যমান নানামাত্রিক লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করা, নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান করা। নারীবাদ নারীর ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সামাজিক সমতা, নির্বাচনে ভোটাধিকার, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, সমশিক্ষার অধিকার, বৈবাহিক জীবনে সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার, রাজনীতি ও ব্যবসায়ে সমান সুযোগ, সমান কাজে সমান বেতন, মাতৃত্ব-অবসর—ইত্যাদি নারীবাদী সমাজদর্শনের মৌলিক দাবি। তাত্ত্বিকদের আলোচনার সূত্র ধরে নারীবাদ সম্পর্কে স্ফটিকসংহত যে ধারণা পাওয়া যায়, তাতে একথা স্পষ্ট যে নারীবাদ হচ্ছে একটি সমতার দর্শন। নারী ও পুরুষ সমান, তাদের অধিকার অভিন্ন—এ-ই হচ্ছে নারীবাদ (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪ : ৩৭২)। নারীবাদীরা মনে করেন, মৌল যোগ্যতায় কোনো পার্থক্য নেই নারী ও পুরুষে—তাদের মূল এবং অভিন্ন পরিচয় তারা মানুষ। এই সূত্রে জেন্ডারের সঙ্গে নারীবাদের ভাবগত সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। জেন্ডারচেতনাও নারী ও পুরুষের মধ্যকার সামাজিক বৈষম্যকে সন্ধান করে এবং পরাক্রমশীল পুরুষতন্ত্র থেকে মুক্ত করতে চায় নারীকে। জেন্ডারের সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক Jame Lothian Murray, Rick Linder এবং Diana Kendall যা লিখেছেন, এখানে তা প্রণিধানযোগ্য :

> Gender refers to the culturally and socially constructed differences between females and males found in the meanings, beliefs, and practices associated with `famininity' and `masculinity'. In contrast... sex refers to the biological and anatomical differences between females and males. Although biological differences between women and men are important, most `sex differences' are socially constructed `gender differences'. According to sociologists, social and cultural processes—not biological `givens'—are most important in defining

> what females and males are, what they should do, and what sorts of relations do or should exist between them. Virtually everything social in our lives is gendered. People continually distinguish between males and females and evaluate them differentially. Gender is an integral part of the daily experiences of both women and men. (Jame Lothian Murray and et. al., 2017 : 324)

—উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির আলোকে লিঙ্গ (sex) ও জেন্ডারের (Gender) পার্থক্য সহজেই শনাক্ত করা যায়। লিঙ্গ ও জেন্ডার এক নয়। জন্মগত বা প্রাকৃতিকভাবে একজন মানুষের যে লৌঙ্গিক বৈশিষ্ট্য তা-ই হচ্ছে sex বা লিঙ্গ। একজন পুরুষ বা একজন নারী পুরুষ বা নারী হয়ে জন্ম নেয়—জৈবিকভাবে পুরুষত্ব বা নারীত্বের যে বৈশিষ্ট্য তা-ই তার লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সমাজে একজন নারী সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হয়, তার অনেকটাই লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং তা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চাপিয়ে দেওয়া। সমাজস্থ পুরুষতন্ত্র নারীকে যেভাবে দেখতে শেখায়, নারী সম্পর্কে সমাজের ধারণা তা-ই হয়ে ওঠে। বুদ্ধি হবার পর থেকেই সমাজ বুঝিয়ে দেয় সে পুরুষ কিংবা নারী। ছেলেরা হয় কর্তৃত্বের অধিকারী, মেয়েরা হয় ভারবাহী। নারীকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যাতে সে থাকে অনুগত, বিনম্র এবং গৃহকেন্দ্রিক। নারী যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী না হতে পারে, পুরুষতন্ত্র সেদিকে রাখে সতর্ক দৃষ্টি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে একটি ছেলেকে পুরুষ এবং একটি মেয়েকে নারীর প্রতিমূর্তি হিসেবে নির্মাণ করে, তাকেই বলা হয় জেন্ডার। উনিশ শতকে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এই জেন্ডারচেতনার প্রভাব লক্ষ্য করি। সে-কালের অধিকাংশ সমাজনেতা জেন্ডারের ধারণা অনুসারেই নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক দৃষ্টিকোণে দেখেছেন, মানুষ হিসেবে দেখেননি। এখানেই রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনন্য ভূমিকার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। কত আগে তাঁরা নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ে না দেখে, দেখেছেন জেন্ডারচেতনায়।

নারীবাদ এবং সেই সূত্রে জেন্ডার প্রসঙ্গ চিন্তাজগতে ব্যাপক অভিঘাত তোলে বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে। ১৭৯২ সালে প্রকাশিত *A Vindication of the Rights of Woman* গ্রন্থে Mary Wollstonecraft ঘোষণা করেছিলেন : “নারীকে অশিক্ষিত রেখে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ, মায়েরাই সন্তানের প্রথম শিক্ষক” (Mary Wollstonecraft, 1983 : 144)। এর আগেও নারীদের পক্ষে অনেকে কথা বলেছেন, পরেও বলেছেন—কিন্তু বিশ শতকের সত্তরের দশক থেকেই তা একটা আন্দোলনে রূপ পরিগ্রহ করে। তবে নারীর পরাধীনতা এবং বঞ্চনার কারণগুলো সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা এবং নারী ও পুরুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখার প্রথম ব্যাখ্যাতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় (Miriam Williford, 1975)। Mary Wollstonecraft-এর *A Vindication of the Rights of Woman* প্রকাশের পর অতিক্রান্ত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় দুশ' ত্রিশ বছর। দীর্ঘ এই সময়পরিসরে নারীর অধিকার ও সমতাচেতনা নিয়ে নানামাত্রিক ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে—এক-এক সময় এক-একটি ভাবনার প্রাধান্য দেখা দিয়েছে। নারীর প্রকৃত মুক্তি কোথায়, কীভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে নারীর অধিকার, নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার দর্শন কী—এসব বিষয় নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যেও রয়েছে নানা মত, ভিন্নমত। এ কারণে নারীবাদে বেশ কয়েকটি তত্ত্বাদর্শ সৃষ্টি হয়েছে—যদিও প্রতিটি তত্ত্বই বিশ্বাস করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার নারীর স্বাধীনতা এবং পুরুষের সঙ্গে সাম্য। তত্ত্বগত ভিন্নতার কারণে নারীবাদ নিয়ে যে আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, আলোচনা ও আন্দোলনের গতিপথ যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে—বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য বিচার করে তাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। নারীবাদের ইতিহাসে এই প্রতিটি ভাগকে কেউ বা wave হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

নারীর ভোটাধিকার আদায়কে ঘিরে ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়ে গড়ে ওঠা চিন্তা ও আন্দোলনকে নারীবাদের প্রথম ঢেউ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক—এই কালপর্বকেই নারীবাদের প্রথম ঢেউ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নারীবাদের প্রথম ঢেউটির লক্ষ্য ছিল নারীর ভোটাধিকার তথা রাজনৈতিক অধিকার অর্জন। প্রথম ঢেউয়ের তাত্ত্বিকেরা মনে করতেন, নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেই তার রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটবে। নারীবাদের প্রথম ঢেউয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকাঠামোতে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি এবং পুরুষের সঙ্গে সমতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। তাত্ত্বিকেরা মনে করতেন ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান, মজুরি, মর্যাদা—সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটবে। প্রথম ঢেউয়ের সময় নারীবাদীরা ধর্মকে নারীবাদী লক্ষ্যের সঙ্গে সমন্বয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। বিশ শতকের শুরু থেকে নারীবাদী সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি রচিত হতে থাকে, যেখানে বিস্তৃত পরিসরে দেখানো হয়েছে সমাজে নারীর সক্রিয় ভূমিকা। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের *সুলতানার স্বপ্ন* এই দৃষ্টিকোণেই নারীবাদী রচনা, যেখানে দেখানো হয়েছে আগামী পৃথিবীর ছবি, যে-পৃথিবীতে নারী দখল করেছে পুরুষের স্থান।

১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হবার মধ্য দিয়ে শেষ হয় নারীবাদের প্রথম ঢেউ। নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউয়ে এসে তাত্ত্বিকেরা বলার চেষ্টা করলেন যে, কেবল ভোটাধিকার বা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে প্রকৃত নারীমুক্তি সম্ভব নয়। বরং তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো রাজনৈতিক অসমতার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতসমূহ (Estelle B. Freedman, 2003 : 464)। ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও দেশে-দেশে পুরুষতন্ত্রের পরাক্রমের কাছে নারীর মুক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়েই চলছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সে বিবাহিত নারীদের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোনো কাজে যোগদানের অধিকার ছিল না (Eleanor Flexner, 1996 : xxviii-xxx)। দ্বিতীয় ঢেউয়ের তাত্ত্বিকরা নারীর

Dhaka University Institutional Repository

উপর পুরুষের যৌন আধিপত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। নারী কীভাবে পুরুষের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় এ বিষয়টি বিশদ ব্যাখ্যা করলেন ফরাসি দার্শনিক সিমোন দ্য বোভোয়ার (১৯০৮-১৯৮৬) তাঁর সাড়া জাগানো *The Second Sex* (1949) গ্রন্থে। বোভোয়ারের এই গ্রন্থটিই হয়ে ওঠে নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউয়ের আত্মিক প্রেরণা। 'women as other' শব্দত্রয় ব্যবহার করে গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি দেখালেন যে, নারীর ধারণা আসলে পুরুষের ইচ্ছার প্রতিফলন। নারী নিজের কাছেই কেউ নয়, সে অন্য কেউ, অপর বা other, তার নেই কোনো নিজস্বতা। তিনি উচ্চারণ করলেন নারীবাদের মৌল দর্শন : 'One is not born, but rather becomes, a woman' (Simone de Beauvoir, 1974 : 17)। নারীর হারিয়ে যাওয়া অস্তিত্বকে আবিষ্কারের সংগ্রামে বোভোয়ারের ভাবনা নারীবাদীদের কাছে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা হিসেবে দেখা দেয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া নারীমুক্তি সম্ভব নয় বলে বোভোয়ার যে অভিমত ব্যক্ত করেন, নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউয়ের অনেক তাত্ত্বিকই তা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ফ্রাঁসোয়া থ্যাবু, ন্যান্সি এফ. কট, ভার্জিনিয়া উলফ, বেটি ফ্রিডান, ক্যারল হানিচ, কেট মিলেট—প্রমুখ লেখক-তাত্ত্বিক নানামুখী আলোচনা দিয়ে নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউটিকে সমৃদ্ধ ও বেগবান করেন। আমেরিকার নারীবাদী সংগঠক কেট মিলেট *Sexual Politics* (1970) গ্রন্থে উল্লেখ করেন—সংস্কৃতি ও রাজনীতির গভীরে প্রোথিত পরাক্রমশীল পুরুষতন্ত্রের শেকড়। এই পুরুষতন্ত্রকে অস্বীকার করার জন্য নারী-বিপ্লব সংগঠনের কোনো বিকল্প নেই (Julie Bindel, 2017)। ক্যারল হানিচ *The Personal is Political* (1970) গ্রন্থে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হওয়াকেই নারীবাদের একমাত্র কাজ বলে মন্তব্য করেছেন (Carol Hanisch, 1970 : 43-65)। এভাবে নারীবাদের দ্বিতীয় ঢেউ বিশ্ব শতকী চিন্তার জগতে প্রবল আলোড়ন তুলে সত্তরের দশকে তৃতীয় ঢেউতে পা রাখলো।

১৯৭০-এর পর থেকে আরম্ভ হয় নারীবাদের তৃতীয় ঢেউ। *The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Revolution* (1970) গ্রন্থে শুলামিথ ফায়ারস্টোন নারী ও পুরুষের ভিন্নতার কথা বললেন এবং ভিন্নতা দূর করার জন্য নারী-বিপ্লবের আহ্বান জানালেন। সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের সহায়তায় দূর করতে হবে নারী-পুরুষের অসমতা—ফায়ারস্টোনের এই ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে নারীবাদী দার্শনিক মেরি অ্যান ওয়ারেল লিখলেন এইকথা : কাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থায় লৈঙ্গিক বিভাজনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বৈষম্যের বীজ। এই বৈষম্যকে দূর করেই নারীর অস্তিত্বকে দৃশ্যমান করে তুলতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে আন্দোলন (Judith Butler, 1988 : 519-31)। ফায়ারস্টোনের মতো জুডিথ বাটলারও নারী ও পুরুষের ভিন্নতাকে জৈবিক, জেন্ডার, সংস্কৃতি ও বাস্তবতার অনুষঙ্গে বিবেচনার কথা বলেছেন। পূর্ববর্তী নারীবাদীরা যেভাবে পুরুষ ও নারীকে একইভাবে বিচার করে, জুডিথ বাটলার তার সমালোচনা করেন। বাস্তবতার বাইরে গিয়ে বিষয়টিকে

বিবেচনা করলে জীবন অসম্ভব হয়ে উঠবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন (Judith Butler, 2004 : 157)। ফায়ারস্টোন এবং বাটলারের বিশ্লেষণে আছে একটি সমাধানের ইঙ্গিত। এরই সূত্র ধরে নবীন তাত্ত্বিকরা নারীবাদের চতুর্থ ঢেউয়ের কথা বলেছেন। কিরা কোচরেন *All the Rebel Women : The Rise of the Fourth Wave of Feminism* (2013) গ্রন্থে বলেছেন, নারীবাদের চতুর্থ ঢেউ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত (Kira Cochrane, 2013 : 98)। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব-নব আবিষ্কার মানুষকে এমন এক যুগে নিয়ে যাবে, যা দূর করবে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সব ধরনের বৈষম্য। এটাকেই বলা হচ্ছে নারীবাদের চতুর্থ ঢেউ।

ইতঃপূর্বে ব্যক্ত হয়েছে যে নারীবাদের বিভিন্ন পর্বের তাত্ত্বিকদের মধ্যে ভাবনাগত নানা পার্থক্য রয়েছে। এই ভাবনার কারণে নারীবাদকে কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়। তত্ত্বাদর্শ অনুসারে নারীবাদের প্রধান ভাগগুলো হচ্ছে রক্ষণশীল মতবাদ (Conservative Dogma), উদার নারীবাদ (Liberal Feminism), র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (Radical Feminism), মার্কসীয় নারীবাদ (Marxist Feminism), সাংস্কৃতিক নারীবাদ (Cultural Feminism), পরিবেশ নারীবাদ (Eco Feminism) এবং উত্তর-আধুনিক নারীবাদ (Post-modernist Feminism)। রক্ষণশীল মতবাদটি নারীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে না নারীমুক্তিতে ; পক্ষান্তরে অন্য মতবাদগুলো বিশ্বাস করে নারীর স্বাধীনতা ও সামূহিক মুক্তিতে।

রক্ষণশীল মতবাদ (Conservative Feminism)

রক্ষণশীল মতবাদ একান্তভাবেই নারীমুক্তি বিরোধী। পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতায় বিশ্বাস করে রক্ষণশীল মতবাদীরা। এই মতবাদ মনে করে সমাজে প্রথাগতভাবে নারী যেভাবে আছে, সেটাই ঠিক এবং নারীকে সেভাবেই থাকতে হবে। রক্ষণশীলরা মনে করেন সমাজে ও সংসারে নারী ও পুরুষের কাজ ও ভূমিকা ভিন্ন—ভিন্ন ভূমিকা পালন করাই তাদের মূল দায়িত্ব। রক্ষণশীলরা মনে করেন পুরুষ শ্রেষ্ঠ, নারী নিকৃষ্ট। তাঁদের মতে নারী-পুরুষ একই কাজের উপযুক্ত নয়, পুরুষ উপযুক্ত উৎকৃষ্ট কাজের আর নারী উপযুক্ত নিকৃষ্ট কাজের। তাই নিকৃষ্ট কাজই পালন করবে নারী। তাঁদের মতে এটা অন্যায় নয়, বরং ন্যায়—কেননা নিকৃষ্টকে নিকৃষ্টরূপে রাখাই ন্যায়। রক্ষণশীল মতবাদীরা নারীকে কীভাবে দেখেছেন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন : "রক্ষণশীলদের মতে কোনো কোনো নারী পোহায় নানা দুর্ভোগ, তবে সমাজ নারীদের সুপরিকল্পিতভাবে পীড়ন করে না। রক্ষণশীলেরা মনে করেন নারীর যে-অবস্থা, তা প্রকৃতি-নির্ধারিত, বা বিধাতার নির্দিষ্ট ; প্রকৃতি বা বিধাতাই ঠিক করে দিয়েছে যে নারী-পুরুষ অসম—পুরুষ প্রভুত্ব করবে, নারী থাকবে তার অনুগত। এটা কোনো অন্যায় নয়, এটা ধ্রুব বিধান" (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪ : ৩৭২)।

উদার নারীবাদ (Liberal Feminism)

উদার নারীবাদী তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা দেখা দেয় মেরি ওলস্টোনক্রাফ্টের *A Vindication of the Rights of Woman* গ্রন্থে। আর এ তত্ত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে জন স্টুয়ার্ট মিলের *The Subjection of Women* (1869)-এ (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪ : ৩৭৩)। মানুষ হিসেবে পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে একজন নারীর প্রাপ্য অধিকারের দাবি নিয়ে নারীবাদের যাত্রা শুরু হয়। যে-সব বিধি-বিধান ও প্রচলিত ধারণা নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে, তা পরিবর্তনই নারীবাদের প্রধান দাবি। ঐতিহাসিক এই ধারাটিকেই বলা হয় উদার নারীবাদ। উদার নারীবাদ সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধস্তনতার কারণগুলো শনাক্ত করে তা দূর করার চেষ্টা করে। নারীমুক্তির পথে বাধাস্বরূপ যে আইন-বিধি-বিধান-প্রথা তা সংস্কার ও সংশোধনের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের অসাম্য দূর করার ভেতর দিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই উদার নারীবাদের লক্ষ্য। উদার নারীবাদের সামূহিক বৈশিষ্ট্য নিচের উদ্ধৃতিতে সম্যক প্রকাশিত :

> In liberal feminism, gender equality is equated with equality of opportunity. Liberal feminists assume that women's inequality stems from the denial to them of equal rights. Liberal feminism strives for sex equality through the elimination of laws that differentiate people by gender. Only when these constraints on wemen's participation are removed will women have the same chance of success as men. This approach notes the importance of gender-role socialization and suggests that changes need to be made in what children learn from their families, teachers, and the media about appropriate masculine and feminine attitudes and behaviour. Liberal feminists fight for better child-care options, a women's right to choose an abortion, and elimination of sex discrimination in the workplace. (Jane Lothian Murray and et. at., 2017 : 341)

মতাদর্শগতভাবে উদার নারীবাদ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। উদার নারীবাদ নারীর প্রতি পুরুষের সকল ধরনের অমানবিক আচরণ বন্ধ করে নারীর অধিকার ও অধিকার আদায়ের চর্চার মাধ্যমে পূর্ণ মানুষ হবার কথা বলে (Kira Cochrane, 2013 : 67)। উদার নারীবাদ বিদ্যমান সমাজ কাঠামোকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দিয়ে নয়,বরং সমাজ ও রাষ্ট্রিক কাঠামো সংস্কার ও সংশোধনের মাধ্যমে নারীমুক্তির পথ নির্মাণের কথা বলে। প্রচলিত পুঁজিবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার র‍্যাডিক্যাল পরিবর্তন না করেই শুধু সংস্কারের মাধ্যমে নারীমুক্তি সম্ভব—এমন মতবাদের কারণে উদার নারীবাদকে 'পুঁজিবাদী নারীবাদ' (Capitalist Feminism) বলেও আখ্যায়িত করা হয়। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের সঙ্গে উদার নারীবাদের ভাবনাসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় এই

ধারা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং এটিই নারীবাদের প্রধান ধারা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এ কারণে উদার নারীবাদী ধারাকে 'মূলধারার নারীবাদ' বা Mainstream Feminism বলেও কোনো-কোনো গবেষক উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, নারীর ব্যক্তিগত বিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণ মানুষ হওয়ার আহ্বান জানায় বলে উদার নারীবাদকে 'ব্যক্তিকেন্দ্রিক নারীবাদ' (Individualistic Feminism) হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়।

উদার নারীবাদের প্রধান লক্ষ্য বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন করে সামাজিক-রাষ্ট্রিকভাবে নারীর অবস্থান উন্নত করা। উদার নারীবাদের মূল কথা হচ্ছে পুরুষ যেমন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, নির্বাচন করে আপন ভূমিকা—নারীকেও তেমনি দিতে হবে সমাজে প্রতিষ্ঠার এবং নিজের ভূমিকা নির্বাচনের অধিকার। উনিশ শতকে উদার নারীবাদীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভোটাধিকার পাওয়া, কিন্তু তা পাওয়ার পর দেখা গেল নারীর জন্য এখনো অনেক অধিকারই অপূর্ণ থেকে গেছে, কেননা সমাজে ও রাষ্ট্রে বিদ্যমান আছে নারীমুক্তি-বিরোধী অনেক আইন ও প্রথাগত বাধা। এসব বাধার কারণে শিক্ষা, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উদার নারীবাদী তাত্ত্বিকদের দাবি হচ্ছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন করে দূর করতে হবে এসব বাধা, প্রতিষ্ঠা করতে হবে নারী ও পুরুষের জন্য সমান নাগরিক অধিকার। উদার নারীবাদের পরিচয় দিতে গিয়ে *নারী* (১৯৯২) গ্রন্থের রচয়িতা হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন :

> এ মতবাদের [উদার নারীবাদ] বক্তব্য হচ্ছে কোনো ভূমিকায় প্রতিষ্ঠার জন্যে বিবেচনা করতে হবে শুধু ব্যক্তিকে, ব্যক্তির যোগ্যতাকে, আর কিছু নয়। প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণের কোনো মূল্য নেই ; তাই বিচার করতে হবে শুধু ব্যক্তিটিকে। উদার নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাষ্ট্র যতো কম হাত দেয়, ততোই ভালো ; তাই রাষ্ট্রের নারীর ওপর অভিভাবকত্বের কোনো দরকার নেই। নারীকে আগে থেকেই বিশেষ কোনো ভূমিকায় আটকে ফেলা অন্যায় ; নারী সব ভূমিকায় নিজেকে পরখ করে একদিন নিজেই দেখবে সে কোন ভূমিকায় উপযুক্ত। (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪ : ৩৭৩)

উনিশ শতকে ভোটাধিকারের প্রশ্নে নারীদের যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তাতে উদার নারীবাদীদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। এ সময় নারীবাদের প্রবক্তা হিসেবে মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট, জন স্টুয়ার্ট মিল, হেলেন টাইলরের নাম উদার নারীবাদের প্রবক্তা হিসেবে সামনে চলে আসে। জন স্টুয়ার্ট মিল ঘোষণা করলেন নারী আর পুরুষের প্রকৃত সম্ভাবনা তখনই বোঝা যাবে, যখন তাদের দু'জনকে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের মতো চর্চা করার সুযোগ দেওয়া হবে। মিলের ভাষায় : 'What is natural to the two sexes can only be found out by allowing both to develop and use their faculties freely". (John Stuart Mill, 2012 : 129)। ওলস্টোক্রাফ্‌ট নারীকে প্রকৃতিগতভাবে অরাজনৈতিক ও বিনোদনময়ী হিসেবে দেখার তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন, পুরুষেরা যদি নারীর মতো

Dhaka University Institutional Repository

খাঁচায় বন্দি জীবন যাপন করতো, তাহলে তাদের চরিত্রও এমন হতো (Suzanne Marilley, 1996 : 9)। এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটন, ব্রেটি ফ্রিডান, গ্লোরিয়া স্টেনাম, রেবেকা ওয়াকার প্রমুখ উদার নারীবাদী তাত্ত্বিকদের সাধনায় নারীবাদের এই ধারা পায় সংঘবদ্ধ রূপ। এঁরা প্রত্যেকেই কাজ করেছেন সমাজে লিঙ্গগত বৈষম্য দূরা করা এবং নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

উদার নারীবাদীদের মতে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিকারী যত আইন ও বিধি-বিধান আছে, তা সব অবৈধ। এসব অবৈধ আইন বাতিল করে নারী-পুরুষের জন্য সমতার আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উদার নারীবাদীরা চাকুরি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য অসম বেতনহার নিষিদ্ধ করার কথা বলে, যে-সব পেশায় নারীবিরোধী আইন আছে তা বাতিল করার দাবি উত্থাপন করে। তাঁরা দাবি করেন যে, দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূর করার জন্য, এখন অনেক পেশায় পুরুষ না নিয়ে নারীদের নিতে হবে, বাইরের কাজে অক্ষম নারীদের দিতে হবে বিশেষ ভাতা। নারীদের দিতে হবে মাতৃত্বকালীন বা প্রসব ছুটি, কেননা সন্তান জন্ম দেওয়া ব্যক্তিগত কোনো বিষয় নয়, এটা সমাজসেবা। সন্তান লালন-পালনের দিকেও তাঁরা বিশেষ নজর দেন। নারীর প্রধান কাজ হচ্ছে সন্তান জন্ম দেওয়া ও লালন-পালন করা—রক্ষণশীলদের এমন মতবাদের বিরোধিতা করে উদার নারীবাদীরা বললেন সন্তান লালন-পালন শুধু নারীর কাজ নয়, তা পুরুষেরও কাজ ; তাই পুরুষকেও তাতে সমান অংশ নিতে হবে। উদার নারীবাদের মতে, নারী-পুরুষের বৈষম্য প্রাকৃতিক নয়, তা একান্তই সমাজের সৃষ্টি। প্রচলিত শিক্ষা নারী-পুরুষ বৈষম্য সৃষ্টির প্রধান এক অস্ত্র রক্ষণশীলদের—এমন কথায় বিশ্বাস করে উদার নারীবাদী তাত্ত্বিকরা। তাঁরা মনে করেন, নারী ও পুরুষকে দিতে হবে একই রকম শিক্ষা, যাতে তারা সমতার দৃষ্টিতে নিজেদের শক্তি ও সম্ভাবনা যাচাই করতে পারে। সমালোচকরে মতে "উদার নারীবাদীদের কাছে নারীস্বাধীনতা হচ্ছে নারীর সামাজিক ভূমিকা নিজে স্থির করার, এবং পুরুষের সাথে সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাতে সুষ্ঠুভাবে ঘটতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তাঁরা মনে করেন না যে নারীমুক্তির জন্যে বদলে দিতে হবে সমগ্র সমাজসংগঠন ; এও মনে করেন না যে সব নারী একই সময়ে লাভ করবে মুক্তি। তাঁরা মনে করেন সবাই মুক্তি পাওয়ার অনেক আগেই কোনো কোনো নারী মুক্তি পেতে পারে। তাঁরা মনে করেন নারীমুক্তি শুধু নারীরই মুক্তি ঘটাবে না, ঘটাবে পুরুষেরও মুক্তি ; এতে পুরুষের কিছু অবৈধ সুবিধা কমলেও পুরুষ মুক্তি পাবে সংসারের ভরণপোষণ ও দেশরক্ষার দায়িত্ব থেকে।" (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪ : ৩৭৪)

বিশ শতকের সত্তরের দশকে নারীবাদকে তৃতীয় ঢেউ শুরুর পর থেকে উদার নারীবাদের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে বৈশ্বিক কর্মকাঠামোয় নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। রেবেকা ওয়াকার এই মতের

প্রবক্তা। মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট যখন নারীর অধিকারের কথা বলেন, জন স্টুয়ার্ট মিল যখন মানুষের ইতিহাসকে নারীর উপর পুরুষের দাসত্ব হিসেবে আবিষ্কার করেন এবং সমাজ উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষের ন্যায্য সমতাকে (perfect equality) অপরিহার্য বলে বিবেচনা করেন—তখন তা উদার নারীবাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর প্রবল আন্দোলনের কারণেই ১৮২৯ সালে ইংরেজ সরকার সতীদাহ নিষিদ্ধ করে আইন পাস করেন। রামমোহনের এই আন্দোলন উদার নারীবাদী চেতনার অনন্য উদাহরণ। অভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিবেচনা করা যায় নারীমুক্তির জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্ম ও সাধনাকে। বাংলায় নারীজীবনের ভয়ংকর এক অভিশাপ ছিল কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ করার প্রবণতা। এক কুলীন স্বামীর মৃত্যু হলে অনেক নারী বিধবা হতেন, তাদের কাটাতে হতো মানবেতর জীবন। দুর্বিষহ এই অবস্থা থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি নারীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনেকটা একক হাতে বহুবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ চালুর জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। বাল্যবিবাহকেও তিনি নারীমুক্তির অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করে এই প্রথা নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন। বিদ্যাসাগরের এই সমুদয় কাজই উদার নারীবাদী চিন্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। নারীমুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার জন্য নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন একের পর এক বালিকা বিদ্যালয়, রচনা করেছেন বহু পাঠ্যপুস্তক। এসব কিছুই উদার নারীবাদী চেতনার বিশিষ্ট উদাহরণ। সমাজকাঠামোর মধ্যে থেকেই সংস্কারের মাধ্যমে তা সংশোধন ও পরিবর্তনের কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। বহুবিবাহ বন্ধ, বিধবাবিবাহ চালু, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ এবং নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের কর্ম ও চিন্তা প্রকৃত প্রস্তাবেই উদার নারীবাদী চেতনার সঙ্গে একান্তই অভিন্ন এবং সাদৃশ্যপূর্ণ।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী (Radical Feminism)

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ নারীবাদী তত্ত্ব-চিন্তার মধ্যে সবচেয়ে বৈপ্লবিক সমাজদর্শন। নারীবাদের এই ধারা পুরুষকে নারীর প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। বর্তমান রাষ্ট্রকাঠামো পুরুষতান্ত্রিক বলে নারীর মুক্তির জন্য র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ রাষ্ট্রকাঠামো পালটে দেওয়ার আহ্বান জানায়। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ মনে করে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামই নারীর জন্য প্রথম এবং অনিবার্য সংগ্রাম—এই সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতিতে নারীকে দাঁড়াতে হবে রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের সামূহিক বৈশিষ্ট্য সমাজতাত্ত্বিকের ব্যাখ্যায় উঠে এসেছে এভাবে :

> According to radical feminists, male demination causes all forms of human oppression, including racism and classism. Radical feminists often trace the roots of patriarchy to women's childbearing and child-rearing responsibilities,

Dhaka University Institutional Repository

> which make them dependent on men. In the radical feminist view, men's oppression of women is deliberate, and other institutions, such as the media and religion, provide ideological justification for this subordination. For women's condition to improve, radical feminists claim, patriarchy must be abolished. If institutions currently are gendered, then alternatiive institutions–such as women's organizations seeking better healthcare, daycare, and shelters for victims of domestic violence and sexual assault–should be developed to meet women's needs. (Jane Lothian Murray and et. al., 2017 : 341-42)

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা লৈঙ্গিক পীড়নকেই পুরুষ কর্তৃক নারীকে অধস্তন করে রাখার প্রধান অস্ত্র বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন নারী যে পুরুষের অধীন তার মূল কারণ জৈবিক—গর্ভধারণ করতে গিয়েই নারী মেনে নিতে বাধ্য হয় পুরুষের অধীনতা। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে নারীর উপর আদি ও মৌলিক পীড়ন হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক শারীরিকভাবে নারীকে অধীনে নিয়ে আসা। তাঁরা মনে করেন দেহই নারীর নিয়তি—এই নিয়তি থেকেই মুক্তি দিতে হবে নারীকে। পুঁজিবাদ বা বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের কাছে গৌণ বিষয়, তাঁদের মূল সংগ্রাম হচ্ছে লিঙ্গবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা মনে করেন নারীর অধীনতা মূলত জৈবিক, তাই নারীমুক্তির জন্য দরকার জৈবিক বিপ্লব (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪ : ৩৭৬)। বোভ্যোয়ার, মিলেট, গ্রিয়ার প্রমুখের লেখায় র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী ভাবনার উন্মেষ ঘটে, তবে তা প্রবল রূপ পরিগ্রহ করে টাই-গ্রেস অ্যাটকিনসন ও শুলামিথ ফায়ারস্টোনের লেখায়। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা মনে করেন, গর্ভধারণ নারীর জন্য অবধারিত নয়, মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব একা নারীর নয়। পুরুষকেও এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই মৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক—এসব গৌণ বিষয়ও পাল্টাতে হবে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা এমন কথাও বলেছেন যে, নারী আর গর্ভধারণ করবে না, শিশু পালন করবে না ; কৃত্রিম উপায়ে জন্ম দিতে হবে সন্তান, আর সমাজ বহন করবে তার লালন-পালনের দায়িত্ব। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে, প্রযুক্তি শুধু নারীকে গর্ভধারণের দায় থেকে মুক্তি দেবে না, পরিশেষে তা মুক্তি দেবে নারী-পুরুষ উভয়কেই কাজ করার দায় থেকে। সাম্য বলতে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা শুধু সুযোগ-সুবিধার সাম্য বোঝেন না, বোঝেন সন্তান ধারণ না করারও সাম্য। তাঁদের মতে জৈবিক বিপ্লবের মাধ্যমে সনাতন পরিবার ধারণা বিলুপ্ত হলে লোপ পাবে যৌন পীড়ন। তখন কে কার সাথে, ও কোন ধরনের যৌনসম্পর্কে জড়িত হবে, তা স্থির করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে প্রতিটি নর-নারীর। তখন সমকাম পুরুষের সাথে পুরুষের, নারীর সাথে নারীর নিন্দিত থাকবে না, বিকল্প বলেও গণ্য হবে না—যে যার

রুচি মতো বেছে নেবে বিশেষ ধরনের যৌনসম্পর্ক ও যৌনসঙ্গী। উদার নারীবাদীদের মতে সমকাম বিষমকামের বিকল্প, মার্কসীয়দের মতে সমকাম পুঁজিবাদী বিকৃতি, আর র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে সমকাম একটি স্বাভাবিক বিষয়। তাঁদের মতে জৈবিক বিপ্লবের ফলে 'সমকাম', 'বিষমকাম' প্রভৃতি ধারণাই লোপ পাবে, লোপ পাবে ' যৌনসঙ্গম' নামের আদিম 'সংস্থা'টিও (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪ : ৩৭৬)। তবে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের এইসব ধারণা অনেকেই বিশেষত মার্ক্সীয় নারীবাদীরা ইউটোপীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের বক্তব্য যথেষ্ট ঝাঁজালো ও বিদ্রোহাত্মক। তাঁরা অস্বীকার করতে চায় সনাতন বিবাহপ্রথাকেই। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে, বিবাহ প্রথাই হচ্ছে নারীর পরাধীনতার প্রধান কারণ। শুলামিথ ফায়ারস্টোন বলেছেন—নারী যখন সন্তান ধারণ করে, যখন সন্তান জন্ম দেয় এবং যখন তার সন্তানকে বড় করার দায়িত্ব নেয়—নারী তখনই শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুরুষের কাছে বন্দি হয়ে পড়ে (Shulamith Firestone, 1982 : 79)। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ মনে করে পুরুষতন্ত্র বা পিতৃতান্ত্রিকতাই সকল শোষণের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মূল উৎস। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী তাত্ত্বিক টাই-গ্রেস অ্যাটকিনসনের মতে, মানব-প্রজাতির অর্ধেক অংশ (পুরুষ) কর্তৃক অর্জনের জন্য অর্ধেক মানুষকে (নারী) সন্তান উৎপাদনের মধ্যে বন্দি করল, —যা আসলে সন্তানের নয়, শয়তানের ভার বহন করার অসহনীয় অবস্থার ভিতর তাদের ফেলে দিল (Ti-Grace Atkinson, 2000 : 139)

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ নারীর জন্য একটা মুক্ত স্বাধীন পৃথিবীর কল্পনা করেছে। এজন্য তাঁরা নারী-পুরুষের সম্পর্ককেই অস্বীকার করেছে। নর-নারীর প্রথাগত সম্পর্ককে অস্বীকার করে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা পুরুষকে বাদ দিয়ে নারীর স্বপ্নের জায়গা থেকে নারীর সঙ্গে নারীর সমকামী সম্পর্ককে বিকল্প সম্পর্ক হিসেবে কল্পনা করেছেন (রোখসানা পারভীন চৌধুরী, ২০১৮ : ৪১)। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা নারীর পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নারীবাদী লেখক এমা গোল্ডম্যান, যাঁকে বলা হয় র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের পথ-প্রদর্শক, ১৮৯৭ সালে ঘোষণা করেন ; 'আমি নারীর স্বাধীনতা চাই, সে যেন নিজে নিজেকে সাহায্য করতে পারে, নিজের জন্য বাঁচতে পারে, যাকে খুশি ভালোবাসতে পারে এবং যা খুশি তা-ই করতে পারে (Quoted in Ti-Geace Atkinson, 2000 : 94)। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী কেট মিলেট তাঁর *Sexual Politics* (1969) গ্রন্থে বিপ্লবের সংজ্ঞার্থ পাল্টে দিলেন—তাঁর মতে বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে নারী আর পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা পাল্টে দেওয়া (Kate Millet, 1978 : 129)।

Dhaka University Institutional Repository

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী ভাবনার বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। বিপ্লবাত্মক বক্তব্য এবং প্রকাশের উগ্রতার কারণে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদকে পুরুষতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উগ্র বা অরাজক নারীবাদ (Anarchist Feminism) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (S. Gemie, 1996)। তবু একথা অনস্বীকার্য যে, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী আন্দোলনের ফলে নারী-উন্নয়নে অনেক ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। সমকামিতাকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য বলে ভাবা হলেও এখন অনেক দেশেই সমকামিতা বৈধতা পেয়েছে, বৈধতা পেয়েছে নারীর গর্ভপাত। চাকরি ক্ষেত্রেও অধিকাংশ দেশেই এখন আর নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করা হয় না। নারীর দৃষ্টিকোণে এমন অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের আন্দোলনের কারণে।

মার্কসীয় নারীবাদ (Marxist Feminism)

মার্কসীয় নারীবাদের দার্শনিক ভিত্তি কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) সমাজবাদী দর্শন। মার্কসীয় নারীবাদকে এ কারণে সমাজবাদী নারীবাদ (Socialist Feminism) নামেও আখ্যায়িত করা হয়। মার্কসীয় নারীবাদীদের মতে, ব্যক্তি-মালিকানার কারণে সমাজে জন্ম নিয়েছে শ্রেণিবৈষম্য, আর শ্রেণিবৈষম্যেরই একটা ভয়াবহ রূপ হচ্ছে নারীর প্রতি বৈষম্য। মার্কসীয় নারীবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন : "ঐতিহাসিক ধারায় লক্ষ করা যায় যে মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে পুঁজিবাদ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অধস্তনতার নীতি এবং মূল কাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে পারলে নারীমুক্তি ও নারী-পুরুষ সমান অধিকার সম্ভব বলে মনে করে মার্কসীয় নারীবাদ। লিবারেল নারীবাদ যেখানে নারীসত্তার দিকটির উপর বারবার গুরুত্ব আরোপ করেছে, মার্কসীয় নারীবাদ সেক্ষেত্রে শোষিত জনসমাজের একটি অংশ হিসেবে শোষিত নারীর বস্তুগত অবস্থানকে তুলে ধরেছে" (রাশিদা আখতার খানম, ২০০৬ : ১৭৫)। মার্কসীয় নারীবাদ মনে করে শ্রেণিস্বার্থের কারণেই সমাজে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে নারীর প্রতি বৈষম্য। মার্কসের মতে ব্যক্তিমালিকানার উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত যে আধিপত্যমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, তা উচ্ছেদ করে শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই মুক্তি ঘটবে নারীর। মার্কসের ভাষায়—"শ্রেণিশোষণ বন্ধ হলেই নারীশোষণও বন্ধ হবে" (Karl Marx, 1990 : 139)। মার্কসের সূত্র ধরে মার্কসীয় নারীবাদীরা বললেন শ্রেণিশোষণেরই একটা রূপ হচ্ছে নারীশোষণ। মার্কসীয় নারীবাদী তাত্ত্বিকরা মনে করেন, ঘরের মধ্যে ও ঘরের বাইরে নারীদের অধীন করে রাখা আধিপত্যবাদী পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য, যা নারীর পরাধীনতার অন্যতম কারণ। পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে শ্রমশোষণ, এরই একটি বিশেষ রূপ হচ্ছে ঘরে নারী যে বিপুল শ্রম করে তা অস্বীকার ও অবমূল্যায়ন করা। তাঁদের মতে, নারীর সঙ্গে বৈষম্য সমাজের অন্যান্য বৈষম্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত (Barbara Ehrenreich, 1976)।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসীয় নারীবাদীরা কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের আলোকে উৎপাদন ব্যবস্থায় সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে শ্রমবিভাজন সংঘটিত হয়, তারই ধারাবাহিকতায় সমাজে কীভাবে লৈঙ্গিক বিভাজন সৃষ্টি হলো, নারী অধীন হয়ে পড়ল পুরুষের, তা ব্যাখ্যা করে। সমাজে পরিবার প্রথা চালু হওয়ার পরেই নারী বন্দি হয়ে পড়ে সংসারের চার দেয়ালে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বৃহত্তর জীবন থেকে। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫) *The Origin of the Family, Private Property, and the State* (1884) গ্রন্থের আলোকে মার্কসীয় নারীবাদীরা পরিবার প্রথাকেই নারীর অধীনতার মূল কারণ হিসেবে শনাক্ত করলেন। এঙ্গেলস লিখেছেন, নারীর অধীনতার কারণ তার জৈবিকতা নয়, বরং পরিবার প্রথা সৃষ্টির ফলে সামাজিক সম্পর্কের ধরন পাল্টে যাওয়ার মধ্যেই আছে এর অন্তর্নিহিত কারণ (Friedrich Engles, 1970 : 44)। পুরুষ যখন নারীর শ্রম ও শরীরের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করল, তখনই বন্দি হয়ে পড়ে নারী। মার্কসীয় নারীবাদীরা এই বন্দিদশা থেকেই মুক্ত করতে চায় নারীকে। শ্রেণিশোষণের বহুমাত্রিক রূপের মধ্যে নারীশোষণ ও লিঙ্গবৈষম্যের স্বরূপ বিশ্লেষণই মার্কসীয় নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মূল লক্ষ্য। সিমোন দ্য বোভ্যোয়ারও নারীর অস্তিত্ব ও তার পরাধীনতার মূল কারণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে সন্ধান করেছেন এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪), অগাস্ট বেবেল, ক্লারা জেটকিন, আলেকজান্ডার কোলনতাই প্রমুখ চিন্তাবিদের হাতে মার্কসীয় নারীবাদের ভিত সুদৃঢ় হয়।

পুঁজিবাদী সমাজে নারীশোষণ চলে দ্বিমাত্রিকভাবে—কখনো তাদের শ্রমের মজুরি দেওয়া হয় না, কখনো- বা পুরুষের তুলনায় দেওয়া হয় অনেক কম। গবেষক Alice Abel Kemp লিখেছেন : "Socialist feminists suggest paid and unpaid workers in a capitalist economy. In the workplace, women are exploited by capitalism ; at home, they are exploited by patriarchy. (Alice Abel Kemp, 1994 : 108)। এ কারণে পুরুষের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে নারী, এবং এরই পরিণতিতে তার উপর স্থায়ী রূপ লাভ করে পুরুষ-প্রভুত্ব। মার্কসীয় নারীবাদ এই অবস্থা থেকে নারীর মুক্তির জন্য নারীকে বহির্জগতে প্রতিষ্ঠার দিকে গুরুত্ব আরোপ করে এবং নারীর শ্রমকে মর্যাদা ও মজুরির দিক থেকে পুরুষের সমতুল্য বলে ঘোষণা করে। মার্কসীয় নারীবাদীরা নারীর পরাধীনতার কারণ হিসেবে প্রধানত পুঁজিবাদকেই শনাক্ত করে। তাঁদের মতে পুঁজিবাদ আর পুরুষতন্ত্র অবিচ্ছেদ্য এবং পরস্পর পরিপূরক—একটি শক্তিশালী করে অন্যটিকে। তাই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত নারীর প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয় বলে মার্কসীয় নারীবাদীরা মনে করেন। তাঁরা পুঁজিবাদী পরিবারকাঠামো ভাঙার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, পরিবারকাঠামোয় পুরুষ, পিতৃতন্ত্র কিংবা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মূলত শ্রেণিসংগ্রামের একটা রূপ। এজন্য তাঁরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামে সচেতন নারী-পুরুষ সকলকে

আহ্বান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য তাত্ত্বিকদের এই ভাষ্য : "According to socialist feminists, the only way to achieve gender equality is to eliminate capitalism and develop a socialist economy that would bring equal pay and rights to women. (Jane Lothian Murray and et. al., 2017 : 342)

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামের একটা স্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল মার্কসীয় নারীবাদীদের চিন্তায়, তবে সব মার্কসীয় নারীবাদী যে এমত গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। কেউ কেউ বলেছেন—শ্রেণিবৈষম্যের সঙ্গে লিঙ্গবৈষম্যের সাদৃশ্য সন্ধান অতি সরলীকরণ একটা ভাবনা। এমন মনোভাবের কারণে নারীর মুক্তির প্রশ্নে শ্রেণিসংগ্রামের রাজনৈতিক দর্শনটি বড় হয়ে যায়, হারিয়ে যায় নারীর পরাধীনতার বিষয়টি (রোখসানা পারভীন চৌধুরী, ২০১৮ : ৪৩)। উদাহরণ হিসেবে মার্কসীয় নারীবাদী ক্লারা জেটকিনের (১৮৫৭-১৯৩৩) কথা বলা যায়। প্রথম দিকে তিনি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেলে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমে যাবে বলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বহারা বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন, তবে উত্তরকালে তিনি মার্কসীবাদের সঙ্গে নারীবাদের সম্পর্কের পরিবর্তে আলাদা করার কথা বলেছিলেন। শ্রেণিসম্পর্ক এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ককে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করেছেন (Clara Zetkin, 1948)। তবু একথা স্বীকার্য যে, মার্কসীয় দর্শনকে পাথেয় করে পৃথিবী জুড়ে নারীবাদীরা শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই যে প্রকৃত নারীমুক্তি সম্ভব এই বিশ্বাসে স্থির থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।

সাংস্কৃতিক নারীবাদ (Cultural Feminism)

বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে জৈবিক সত্তা হিসেবে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে অনিবার্য পার্থক্য (essential differences) বিদ্যামান, তাকে ভিত্তি করে নারীর একটি সবল এবং সকর্মক প্রতিমূর্তি নির্মাণের প্রয়াস হিসেবে গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক নারীবাদ। নারী সম্পর্কে পুরুষ-পৃথিবীর দুর্বল-হীনমন্য-সীমাবদ্ধ-অসমর্থ প্রতিমূর্তি বদলে দিয়ে সাংস্কৃতিক নারীবাদীরা নারীকে ভিন্ন একটি প্রতিমূর্তিতে নির্মাণ করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে নারী হৃদয়ে সেবাব্রতী কিন্তু শক্তিতে সমুদ্রপ্রতিম, লক্ষ্যে অবিচল, ভাবনায় বিবেচক ও সময়সচেতন, যে জন্ম দেয় এবং রক্ষা করে। জেন এডামস এবং শার্লট পার্কিন্স—এই দুই তাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক নারীবাদের ভিত নির্মাণ করেন। সাংস্কৃতিক নারীবাদীরা নারী-সংস্কৃতির অস্তিত্বকে আবিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছেন। ভগ্নিত্ব বা sisterhood-এর আলোয় পৃথিবীর সব নারীকে সাংস্কৃতিক নারীবাদীরা একত্র হবার আহ্বান জানিয়েছেন, গড়ে তুলতে চেয়েছেন বৈশ্বিক নারী-সংস্কৃতি। নারীর সঙ্গে নারীর সম্পর্ককে বহুমাত্রিকতায় দেখা ও চর্চার কথা বলতে চেয়েছেন সাংস্কৃতিক নারীবাদী তাত্ত্বিকরা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর সমকামিতাকে (lesbianism) তাঁরা নারীসংস্কৃতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করেন। পুরুষতন্ত্রের দৃষ্টিকোণে তৈরি নারীর সঙ্গে

জৈবিক নারীর সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয় সাংস্কৃতিক নারীবাদে। মানুষ হিসেবে নয়, জৈবিক নারী হিসেবে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠাই সাংস্কৃতিক নারীবাদের মূল লক্ষ্য। সাংস্কৃতিক নারীবাদের লক্ষণের কথা বলতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন :"Feminists who analyze race, class, and gender suggest that equality will occur only when all women, regardless of race and ethnicity, class, age, religion, sexual orientation, or ability (or disability), are treated more equitably (B. Cassidyand et. al., 2001).

পরিবেশ নারীবাদ (Eco Feminism)

নারীর অস্তিত্ব ও সংগ্রাম এবং পৃথিবীর জীব ও প্রকৃতির মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিরাজমান। এই সম্পর্কের মাত্রা ও স্বরূপ উন্মোচন-সূত্রে গড়ে উঠেছে পরিবেশ নারীবাদ। পরিবেশ নারীবাদীদের কাছে নারী আর প্রকৃতি অভিন্ন ও একাত্ম। পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যবাদী কর্মকাণ্ড কীভাবে বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্য, ভারসাম্য, ছন্দ ও বিন্যাস বিনষ্ট করে চলেছে পরিবেশ নারীবাদীরা তা-ই সন্ধান করেন এবং এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির একাত্মতার কারণ এই নয় যে, নারীর সঙ্গে প্রকৃতির আত্মিক মিল রয়েছে ; বরং এই জন্য যে পরিবেশ, প্রকৃতি ও নারী অভিন্নভাবে পরাক্রমশালী পুরুষতন্ত্রের শোষণের শিকার। নারীকে প্রকৃতির মতো মনে হবার কারণ প্রকৃতির মতোই নারী সহজ ও স্বাভাবিক। পুরুষতান্ত্রিক শোষণের কারণে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ছিন্ন সম্পর্ককে আবার পুনঃস্থাপন করতে চায় পরিবেশ নারীবাদী চিন্তকরা।

উত্তর-আধুনিক নারীবাদ (Post-modernist Feminism)

উত্তর-আধুনিক নারীবাদ অতি সাম্প্রতিক কালের একটি প্রত্যয়। উত্তর-আধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, উদার নারীবাদী, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী কিংবা মার্কসীয় নারীবাদী তাত্ত্বিকরা সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে নারীর পরাধীনতার কারণগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করেছে। উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা সব নারীকে একটা সাধারণী রূপ দেওয়ার বিপক্ষে। এঁদের মতে একেক নারীর সমস্যা একেক রকমের। তাঁদের মতে : "...a singular feminist theory is impossible because there is no essential `women'. The catagory women is seen as a social construct that is a fiction, a non-determinable identity." (P. A. Cain, 1993 : 66)। উৎপাদনশীলতাই নারীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য—এই ধারণাকে অস্বীকার করে উত্তর-আধুনিক নারীবাদ। নারী বা পুরুষ—কারো জন্যই কোনো কিছু অনিবার্য মনে করেন না উত্তর-আধুনিক নারীবাদরা।

নারীশিক্ষা এবং জেন্ডার ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একজন তাত্ত্বিকের সঙ্গে অন্য একজন তাত্ত্বিকের ভাবনা ও বক্তব্যে সাদৃশ্য যেমন আছে, তেমনি আছে বৈসাদৃশ্যও।

Dhaka University Institutional Repository

সকল তাত্ত্বিকই পুরুষ-অধীনতা থেকে নারীর সামূহিক মুক্তির কথা বলেছেন, নারীদের নিয়ে যেতে চেয়েছেন ক্ষমতায়নের স্তরে—এটাই সকল তাত্ত্বিকের মধ্যে সাদৃশ্যের প্রধান বিষয়। তবে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের মাত্রাই বেশি। নারীর সামগ্রিক মুক্তির লক্ষ্যে তাত্ত্বিকদের চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস, মত ও পথের মধ্যে রয়েছে নানামাত্রিক ভিন্নতা। রক্ষণশীল মতবাদীরা একান্তভাবেই নারীমুক্তিবিরোধী। এরা বিশ্বাস করে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা। ফলে উদার বা র‍্যাডিক্যাল তাত্ত্বিকদের সঙ্গে রক্ষণশীল তাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রধান বৈষম্য সর্বদা ক্রিয়াশীল আছে। উদার মতবাদীরা সামাজিক যে-সব বিধি ও বিধান নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে রেখেছে, তার পরিবর্তন প্রত্যাশা করেন। উদার মতবাদীরা নারীমুক্তির পথে সামাজিক বাধাসমূহ অপসারণ করে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা বর্তমান সমাজকাঠামো পুরুষতান্ত্রিক বলে নারীমুক্তির জন্য রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের কথা বলেন। এদের মতে, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামই নারীর জন্য প্রথম এবং অনিবার্য সংগ্রাম। এই সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতিতে নারীকে দাঁড়াতে হবে রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা নারীর জন্য একটা মুক্ত স্বাধীন পৃথিবী কল্পনা করেছেন। এজন্য তাঁরা নারী-পুরুষের সম্পর্ককেই অস্বীকার করেছেন। মার্কসীয় নারীবাদীদের মতে, শ্রেণিবৈষম্যের কারণেই সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নারীর প্রতি পুরুষের আধিপত্য ও বৈষম্য। শ্রেণিবৈষম্য দূর হলেই পুরুষের আধিপত্য থেকে মুক্তি পাবে নারী। কাজেই দেখা যাচ্ছে এক মতের সঙ্গে বৃহত্তর উদ্দেশ্যে অন্য মতের মিল থাকলেও, পথ ও মতের মধ্যে রয়েছে নানামাত্রিক ভিন্নতা।

আধুনিক নারীশিক্ষা এবং নারীবাদ-বিষয়ক এই তাত্ত্বিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিচার করতে বসলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে খুব সহজেই একজন আধুনিক শিক্ষাচিন্তক হিসেবে শনাক্ত করা যায়। নারীদের শিক্ষার জন্য তাঁর ভাবনাসমূহ—বিশেষত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নারীশিক্ষা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা, পাঠ্যপুস্তক রচনা, পাঠক্রম প্রণয়ন, বালিকা বিদ্যালয়সমূহের জন্য নারী-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয় বিদ্যাসাগরকে আধুনিক নারীশিক্ষাচিন্তক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। অন্যদিকে, নারীদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য, নারীসমাজের মুক্তির জন্য বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের আলোকে তাঁকে একজন উদার নারীবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। নারীমুক্তির জন্য বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ বন্ধ এবং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণের জন্য তাঁর চিন্তা ও সংগ্রাম উদার নারীবাদী ভাবনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই তাত্ত্বিক পটভূমির আলোকেই বর্তমান অভিসন্দর্ভে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ মূল্যায়নের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজমানস : প্রকৃতি ও বহুমাত্রিকতা

জীবনকথা

আলোকিত উনিশ শতকে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন অনেক স্বনামধন্য মানুষ। এমনই একজন স্বনামধন্য খ্যাতকীর্তি মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর (১২২৭ সনের ১২ই আশ্বিন) মঙ্গলবার অবিভক্ত বাংলার হুগলি জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮২০ সালে বীরসিংহ গ্রামটি হুগলি জেলাধীন থাকলেও, ১৮৭২ সালে এটি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এ কারণে মেদিনীপুর জেলার মানুষ হিসেবেই বিদ্যাসাগর সুপরিচিত। বিদ্যাসাগরের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। বাবা-মায়ের দশ সন্তানের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন সবার বড়। তাঁরা ছিলেন সাত ভাই তিন বোন। জন্মের পর তাঁর নাম কীভাবে ঈশ্বরচন্দ্র হলো গবেষক ঋষি দাস তা জানাচ্ছেন এভাবে :

> শিশু (ঈশ্বরচন্দ্র) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ শিশুর জিবের নিচে আলতা দিয়ে কিছু লিখে দিয়ে বললেন যে, এই শিশু উত্তরকালে অজেয় হবে এবং দয়াদাক্ষিণ্যে সকলকে মুগ্ধ করবে। আমিই এর দীক্ষাগুরু হলাম, এই বালক আর অন্য গুরু গ্রহণ করবে না। এই শিশু ঈশ্বরানুগৃহীত। তাই আমি এর নাম রাখলাম—'ঈশ্বরচন্দ্র'। (ঋষি দাস, ১৯৭১ : ৮)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস ছিলেন দারুণ দুঃসাহসী এবং পরিশ্রমী একজন মানুষ। ঠাকুরদাসের পিতা রামজয় তর্কভূষণও ছিলেন দুঃসাহসী শক্তিধর দৃঢ়চেতা এক পুরুষ। রামজয় সম্পর্কে এমন কথা প্রচলিত আছে যে সেকালে ডাকাতরা পর্যন্ত তাকে ভয় পেত। যেখানে অনেকে একত্রে যেতেও ভয় পেতেন, রামজয় একটা লোহার লাঠি নিয়ে একাকী সেখান দিয়ে চলে যেতেন। মেদিনীপুর যাবার পথে ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করে একবার রামজয় বিজয়ী হন। কিন্তু হঠাৎ করে সংসারবিরাগী হয়ে রামজয় উধাও হয়ে গেলে মা-ভাই-চার বোনকে নিয়ে মহাবিপদে পড়েন ঠাকুরদাস। কলকাতায় এসে সামান্য চাকরির অর্থে কঠিন হাতে সংসারের হাল ধরেন তিনি। দুঃসাহসী এই পিতামহ-পিতার উত্তরপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বিপ্রদাশ ১৯৯৮ : ৫)। উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের চেতনায় দুঃসাহস এবং কঠোর পরিশ্রমের যে দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ করি, পারিবারিক উত্তরাধিকার থেকেই তা অর্জন করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার এস. কে. বোসের মন্তব্য প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য : 'দরিদ্র রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন মহৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তি। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

সুবিখ্যাত পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য সেই চরিত্রের অমূল্য উত্তরাধিকারই তিনি রেখে গিয়েছিলেন।' (এস. কে. বোস, ১৯৭২ : ৪)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিবার বংশানুক্রমে ছিল শাস্ত্র-পালনকারী। পিতা ঠাকুরদাসও চেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞান শিখে চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকতা করবে। বিদ্যাসাগর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : 'আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্যবশতঃ ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব' (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৪১৪)। আঠারো-উনিশ শতকে 'রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা' করাই ছিল ব্রাহ্মণসমাজের একান্ত কাম্য। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাসও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ১৪/১৫ বছর বয়সে উপার্জনের উদ্দেশ্যে কলকাতা শহরে এলেও ঠাকুরদাসের চিত্তলোকে সর্বদা জাগরূক ছিল গ্রামজীবন—গ্রামজীবনের শাস্ত্র-পরিমণ্ডল ও চতুষ্পাঠীর জগৎ। মহানগরীর নতুন জীবনাদর্শ তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি; পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল (অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১ : ১১)। তিনি পিতৃ-পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারেননি, তাই তাঁর মনে সর্বদা খেদ ছিল। ঠাকুরদাস চেয়েছিলেন পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে চতুষ্পাঠীর শিক্ষা দিয়ে সেই খেদ দূর করবেন। তাই ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য সকলের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি পুত্রকে চতুষ্পাঠীতে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠাকুরদাসের একান্ত অভিলাষ ছিল তাঁর পুত্র 'সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়ে দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক।' (অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১ : ১২)

সেকালে শাস্ত্রব্যবসায়ী অধিকাংশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতই আর্থিকভাবে দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন। শৈশবেই পিতার অবর্তমানে ঠাকুরদাস কঠিন হাতে সংসারের হাল ধরেছিলেন। পিতা কিছুই রেখে যাননি, কেউ জানে না তিনি কোথায় আছেন। এ অবস্থায় মা এবং নাবালক ভাইবোনদের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল কিশোর ঠাকুরদাসকে। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে নিরলস পরিশ্রম করে দীর্ঘকাল ঠাকুরদাস এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পাঠাভ্যাসের জন্য কলকাতা এসে ঈশ্বরচন্দ্র পিতার এই অমানুষিক অক্লান্ত সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আত্মজীবনীতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

> এই সময়ে, পিতৃদেব, মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাঁকোনিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারের চকে মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছিল। ঐ দোকানে লোহা ও পিতলের নানাবিধ বিলাতী জিনিস বিক্রীত হইত। যে সকল খরিদ্দার

> ধারে জিনিস কিনিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। প্রতিদিন, প্রাতে এক প্রহরের সময়, কর্মস্থানে যাইতেন; রাত্রি এক প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৪১০)

—কৈশোরে পিতার এই কঠোর পরিশ্রম দেখে বিদ্যাসাগর জীবনসংগ্রামের পাঠ শিখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। অনিলচন্দ্র লিখেছেন : 'জীবনসংগ্রামের রূপ কত নিষ্ঠুর এবং কিভাবে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পথ চলতে হয় তা বিদ্যাসাগর পিতার কাছে শিখেছিলেন।' (অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১ : ১৭)

পিতা ঠাকুরদাসের চরিত্রের দৃঢ়সংকল্প ও সময়ানুবর্তিতায় কৈশোরেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। মেরুদণ্ড সোজা করে লড়াই করার শক্তি তিনি পিতৃ-সূত্রেই লাভ করেছিলেন। পিতাই তাঁকে শিখিয়েছেন সত্য কথা সাহসের সঙ্গে উচ্চারণের শিক্ষা, পিতাই তাকে শিখিয়েছেন নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার পাঠ। পিতামহ এবং পিতার দৃঢ়চেতা স্বভাব দ্বারা বিদ্যাসাগর কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা অনুধাবনের জন্য বিদ্যাসাগরের *আত্মচরিত*-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীর নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে তাঁর স্বভাবের দৃঢ়তা এবং সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে তাঁর উত্তরাধিকারের উৎস :

> আমার জন্মসময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" এই সময়ে, আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিণী ছিল; তাহারও, আজ কাল, প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "ও দিকে নয়, এ দিকে এস; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, সূতিকাগৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।
>
> ...আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে, তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতা-মহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাসবাক্যের উল্লেখ করিয়া, বলিতেন, "ইনি সেই এঁড়ে বাছুর; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার, ক্রমে, এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।" জন্মসময়ে, পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া, আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর, সময়ে সময়ে, কার্য দ্বারাও, এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৩৯৭)

—বক্তব্যটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হলেও, এটি উদ্ধৃত হলো এ কারণে যে, এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক দৃঢ়তা, কৌতুকপ্রিয়তা, সুদৃঢ় মনোবল এবং কর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা নিপুণভাবে উন্মোচিত।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকার-সূত্রে বিদ্যাসাগর লাভ করেছিলেন মানবসেবা ও দানশীলতার আন্তরপ্রেরণা—অর্জন করেছিলেন অনমনীয় সাহস, তেজস্বিতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : 'তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে, অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল' (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৪০৭)। উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের চরিত্রেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের কাছ থেকে বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন দানশীলতার প্রেরণা। রাধামোহন বিদ্যাভূষণ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদ ভঞ্জন, বিপদমোচন, অসময়ে সাহায্য দান প্রভৃতি কার্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা স্বীয় পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, এক দিন এক ক্ষণের জন্যেও, তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিয়োজিত ও পর্য্যবসিত হইয়াছিল' (উদ্ধৃত : অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১ : ১৪)। দানশীলতা, অতিথিসেবা, সজ্জন ব্যবহার এসব সদ্‌গুণ বিদ্যাসাগর তাঁর মা ভগবতী দেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের চরিত্র থেকে লাভ করেছিলেন। উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের চরিত্রেও এইসব সদগুণের উপস্থিতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

জননী ভগবতী দেবীর কাছ থেকেও বিদ্যাসাগর লাভ করেছেন নানামাত্রিক উচ্চ জীবনাদর্শ। ভগবতী দেবীর স্নেহপূর্ণ হাস্যোজ্জ্বল মুখ বিদ্যাসাগরের কাছে চিরায়ত নারীমূর্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিল। মাকেই বিদ্যাসাগর দেবীমূর্তিতে গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ভগবতী দেবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অভিমত : 'উন্নত ললাটে তাঁহার [ভগবতী দেবী] বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহা বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৬ : ২)। ভগবতী দেবী ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সত্যবাদী এবং পরম স্নেহশীল। অসত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করাকে তিনি অতিশয় ঘৃণা করতেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রেও এই বিশেষ গুণটি সবিশেষ লক্ষণীয়। শৈশবে বিদ্যাসাগর পিতা ঠাকুরদাসের হাতে কারণে-অকারণে মার খেতেন, কড়া শাসনে তিনি ছিলেন অতিষ্ঠ। এ সময়ে মা ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগরের যন্ত্রণাকে স্নেহ-

Dhaka University Institutional Repository

মমতা দিয়ে ভুলিয়ে দিয়েছেন। প্রগাঢ় সন্তানবাৎসল্য দিয়ে ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগরকে একান্ত আপনার করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ভগবতী দেবীর এই উপলব্ধি : 'সন্তান বালবুদ্ধিবশত কোন অন্যায় কার্য্য করিলে পর, মাতা যদি মুখ আঁধার করিয়া তাহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ বন্ধ রাখেন, আর সন্তান মাতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া না বেড়ায়, তাহা হইলে, সে মাতাই বা কিরূপ, তাঁহার ভালবাসাই বা কিরূপ, আর তাঁহার মায়া-মমতাই বা কিরূপ, কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না' (সরস্বতী রানী পাল, ২০১৬ : ৪০)।

শৈশবে মাতৃসূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র পেয়েছিলেন নিরহঙ্কারী হবার প্রেরণা। মা অত্যন্ত দীনভাবে সংসার পরিচালনা করতেন। মায়ের মিতচারিতা শৈশবে ঈশ্বরচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। অতি তুচ্ছ জিনিসকেও ভগবতী দেবী পরম যত্নে রক্ষা করতেন, কোনো কিছুই ফেলে দিতেন না। আত্মসুখের পরিবর্তে অপরের সুখকেই তিনি সর্বদা বড় করে দেখতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন চাকরিসূত্রে মাসে পাঁচ শত টাকা বেতন পেতেন, তখন দেশে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করেন : 'মা, আর তোমার মনে কি সাধ আছে আমায় বল।' ভগবতী দেবী পুত্রের এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন : 'বাবা, এইবার যেখানে যত দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাঁহাদের একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দাও।' মায়ের এই আদেশে বিদ্যাসাগর দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিলেন (সরস্বতী রানী পাল, ২০১৬ : ৪১)। এরই ধারাবাহিকতায় উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মভূমি বীরসিংহ ও নিকটবর্তী গ্রামের দরিদ্র অসহায় মানুষদের নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। সন্ধ্যার পর দরিদ্র মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি গোপনে অর্থসাহায্য করতেন। মায়ের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রাম ও নিকটবর্তী পাথরা, কেঁচে, অর্জুনআড়ী, বুয়ালিয়া, রাধানগর, উদয়গঞ্জ, কুরান, মামুদপুর প্রভৃতি গ্রামের অসহায় দরিদ্র লোকদের সাধ্যানুযায়ী নিয়মিত খাবারের ব্যবস্থা করতেন। আলস্য ও জড়তাকে প্রশ্রয় না দেওয়ারও শিক্ষা ঈশ্বরচন্দ্র অর্জন করেছিলেন জননী ভগবতী দেবীর কাছ থেকে।

এভাবে দেখা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে-সব সদগুণের জন্য উত্তরকালে বাঙালি জাতির কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন, তা তিনি অর্জন করেছিলেন পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ, পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতৃ-মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ এবং মা ভগবতী দেবীর কাছ থেকে। পিতা ও পিতামহের মাধ্যমে ঈশ্বরচন্দ্র কীভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, সে-সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকারের মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যায় : 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সত্যবাদিতা ও সরলতা চির-প্রসিদ্ধ। তিনি এই গুণ পিতা ও পিতামহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়'

Dhaka University Institutional Repository

(বিহারীলাল সরকার, ২০১৬ : ৬)। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের তেজস্বিতা ও দৃঢ় মনোবল যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত ভাষ্যেও তা সুস্পষ্ট : 'তাঁর (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সামান্য কর্ম করতেন, তাঁর বেতন কখনো মাসে দশ টাকার বেশি হয়নি। দারিদ্র্য তাঁদের সহচর ছিল; সম্পদ বলতে ছিল পুরুষানুক্রমিক চরিত্রবল। বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীও এ চরিত্রগুণের অধিকারী ছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে বিদ্যাসাগর যদি তাঁর পরিবার থেকে কিছু পেয়ে থাকেন, তবে তা ছিল এই চরিত্রের তেজ।' (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান, ২০০৪ : ৯)

পাঁচ বছর বয়সে বীরসিংহ গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষাজীবনের সূচনা। শৈশবে তিনি ছিলেন অতি দুরন্ত ও অবাধ্য বালক। শৈশব থেকেই তাঁর কথাবার্তা এবং আচার-আচরণে লক্ষ করা গেছে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত শ্রুতিধর শিক্ষার্থী। তা সত্ত্বেও গ্রামের পাঠশালায় বিদ্যাসাগরের পড়ালেখা সেভাবে অগ্রসর হয়নি। এ কারণে পিতা ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগরকে কলকাতার স্কুলে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে পিতার সঙ্গে ছাব্বিশ ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে বিদ্যাসাগর কলকাতা আসেন। সময়টা তখন ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাস। কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর তিন মাস এক পাঠশালায় পড়ালেখা করেন। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : 'পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন' (উদ্ধৃত : অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১ : ১৮)। এ সময় বিদ্যাসাগর অসুস্থ হয়ে পড়লে পড়ালেখায় সাময়িক বাধা পড়ে—তাঁকে গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে হয়। রোগমুক্তির পরে ১৮২৯ সালের মে মাসে তাঁকে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়।

বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলিকাতা আসার পথে ঠাকুরদাস পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের মেধার পরিচয় পেয়েছিলেন। কিংবদন্তির মতো সে-ঘটনা রীতিমতো বিস্ময়কর। পথে আসতে-আসতেই রাস্তার পাশের মাইলফলক দেখে বিদ্যাসাগর চিনে নেন ইংরেজি সংখ্যা। ঠাকুরদাস চেয়েছিলেন পুত্রকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করাবেন। কিন্তু অর্থের অভাবে ঠাকুরদাস পুত্রকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করাতে পারেননি। শিবচন্দ্র মল্লিকের বাড়ির পাঠশালার পড়ালেখাও বেশি দূর অগ্রসর হলো না। নানা নেতিবাচক প্রচারণার কারণে হিন্দু কলেজে পুত্রকে ভর্তি করানোরও সাহস পেলেন না ঠাকুরদাস। কেননা ততদিনে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের 'স্বেচ্ছাচারের' কথা ঠাকুরদাসের জানা হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে অন্যদের মত উপেক্ষা করে ঠাকুরদাস ১৮২৯ সালের ১লা জুন ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্ররূপে ভর্তি করিয়ে দেন। ইংরেজি স্কুলে পড়ালেখা

করলে ঈশ্বরচন্দ্রকে হয়তো অন্যরূপে দেখা যেতে পারতো। তবে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হওয়া ও পড়ালেখার ফলে ঈশ্বরমানসে নানা সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য বিদ্যাসাগরের জীবনীকার অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন :

> তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) যদি ইংরেজী স্কুলে এবং হিন্দু কলেজে পড়তেন তবে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা হত না; তাঁর চিন্তা ও কর্মের ধারা খুব সম্ভবত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষায় বঞ্চিত দরিদ্র পিতা তাঁকে অর্থকরী বিদ্যা অর্জনের পথে যেতে না দিয়ে প্রাচীন চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত করে রাখলেন। পরে তিনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজী শিখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সম্মিলনে নতুন মানবতাবাদ সৃষ্টি করলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ঐতিহ্যভিত্তিক শিক্ষা এবং হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রণোদিত নতুন জীবনাদর্শ তাঁর প্রতিভা এবং উদারতার স্পর্শে অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করল। সুতরাং তাঁর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ বাঙালী সমাজের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। (অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১ : ১৯)

বারো বছরেরও অধিক সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। ব্যাকরণ শ্রেণির পাশাপাশি তিনি ইংরেজি শ্রেণিতেও যোগ দেন। বার্ষিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩১ সালে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বৃত্তির পরিমাণ আট টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৃত্তির সমুদয় টাকা বিদ্যাসাগর পিতার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ঠাকুরদাস সব টাকা জমিয়ে রেখে একসময় বীরসিংহ গ্রামে একখণ্ড জমি কিনেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে এই জমির উপর ঈশ্বরচন্দ্র টোল স্থাপন করবে। সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণের পাশাপাশি সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে পাঠাভ্যাস সমাপ্ত করেন এবং অর্জন করেন কলেজের প্রশংসাপত্র। ১৮৩৯ সালে পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করে (Subal Chandra Mitra, 1975 : 73)। ন্যায় শ্রেণিতে পড়ার সময় ঈশ্বরচন্দ্র Hindoo Law Committee-র পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর বিদ্যাসাগর যে প্রশংসাপত্র পান, সেখানেই তাঁর নামের সঙ্গে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রথম দেখতে পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত কলেজের কে বা কারা কখন ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়েছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না (অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১ : ৪৬)। প্রসঙ্গত হিন্দু ল' কমিটি ঈশ্বরচন্দ্রকে ১৮৩৯ সালের ১৬ই মে যে সনদ প্রদান করে, এখানে তা উদ্ধৃত করা যায় :

> We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd (twenty-second) April, 1839 by the Committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chandra Vidyasagar was found and declared to be qualified by his eminent

Dhaka University Institutional Repository

knowledge of Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law Officer in any of the Established Courts of Judicature. (উদ্ধৃত : অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১ : ৪৬)

সংস্কৃত কলেজে পাঠ্যাবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র যে কেবল পুথিগত বিদ্যা অর্জন করেছিলেন তা-ই নয়, এ সময়েই তিনি জীবনসংগ্রামের কঠোরতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং পরোপকারবৃত্তিরও প্রকাশ ঘটে এসময়। মিতব্যয়িতা এবং সাধারণ জীবনযাপনে ছাত্রজীবনেই তিনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। চরকায় সূতা কেটে জননী যে মোটা কাপড় প্রস্তুত করে দিতেন, তা পরিধান করেই ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে যেতেন। এসব বৈশিষ্ট্য উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে আরও দৃঢ়ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের পরোপকারবৃত্তি ছিল কিংবদন্তির মতো। কৈশোরজীবন থেকেই অন্যের উপকারে বিদ্যাসাগর সব সময় প্রয়াসী ছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় বিহারীলাল সরকারের নিম্নোক্ত অভিমত : '...তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) বাল্যকাল হইতে পরদুঃখমোচনে ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র বুকখানি অনন্ত-ব্যাপিনী; কিন্তু দয়া যেমন, উপায় তো তেমন নহে; তবুও যে কোন উপায়ে যথাশক্তি দানে, দীনের দুঃখোদ্ধারে তিনি প্রাণান্তপণ করিতেন। অবশিষ্ট যে টাকা থাকিত, তিনি সেই টাকায় জল খাইতেন। জল খাইবার সময় যে সকল বালক তাঁহার নিকটে থাকিত, তিনি তাহাদিগকেও জল খাওয়াইতেন। কাহারও ছেঁড়া কাপড় দেখিলে, নিজের হাতে পয়সা না থাকিলেও, দারওয়ানের নিকট ধার করিয়া তিনি তাহাদের কাপড় কিনিয়া দিতেন। বাসায় কেহ আসিলে, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে জল খাওয়াইতেন' (বিহারীলাল সরকার, ২০১৬ : ৩৪)।

সংস্কৃত কলেজে পড়ালেখার সময়ে বিদ্যাসাগর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবন নির্বাহ করতেন। পাঠ সমাপ্ত করেই বিদ্যাসাগর চাকুরিতে প্রবৃত্ত হন। চাকুরিজীবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথমে যোগ দেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। কলেজের বাংলা বিভাগে সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিত হিসেবে তিনি নিযুক্ত হন। প্রথমেই তাঁর মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা। সে-কালের বিবেচনায় টাকার অঙ্কটা যথেষ্টই বলতে হবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন মার্শাল ছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বিদ্যাসাগরের এই চাকুরি প্রাপ্তি পরিবারের দীর্ঘদিনের আর্থিক দুরবস্থা দূর করল। প্রথমেই বিদ্যাসাগর পিতা ঠাকুরদাসকে কষ্টসাধ্য কর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। বাড়িতে প্রতি মাসে তিনি বিশ টাকা পাঠাতেন। বাকি ত্রিশ টাকায় দুই সহোদরসহ এগার জনের ব্যয় নির্বাহ হতো। সংস্কৃত কলেজে চাকুরিরত অবস্থায় বিদ্যাসাগর হিন্দি ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান, ২০০৪ : ১০)। বিদ্যাসাগরের ইংরেজি ভাষা চর্চা সম্পর্কে জীবনীকার বিহারীলাল সরকারের ভাষ্য এখানে স্মরণ করা যায়। বিহারীলাল লিখেছেন :

বিদ্যাসাগরের ন্যায় একজন অতি শ্রমশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে ইংরেজিটা শিখিয়া লইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? ইংরেজি শিক্ষার উপর তাঁহাকে আরও গুরুতর পরিশ্রমসাপেক্ষ কার্য্যের ভার লইতে হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার নিকট সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পড়িতে আসিতেন, এইসকল লোককে পড়াইয়া তিনি আবার স্বয়ং ইংরেজি পড়িতেন। (বিহারীলাল সরকার, ২০১৬ : ৫১)

শোভাবাজার রাজবাড়িতে নিয়মিত যেতেন বিদ্যাসাগর—উদ্দেশ্য অংকশাস্ত্র এবং ইংরেজি শিক্ষালাভ। তাঁর ইংরেজি শেখার প্রধান বিষয় ছিল উইলিয়ম শেকস্‌পীয়রের জীবন ও সাহিত্য। মজার বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করছেন, তখন তিনিই আবার নিয়মিত শোভাবাজার রাজবাড়িতে যাচ্ছেন ইংরেজি শেখার জন্য। কলকাতা শহরের স্বনামখ্যাত অনেকেই বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করতেন। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী ছিল একান্তই নিজস্ব। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি শিক্ষার্থীকে পাঠ অনুধাবন করাতে সমর্থ হতেন। তাঁর পাঠদান প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং অধ্যাপকমণ্ডলীও সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বিহারীলালের এই অভিমত : ‘বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বাসায় ইংরেজি শিখিতেন, তখন হাইকোর্টের অন্যতম অনুবাদক শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। তাঁহার শিক্ষাদান প্রণালী এমনই কৌশলময় যে, অতি দুরূহ বিষয়ও অল্প দিনের মধ্যে সহজে শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত হইত। সে শিক্ষা-প্রণালীর কথা শুনিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলীও চমৎকৃত হইতেন’ (বিহারীলাল সরকার, ২০১৬ : ৫৮)। শিক্ষার্থীর জন্য রাত জেগে তিনি পাঠ তৈরি করতেন, কত সহজে কঠিন বিষয় উপস্থাপন করা যায় সেজন্য নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করতেন। বিহারীলাল সরকার জানাচ্ছেন যে, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য এভাবে ব্যাকরণ পাঠ তৈরি করতে গিয়েই বিদ্যাসাগরের ‘উপক্রমণিকা ব্যাকরণ’ রচনার সূত্রপাত ঘটে (বিহারীলাল সরকার, ২০১৬ : ৫৯)। বস্তুত, শ্রমশীলতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাই ছিল বিদ্যাসাগরের শিক্ষকতা বৃত্তির বিশিষ্ট গুণ।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে ১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগর মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানে বিদ্যাসাগর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন মার্শাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। মার্শালের মাধ্যমেই গভর্নর জেনারেল হেনরি হার্ডিঞ্জ বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অবহিত হন। ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা প্রেসিডেন্সিতে ১০১টি স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন, যেখানে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য এবং পাঠদান প্রণালীতে হেনরি হার্ডিঞ্জ এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, এই স্কুলসমূহের পাঠক্রম

Dhaka University Institutional Repository

রচনা এবং শিক্ষক নির্বাচনে তিনি ক্যাপ্টেন মার্শালের পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও পরামর্শ করেন (অমিয়কুমার সামন্ত, ২০১২ : ৪০৯) এ তথ্য বিদ্যাসাগরের স্বকীয়তা, পাণ্ডিত্য এবং পাঠদানে আন্তরিকতার পরিচয় বহন করে।

অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-১৮৮৬) উদ্যোগে ১৮৩৯ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তত্ত্ববোধিনী সভা। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যরা ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। বাংলায় ব্রাহ্ম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশে এই সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগস্ট তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*। ইতোমধ্যে বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য কলকাতায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তাই ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী না হওয়া সত্ত্বেও তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁদের মুখপত্র সম্পাদনার কাজে সহযোগিতার আহ্বান জানান। বিদ্যাসাগর আনন্দে তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেন। ১৮৪৩ সালের ডিসেম্বরে অক্ষয়কুমার দত্ত-সম্পাদিত *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*র পেপার কমিটির (প্রবন্ধ নির্বাচন কমিটি) সদস্য হিসেবে বিদ্যাসাগর কাজ শুরু করেন। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*র পেপার কমিটির সভ্য হিসেবে বিদ্যাসাগর পরম নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন, মুখপত্রটির উন্নতি ও উৎকর্ষের জন্য রাখেন পরিশ্রম ও প্রযত্নের স্বাক্ষর।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম পণ্ডিতের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ১৮৪৬ সালের ৬ই এপ্রিল মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেন। সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেই কলেজের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন কল্পে বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। সংস্কৃত কলেজের অবস্থা তখন সন্তোষজনক ছিল না। কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকদের আসা-যাওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট সময় ছিল না, শিক্ষকেরা চেয়ারে বসে নিদ্রা যেতেন, ছাত্রেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের বাতাস করত; পাঠ্য বইতে শ্লীল-অশ্লীল কবিতার কোনো বাছবিচার ছিল না। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায় :

> In April, 1846, he (Iswar Chandra Vidyasagar) was appointed Assistant Secretary of Sanskrit College. There was hardly any discipline in the College. Some of the teachers, who were his teachers too, used to come late. Some of the teachers would sleep in the class. This was a very embarrassing situation for him. But discipline was to be enforced without being harsh to these teachers. So Vidyasagar just stood at the gate of the College when classes were to begin for the day. The teachers who came late, seeing Vidyasagar at the gate, felt ashamed and avoided coming late. He would go round the classes now and then. Discipline was restored. (Sudhir Kumar Gangopadhyay, 1993 : 45)

—এসব অনিয়ম দেখে বিদ্যাসাগর তা দূরীকরণে উদ্যোগী হন। তিনি সংস্কৃত কলেজের সংস্কার কাজে উদ্যমের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে কলেজের সামূহিক উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর একটি বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করেন। তাঁর এ পরিকল্পনার মধ্যে ছিল—কলেজের সামগ্রিক পাঠক্রমকে জুনিয়র ও সিনিয়র শাখায় বিন্যাস এবং পাঠ্যতালিকা পুনর্গঠন। ছাত্র এবং শিক্ষকদের কতিপয় আচরণবিধিও তিনি প্রস্তুত করেন। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তের কাছে বিদ্যাসাগর তাঁর উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এতটা কর্তৃত্ব পছন্দ করতে পারলেন না। ফলে দেখা দিল মতান্তর, ক্রমে সংঘাত এবং মনান্তর। এই মতান্তর-মনান্তরের ফলে বিদ্যাসাগর আকস্মিকভাবে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তের কাছে প্রেরিত পদত্যাগপত্রে বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেন :[১]

> Agreeably to your instructions dated 21 April, I now beg to submit my reasons for tendering the resignation of my appointment.
>
> I studied the Sanscrit language and literature in the Government Sanscrit College and there imbibed my respect and zeal for these subjects. Impelled by these feelings and without any other strong motive, I applied for this appointment. I had hopes that I might be enabled to remove the impediments which I knew existed to the pursuit of effectual study and that I might be instrumental in introducing new and efficient methods, but finding my hopes of being useful frustrated and that there were circumstances of disgrace superadded I thought it high time to resign. I now proceed to state in detail the principal reasons for this step....
>
> I have thus stated some of the principal reasons for tendering my resignation. The assigning of such reason in detail did not appear to me to be at all necessary; but in compliance with your especial requests I have frankly submitted them. (উদ্ধৃত : সফিউদ্দিন আহমদ, ২০০৮ : ৬৩, ৭০)

সম্পাদকের কাছে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র জমাদানের সংবাদ প্রকাশিত হলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ সমবেতভাবে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করার অনুরোধ জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি পত্র উপস্থাপন করেন।[২] বিদ্যাসাগর পদত্যাগে ছিলেন বদ্ধপরিকর, তাই কোনো উদ্যোগই তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সফল হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সেকালে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকরি মুহূর্তেই ছেড়ে দেওয়া দুঃসাহসের কাজ ছিল। কিন্তু নীতির প্রশ্নে বিদ্যাসাগর কখনো আপোস করেননি। এ সম্পর্কে মজার একটা কৌতুকের কথা এখানে স্মরণ করা যায় :

> তিনি (বিদ্যাসাগর) আকস্মিকভাবে পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় রসময় দত্ত (মতান্তরে বিদ্যাসাগরের আত্মীয়েরা) নাকি কাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'বিদ্যাসাগর খাবে কি?' একথা শুনে বিদ্যাসাগর জবাব দিয়েছিলেন, 'বোলো বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।" (মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান, ২০০৪ : ১০)

সংস্কৃত কলেজের চাকুরি পরিত্যাগের পর জীবিকার প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর বিকল্প পথ বেছে নেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের (১৮১৭-১৮৮৫) সঙ্গে পরামর্শ করে ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠা করেন 'সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরী' নামের একটি প্রতিষ্ঠান। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক এবং প্রিয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে সমান অংশীদারিত্বে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠা করেন সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটরী। প্রেস প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিদ্যাসাগর কিংবা মদনমোহন কারো কাছেই ছিল না। প্রেস প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যাসাগর সুহৃদ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ছয় শত টাকা ধার করেন। প্রেস প্রতিষ্ঠার পর কোন বই প্রকাশ করা যায় তা নিয়ে ভাবতে থাকেন বিদ্যাসাগর। সমকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়নদের ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের (১৭১২-১৭৬০) *অন্নদামঙ্গল* কাব্য পড়ানো হতো। সেকালে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের জনপ্রিয়তা ও চাহিদাও ছিল প্রচুর। বিদ্যাসাগর ভাবলেন সুসম্পাদিত *অন্নদামঙ্গল* প্রকাশ করতে পারলে ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন মার্শালের আনুকূল্য পাওয়া যেতে পারে। ইতঃপূর্বে (এপ্রিল, ১৮৪৭) মার্শালের তৎপরতায় প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে *বেতাল পঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭) গ্রন্থের একশো কপি সরকারের কিনে নেওয়ার কথা বিদ্যাসাগরের মনে ছিল। ১৮৪৭ সালের ৭ই জুন মদনমোহন এক চিঠিতে মার্শালকে জানালেন, *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের শুদ্ধপাঠ-সম্বলিত বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত এক সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি (মার্শাল) যদি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য প্রতি কপি ছ-টাকা করে একশো বই কেনার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আনুমানিক পাঁচশো পৃষ্ঠার (দু'খণ্ডে বিভক্ত) বইটি অবিলম্বে প্রকাশিত হতে পারে। বিদ্যাসাগর-কর্তৃক সম্পাদনার[৩] কথা জেনে মার্শাল উৎসাহিত হয়ে সরকারের কাছে একটি পত্র পাঠান।[৬] পত্রে তিনি লেখেন :

> ...Considering the celebrity of the work referred to and the imperfect manner in which it has before been edited and printed, I would beg to recommend that the government should encourage the pundit who is highly qualified for the undertaking by purchasing 100 copies of the price fixed namely, 6 rupees per copy. (নির্মল দাশ, ২০১৪ : ২১৪)

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়ে মার্শাল গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন। ১৮৪৭ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে সংস্কৃত প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় দু'খণ্ডে বিন্যস্ত ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*। প্রকাশের পরই মদনমোহন ও বিদ্যাসাগর মার্শালের কাছে একশ' কপি বই পাঠিয়ে দিলেন। সরকারের কাছ থেকে টাকা পেয়েই বিদ্যাসাগর নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ধার শোধ করে দেন।

সংস্কৃত প্রেস থেকে প্রকাশিত *অন্নদামঙ্গল* পাঠক-সমাদৃত হলে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হলেন। মার্শালের সহযোগিতার ব্যাপারেও তাঁরা বেশ নিশ্চিত ছিলেন। এ কারণে শিক্ষার্থীদের উপযোগী উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক রচনার দিকে তাঁরা মনোযোগী হলেন। বাংলা পাঠ্যবই রচনার দায়িত্ব নিলেন বিদ্যাসাগর স্বয়ং, আর মদনমোহনের কাজ হলো বিভিন্ন সংস্কৃত বইকে ভালোভাবে সম্পাদনা করে শিক্ষার্থী-উপযোগী করে তোলা। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী থেকে বইসমূহ বিক্রি হতো। অতি অল্প দিনেই বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের গ্রন্থ-ব্যবসা লাভজনক হয়ে উঠলো। বিদ্যাসাগরের অর্থকষ্ট দূর হলো। এ সময় বিদ্যাসাগরের চাকরি ছিল না, বাঁধা কোনো আয়ের উৎসও ছিল না। তবু গ্রন্থ-ব্যবসা থেকে যে ভালো লাভ হতো তা বোঝা যায় এ তথ্য থেকে—১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটারের পদ গ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সংস্কৃত প্রেস স্থাপনের পর থেকে বিদ্যাসাগর-মদনমোহন সম্পর্ক ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে। কিন্তু দু'বছর যেতে-না-যেতেই অজ্ঞাত কারণে দু'জনের সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে, একসময় কথা-বার্তা বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায় মুখ দেখাদেখিও । অবস্থা এমন হয় যে, সংস্কৃত প্রেস বন্ধ হয়ে যায়। এমত-অবস্থায় বিদ্যাসাগর মদনমোহনের অংশ খরিদ করে নেন (অমিয়কুমার সামন্ত, ২০১২ : ৪১০)। তবুও আগের সেই রমরমা অবস্থা আর নেই। এবার বিদ্যাসাগর আবার চাকুরিমুখী হলেন, যোগ দিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে, হেড রাইটার পদে—যে কথা পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার পদে বিদ্যাসাগর মাসিক আশি টাকা বেতন পেতেন। অল্প কিছু দিন পরেই বিদ্যাসাগরের উপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বও অর্পিত হয়। বিদ্যাসাগর অতি নিষ্ঠার সঙ্গে হেড রাইটার এবং কোষাধ্যক্ষ—এই উভয় দায়িত্ব পালন করেন।

১৮৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরি ছেড়ে দেন বিদ্যাসাগর এবং পরের দিন সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। যোগদানের দশ দিনের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সংস্কারের জন্য শিক্ষা সংসদের কাছে একটি পরিকল্পনা[৪] পেশ করেন বিদ্যাসাগর। দীর্ঘ পরিকল্পনার সমাপ্তিতে বিদ্যাসাগর লেখেন :

> ...I beg leave to onserve that the changes now proposed by me in the system of the college are the results of a long and anxious considerations of the subject. They are extensive but I have endeavoured to select only those which are absolutely necessary for the efficiency of the institution, and which are quite practicable. Should the Council be pleased to adopt these suggestions, I have sanguine hopes that the happy and speedy results, under an efficient and steady supervision, will be, that the college will become a seat of pure and profound Sanscrit learning, and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen. (দ্রষ্টব্য : সফিউদ্দিন আহমদ, ২০০৮ : ৮৭-৮৮)

কাউন্সিল অব এডুকেশনের সুপারিশ অনুমোদনক্রমে বাংলা সরকারের আন্ডার সেক্রেটারি বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগপত্র প্রদান করেন ১৮৫১ সালের ২১শে জানুয়ারি। পরের দিন ২২শে জানুয়ারি ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ১৮৫২ সালের ১৩ই জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্রদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগদানের জন্য সরকারের কাছে এক প্রস্তাব পেশ করেন বিদ্যাসাগর। সরকার বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করেন। এর অল্পদিন পর ১৮৫২ সালের ১২ই এপ্রিল পূর্বে পেশাকৃত সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা পরিকল্পনার পরিশিষ্ট হিসেবে একটি প্রতিবেদন শিক্ষা সংসদের কাছে প্রেরণ করেন বিদ্যাসাগর।[৫] এই প্রতিবেদন বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার এক অনন্য দলিল হিসেবে উত্তরকালে স্বীকৃত হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের সার্বিক উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য শিক্ষা সংসদ কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ জে. আর. ব্যালেন্টাইনের কাছে প্রেরণ করে। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে ব্যালেন্টাইন বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব মূল্যায়নে নেতিবাচক অভিমত ব্যক্ত করেন :[৬]

> Dr. Ballantyne in his report of August 1853 raised many objections regarding Vidyasagar's projects especially regarding philosophy. Amongst others he criticized the following points. He basically doubted that students would be able to study at the same time Indian and European philosophies. They would not be able to connect the

> content of philosophy read in one language with the considerations and thoughts read in another language, so that they would come to the conclusion that truth is double, he argued. Ballantyne instead wanted to demonstrate that "our English sciences are really developments and expansions of truths, the germs of which the Sanscrit systems contain" and that these valued germs are not ignored in or opposed to English science but "might easily be shown to be involved in it." Students of the Sanskrit College should be able "to understand both the learned of India and the learned of Europe, and to interpret between the two...by showing that European science recognizes all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation." (Ashim Mukhopadhyay, 1993 :145)

ডক্টর ব্যালেন্টাইনের অভিমতের বিরুদ্ধাচরণ করে বিদ্যাসাগর তীব্র কটাক্ষ করেন এবং পুনরায় তার প্রস্তাবের পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন।[৭] ১৮৫৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে শিক্ষা সংসদের সচিব এফ. আই. মৌয়াতের কাছে লেখা এক চিঠির মাধ্যমে বিদ্যাসাগর ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট খণ্ডন করেন এবং নিজের অভিমত জোরের সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁর মন্তব্যের মাঝেই ধরা পড়ে শিক্ষাদার্শনিক হিসেবে বিদ্যাসাগরের স্বকীয়তা :

> Vidyasagar rejected most of all Ballantyne's method of searching for correspondence between ancient Indian philosophy and European science in order to make modern science more acceptable for Indian pandits : "They are a body of men whose longstanding prejudices are unshakable." Instead of looking for the traditional learned of India the masses had to be educated, and the task the Sanskrit College was confronted with should be the training of capable teachers for this purpose. (Ashim Mukhopadhyay, 1993 : 146)

১৮৫৪ সালের জানুয়ারি মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটে। সিভিলিয়ানদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এ মাসেই গঠন করা হয় বোর্ড অব এগজামিনার্স। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ব্রিটিশ সরকার বোর্ড অব এগজামিনার্সের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেয়। ১৮৫৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি এডুকেশন

কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের কাছে মাতৃভাষায় জনশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর একটি নোট উপস্থাপন করেন। এই নোটে বিদ্যাসাগর যা লেখেন, তাতে ধরা পড়েছে জনশিক্ষা বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা।

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ রহিত করার জন্য এ সময় নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য এবং ২৭শে ডিসেম্বর বহুবিবাহ রহিত করার জন্য সরকারের নিকট তিনি গণস্বাক্ষরিত আবেদনপত্র পেশ করেন। ১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়। ৭ই ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিধবা কালীমতির প্রথম বিধবাবিবাহ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন পানিহাটী-নিবাসী মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কলকাতা-নিবাসী ঈশানচন্দ্র মিত্রের বিধবা কন্যার বিয়ে হয়। কিছুদিন পরে রাজনারায়ণ বসুর এক কাকাও জনৈকা বিধবাকে বিয়ে করেন। এসব বিয়েতে বিদ্যাসাগর অনেক পরিশ্রম করেন, ব্যয় করেন অনেক অর্থ।

১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৫৪ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং ১লা মে থেকে ওই পদে প্রথম নিযুক্ত হন এফ. জে. হেলিডে। ১৮৫৭ সালের ১৯শে জুলাই তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেট স্যার চার্লস উড-এর বিখ্যাত 'Education Dispatch'-এর আলোকে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশ ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে (অমিয়কুমার সামন্ত, ২০১২: ৪১১)। ১৮৫৫ সালের ১লা মে থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া এবং বর্ধমান জেলার শিক্ষাবিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। নিযুক্তিলাভের পরপরই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করতে আরম্ভ করেন বিদ্যাসাগর। চার জেলার বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করাই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান কাজ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার চেয়ে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেই তিনি অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠেন।

১৮৫৭ সালের ব্যারাকপুর সিপাহি বিদ্রোহ অতি অল্প সময়ে সমগ্র উত্তরভারতে ছড়িয়ে পরে। এ সময় ভারত সরকারের নির্দেশে সংস্কৃত কলেজের পাঠদান বউবাজারে স্থানান্তর করা হয় এবং সংস্কৃত কলেজের ক্লাসরুমে সরকারের অনুগত সৈনিকদের জন্য অস্থায়ী হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। এই দ্বৈত কারণে সংস্কৃত

কলেজের অধ্যক্ষতার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৬৮ সালের ৩রা নভেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করেন বিদ্যাসাগর। অভিন্ন কারণে, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে অধিক মনোযোগী হবার তাগিদে তত্ত্ববোধিনী সভা এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গেও সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন বিদ্যাসাগর।

১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে বিদ্যাসাগর ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সালে বিদ্যাসাগর ওয়ার্ড ইন্সটিটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ সালের জুলাই মাসে লন্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন বিদ্যাসাগর। ১৮৬৬ সালে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন (পূর্বনাম : ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল) পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসব তথ্য একজন পণ্ডিত এবং শিক্ষাবিদ হিসাবে বিদ্যাসাগরের সামর্থ্যেরই পরিচায়ক। শিক্ষা উন্নয়নের পাশাপাশি এসময় দুর্গত মানুষেরও পাশে দাঁড়িয়েছেন বিদ্যাসাগর। ১৮৬৬ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বিশেষ করে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এ সময় বিদ্যাসাগর বীরসিংহ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দুর্গত মানুষদের জন্য একটি অন্নছত্র স্থাপন করেন। দীর্ঘ পাঁচ মাস নিজ খরচে এই অন্নছত্র পরিচালনা করেন বিদ্যাসাগর। ১৮৬৮-১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে পরে। ক্রমে ম্যালেরিয়া মহামারি রূপ ধারণ করে। এ সময় বিদ্যাসাগর বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের জন্য বর্ধমানে একটি ডিসপেনসারি স্থাপন করেন। এই ডিসপেনসারি থেকে ম্যালেরিয়ায় আক্তান্ত রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হতো।

সমাজসেবাধর্মী কাজ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর অনেক টাকা খরচ করেন। ভাইদের ভরণপোষণের জন্যও তাকে অর্থ জোগান দিতে হতো। এ কারণে ক্রমে বিদ্যাসাগর কর্পদকশূন্য হয়ে পড়েন। ১৮৬৯ সালের আগস্ট মাসে ঋণশোধের জন্য সংস্কৃত প্রেসের এক তৃতীয়ংশ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এবং এক তৃতীয়াংশ কালীচরণ ঘোষের কাছে মোট আট হাজার টাকায় বিক্রি করেন। অন্যদিকে, কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে বিনামূল্যে বুক ডিপজিটরী দান করে দেন বিদ্যাসাগর।

১৮৭০ সালের ১১ই আগস্ট পুত্র নারায়ণের সঙ্গে বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিয়ে দেন বিদ্যাসাগর। ১৮৭২ সালে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুইটি ফান্ড। এই ফান্ড থেকে দুঃস্থ হিন্দু নারীদের আর্থিক সাহায্য দিতেন বিদ্যাসাগর। ১৮৭৪ সালে সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় ভারত সরকার। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের অভিমত জানতে চায় সরকার। বিদ্যাসাগর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অভিমত প্রদান করেন, অথচ সরকার প্রচার করে যে বিদ্যাসাগর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপকের পদ

Dhaka University Institutional Repository

বিলোপ সাধারণের জন্য মত দিয়েছে। সরকারের ঐ মিথ্যাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বিদ্যাসাগর। শেষ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল ক্যাম্পবেল মূল সত্য প্রকাশ করতে বাধ্য হন। ১৮৭৪ সালের ২৮শে জানুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির জাদুঘরে বিদ্যাসাগরকে অনুপ্রবেশে বাধার সৃষ্টি করা হয়। কারণ তাঁর পায়ে ছিল চটি জুতো। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ক্রমে জাতীয় তর্ক-বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর সারাজীবন সৎপথে থেকে জীবিকা নির্বাহ করেছেন, নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন আজীবন আপসহীন। পুত্র নারায়ণ অসৎপথে গেছে জেনে তার সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তার বহুমাত্রিকতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী আলোকিত এক মননশীল মানুষ। তাঁর চরিত্রে সমাবেশ ঘটেছিল নানাবিধ সদগুণের, তাঁর সমাজচিন্তাতেও দেখা দিয়েছিল ইতিবাচক বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইহজাগতিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদিতা, বাস্তববাদিতা, আধুনিকতা, মানবমুখিনতা, নারী-পুরুষের সমতাভাবনা—এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তার বিশেষ বিশেষ প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত। উপর্যুক্ত ইতিবাচক ও সদর্থক বৈশিষ্ট্যই সমকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ব্যতিক্রমী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তার বৈশিষ্ট্যাবলি নিচে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হলো।

ক. **ইহজাগতিকতা** : ইহজাগতিকতা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অদৃষ্টবাদী চেতনা, নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত ভাবনা কিংবা পারলৌকিক ভাবাদর্শ দ্বারা বিদ্যাসাগর কখনো পরিচালিত হননি। পরকাল নয়, বিদ্যাসাগরের কাছে সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে সমকালীন বাস্তব জগৎ তথা ইহজগৎ। অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic), বাস্তববাদী (Realistic) এবং প্রয়োগবাদী (Pragmatist) দার্শনিক চিন্তা-চেতনা থেকে বিদ্যাসাগর উপনীত হয়েছেন ইহজাগতিক চেতনায় (আব্দুল মালেক, ১৯৯২ : ৮৯)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অনেক গবেষক রহস্যের কথা বলেছেন, স্থির কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি ; তবে সকল গবেষকই তাঁর ইহজাগতিক চেতনাকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। বস্তুত, তিনি ইহলোক ছাড়া আর কোনো লোকে বিশ্বাস করতেন না (বিনয় ঘোষ, ৩১১ : ৩৮১)। ধর্মকে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয় হিসেবেই বিবেচনা করেছেন, ধর্মীয় চেতনা দিয়ে জগতের সবকিছুকে তিনি আচ্ছন্ন করতে চাননি।

বিদ্যাসাগরের কাছে ধর্ম ছিল একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। তাই সামাজিক কোনো কাজেই তিনি ধর্মকে টেনে আনেননি। ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে সামাজিক কর্মে ব্যবহার করাকে নির্বুদ্ধিতা বলে তিনি মনে করতেন। ধর্ম যেহেতু প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়, তাই ধর্ম নিয়ে তিনি কখনো কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করেননি। ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল বলেই তাঁর সমাজ-বিষয়ক চিন্তাধারা ঈশ্বর ও পারলৌকিককেন্দ্রিক না

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে, হয়ে উঠেছিল ইহজগৎ ও মানবকেন্দ্রিক। সমালোচক লিখেছেন : 'ইহজাগতিক মনোভাবের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ইউরোপীয় রেনেসাঁস যুগের নতুন মানুষদের গোত্রভুক্ত করা চলে এবং এই মাত্রায় তিনি তৎকালীন বাঙালী সমাজের অদ্বিতীয় মানুষ ছিলেন' (আব্দুল মালেক, ১৯৯২ : ৯১)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ইহজাগতিক চেতনা তাঁর সমাজসংস্কারমূলক প্রতিটি কর্মেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ বন্ধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, নারীশিক্ষার প্রসার—প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের ইহজাগতিক চেতনার প্রভাব ছিল ব্যাপক। এসকল ক্ষেত্রে পরলোকের কথা নয়, তিনি জাগতিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মাটির পৃথিবীটাকেই বিদ্যাসাগর বড় করে দেখেছেন, মৃত্যু-উত্তর পরলোক তাঁর কাছে কখনো প্রাধান্য পায়নি। এ কারণে ইহলোককেই তিনি তাঁর সকল সাধনা ও কর্মের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমনস্কতা, বাস্তববাদিতা কিংবা আধুনিকতার মৌল উৎসও তাঁর এই ইহজাগতিক চেতনার মধ্যে নিহিত।

খ. **বিজ্ঞানমনস্কতা :** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-বিষয়ক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞানমনস্কতার সুস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে। সমাজ-বিশ্লেষণে বিদ্যাসাগর প্রথালালিত প্রচল পথে না গিয়ে তুলনামূলক বিচার ও ব্যক্তিগত বিবেচনা দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, রেনেসাঁসচেতনা এবং বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন (আব্দুল মালেক, ১৯৯২ : ৭২)। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেল, লিনিয়াস, উবলে, উইলিয়ম জোন্স, টমাস জেঙ্কিন্স—এসব বিজ্ঞানীর বই তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের জীবনী তিনি রচনা করেছেন এবং তা স্কুলের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগরের *জীবনচরিত* (১৮৪৯) এবং *চরিতাবলী* (১৮৫৬) গ্রন্থদ্বয় পাঠ করলেই অনুধাবন করা যাবে তাঁর সমাজচিন্তা গঠনে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকবৃন্দ তাঁকে কীভাবে প্রভাবিত করেছেন। অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের রচনার তিনি ভাবানুবাদ করেছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার অনুশীলন করেছেন। *বোধোদয়* (১৮৫১) গ্রন্থেও পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের রচনার সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল এবং ওইসব বই যে তিনি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করেছেন তারও সাক্ষ্য গ্রন্থমধ্যে পাওয়া গেছে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের রচনাবলির ভাবানুবাদ কিংবা তাঁদের জীবনচরিত রচনার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর বাঙালি সমাজের রক্ষণশীলতা ও কূপমণ্ডূকতা দূর করে বিজ্ঞানচিন্তা ও যুক্তিবাদের আবহ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের গ্রন্থপাঠ বিদ্যাসাগরকে বিজ্ঞানমনস্ক হতে প্রাণিত করেছে। বস্তুত, 'বিদ্যাসাগরের চরিত্রে ষোল আনা দেশি সংহতিতে এসে মিলেছিল য়ুরোপের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক শক্তি' (অশ্রুকুমার শিকদার ও দেবেশ রায়, ২০১১ : ২৯)।

Dhaka University Institutional Repository

নারীসমাজের সামূহিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারায় বিজ্ঞানমনস্কতা গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনসহ যে-সব সমাজসংস্কারমূলক কাজে বিদ্যাসাগর অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার সবকিছুতেই বিজ্ঞানচেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট। বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে তিনি বাল্যবিবাহের দোষ শনাক্ত করেছেন। 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর বিষয়গুলো বিদ্যাসাগর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। বাল্যবিবাহ ব্যক্তির শারীরিক বিকাশের ক্ষতিসাধন করে এবং তা সমাজজীবনকেও পঙ্গু করে দেয় বলে বিদ্যাসাগর মত প্রকাশ করেছেন। বাল্যবিবাহের প্রবণতাই যে বাঙালি সমাজের দুর্দশার মূল কারণ, বিদ্যাসাগর তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

বহুবিবাহের ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে অশেষ দুর্গতি দেখা দেয়, বিদ্যাসাগর একাধিক নিবন্ধে তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আলোচনা করেছেন। একজন সমাজবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে বিষয়টির উপর তিনি আলোকসম্পাত করেছেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়টিও বিদ্যাসাগরের চেতনায় তাঁর বিজ্ঞানভাবনা থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। বহুবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন-বিষয়ক তাঁর চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে সমাজবৈজ্ঞানিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও জীববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সুসমন্বিত প্রকাশ ঘটেছে। বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের আবেগের সঙ্গে-সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি লিখেছেন :

> দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা বোধ করি, চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ! আপনারা অন্ততঃ কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগেক যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করা, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত ; অথবা দেশাচোরের অনুগত না হইয়া, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত। এ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃকল্প, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া, আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ৮৩৪)

বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ চালুর মতো বহুবিবাহরহিত করার জন্য বিদ্যাসাগরের ভাবনার মধ্যেও আমরা বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাই। বাঙালি সমাজে নানামাত্রিক সমস্যা, বিশেষত বিধবা সমস্যার মূল কারণ হিসেবে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথাকেই শনাক্ত করেছেন। বহুবিবাহের কারণে একজন পুরুষের

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর ফলে বহু নারী অকাল বৈধব্যদশায় নিপতিত হয়। কেবল ভাবনা নয়, বিজ্ঞানীর মতো বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তার আলোকে বিদ্যাসাগর তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। হিন্দুসমাজের জাতি-বর্ণ প্রথার কারণে বহুবিবাহের ফলস্বরূপ বহু নারীর বৈধব্যদশা বিদ্যাসাগর হৃদয়াবেগ দিয়ে দেখেছেন বটে কিন্তু বিবেচনা করেছেন একান্তই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

কেবল নারীকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড নয়, শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রেও নানাভাবে নানা-সূত্রে বিদ্যাসাগর তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। একথা সাহিত্যের চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে একটা প্রসঙ্গ এখানে উপস্থাপন করা যায়। *সীতার বনবাস* গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন—রামচন্দ্র যখন সীতার সতীত্ব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন, যখন সীতার জননী বসুন্ধরা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং পাতালে হারিয়ে যায় সীতা। বিদ্যাসাগরের কাছে এটা অলৌকিক বলে মনে হলো। তিনি দেখিয়েছেন, বিরহ এবং যন্ত্রণায় বিপন্ন সীতা সতীত্ব পরীক্ষার কথা শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন। এটা একান্তই স্বাভাবিক এবং বাস্তবসম্মত। এখানেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয়। তিনি যেভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন এবং বিষয়সমূহ বিন্যাস করেছেন, তাতে তাঁকে অনায়াসেই একজন বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা-দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

গ. **যুক্তিবাদিতা :** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন যুক্তিবাদী মানুষ। জগৎ ও জীবনের সবকিছুকে তিনি যৌক্তিক উপায়ে বিবেচনা করতেন। তাঁর চিন্তা ও কর্মের ধারা সব সময় যুক্তির শাসনে ছিল আবদ্ধ। বিদ্যাসাগরের সমাজকল্যাণমূলক সকল প্রচেষ্টাই ছিল তাঁর একক সংগ্রাম। ধর্মপ্লাবনের যুগে তাঁর মতো মানুষের যথার্থ সঙ্গীলাভ ছিল প্রায়-অসম্ভব। তাই অনেক কাজই তাঁকে একক সংগ্রামের মাধ্যমে করতে হয়েছে। ফলে সর্বত্র সমান সাফল্যলাভ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবু বিভিন্ন কাজে সেটুকু সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন তাঁর মূল কারণ ছিল সকল কাজই তিনি যৌক্তিক পারম্পর্যে করার চেষ্টা করেছেন। সকল কাজকেই তিনি নিজস্ব যুক্তি দিয়ে বারবার যাচাই করে নিতেন। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য প্রমথনাথ বিশীর অভিমত :

> কি করিলে স্বল্পতম সময়ে শ্রেষ্ঠতম ফল পাওয়া যায়, সেই চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল তাঁহার প্রতিভা। এবং এক্ষেত্রে তাঁহার শ্রেষ্ঠতম শক্তিউৎস ছিল যুক্তি। বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মের প্রধান শক্তিই ছিল তাঁহার যুক্তি। (প্রমথনাথ বিশী, ২০১০ : ৪)

নবজাগরণের প্রবল যুক্তিনিষ্ঠা বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। নিজস্ব যুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি কোনো কাজ করেননি। প্রবল যুক্তিবাদী ছিলেন বলে বিদ্যাসাগর অনেক সময় নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে যুক্তির পথে হেঁটেছেন, যুক্তির পথ বর্জন করে স্বার্থের সঙ্গে আপস করেননি। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁকে যুক্তিবাদী হতে সহায়তা করেছে। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দার্শনিকবৃন্দও তাঁর চিত্তে সঞ্চার করেছেন অফুরন্ত সাহস। যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বলে প্রতিপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে তেমন সুবিধা করতে পারতেন না, বরং অনেক সময়ই তাঁকে সমীহ করতেন। সমাজে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ কেন বন্ধ করা উচিত, কেন চালু করা উচিত বিধবাবিবাহ—শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে একের পর এক যুক্তি উত্থাপন করে বিদ্যাসাগর তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর যুক্তি এবং তত্ত্বের কাছে ইউরোপীয় প্রশাসন পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। প্রবল যুক্তি দিয়ে তিনি নারীশিক্ষার পথে অগ্রসর হয়েছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তাঁর যুক্তির কাছে প্রশাসন পরাভূত হয়েছে। তাঁর যৌক্তিক বক্তব্যের কারণেই বেথুন গার্লস স্কুলটি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যাসাগর সকল চিন্তা ও কাজে যুক্তির পথে থাকতেন বলেই বিরুদ্ধবাদী বাঙালি সমাজও তাঁকে অশেষ শ্রদ্ধা করত। যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর যৌক্তিক বলেই বাঙালি সমাজে অদ্বিতীয় অনুপম অবস্থানে উপনীত হতে পেরেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই বলেছেন : 'যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্মসমূহের মধ্যে দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষসিংহ [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে স্বসমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া ঊর্ধ্বশির হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন' (শিবনাথ শাস্ত্রী, ২০০৩ : ১১৬)।

ঘ. **বাস্তববাদিতা** : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন মনে-প্রাণে একজন বাস্তববাদী মানুষ। যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানমনস্কতা বিদ্যাসাগরকে বাস্তববাদী হতে প্রেরণা দিয়েছে। বস্তুত, যুক্তিবাদিতা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বাস্তববাদিতা পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়—একটির সঙ্গে অন্যটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাস্তবতার নিরিখে বিদ্যাসাগর জীবন ও জগৎকে বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করতেন তার কর্মসূচি। নারীশিক্ষা এবং সমাজবিষয়ক নানা কর্মকাণ্ডে তিনি সবসময় বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিতেন। মনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কাজেই বাস্তবতার কারণে তিনি সম্মতি দিতেন না। প্রসঙ্গত বলা যায়, কলকাতায় নারী নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি অসম্মত ছিলেন। কেননা, বাস্তবতা দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন এমন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে না। কর্তৃপক্ষ তবু নারী নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন কিন্তু তিন বছরের মধ্যে শিক্ষার্থীর অভাবে নর্মাল স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেল। এভাবেই প্রতিটি কাজে বিদ্যাসাগরের বাস্তববাদী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর গোটা পৃথিবীটাকে দেখেছেন বাস্তব সত্তা হিসেবে—সে-সূত্রে বাঙালি সমাজও তাঁর কাছে একটি বাস্তব সত্তা। মিথ বা মায়া কিংবা অলীক সত্তাকে বিদ্যাসাগর কখনো স্বীকার করেননি। বাস্তববাদী দার্শনিক চিন্তা থেকে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে তিনি ভ্রান্ত দর্শন হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ কারণে বাস্তববাদী বিদ্যাসাগরকে অনেকে নাস্তিক বলেছেন। আস্তিক বা নাস্তিক নয়, বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবেই একজন বাস্তববাদী মানুষ। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় প্রমথনাথ বিশীর অভিমত :

> বস্তুত বিদ্যাসাগর আস্তিক নাস্তিক কিছুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একান্তভাবেই Practical মানুষ। বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের মত Practical ব্যক্তি আর কেহ জন্মিয়েছেন কিনা সন্দেহ। (প্রমথনাথ বিশী, ২০১০ : ৫)

নারীউন্নতি এবং শিক্ষাসংস্কারের সকল প্রচেষ্টায় বিদ্যাসাগরের বাস্তববুদ্ধির পরিচয় সুস্পষ্ট। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভাবনা ও কর্মপ্রয়াসে বাস্তববাদিতার ছায়াপাত ঘটেছে। শাস্ত্র দিয়েই তিনি তার যুক্তিসমূহ তুলে ধরেছেন। কেননা তিনি বুঝেছিলেন ধর্ম ও সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি সমাজকে ধর্ম দিয়েই সুপথে আনতে হবে—অন্য কোনো পথ তারা গ্রহণ করবে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়—নারীশিক্ষার জন্য যে গাড়িতে করে স্কুলের ছাত্রীদের আনা-নেওয়া করা হতো, তার উভয় পাশে তিনি নারীশিক্ষার পক্ষে শাস্ত্রবচন লিখে দিয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ কেন প্রচলন করা উচিত, তা-ও তিনি শাস্ত্রবচনের সহায়তায় ব্যাখ্যা করেছেন। বিদ্যাসাগরের এই প্রখর বাস্তববাদী চেতনার পরিচয় দিতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন :

> সমাজবিষয়ক চিন্তা ও কর্মের যে সব ক্ষেত্র বিদ্যাসাগরকে আকৃষ্ট করেছিল তাতেও তাঁর বাস্তববাদিতার স্বাক্ষর স্পষ্ট। বাল্যবিবাহদোষ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিরোধ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কৌশল হিসেবে এসকল ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়েছিলেন। এসব প্রথা ও রীতিনীতি কতখানি শাস্ত্রসম্মত বা শাস্ত্র দ্বারা অনুমোদিত ছিল তা তিনি প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কারণ তিনি বাঙালীর ধর্মানুরাগের বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন। ধর্মকে এড়িয়ে বা আঘাত করে সমাজ থেকে কোন ক্ষতিকর প্রথা বা আচার রীতিকে যে দূরীভূত করা সম্ভব নয় তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। (আব্দুল মালেক, ১৯৯২ : ৭৮)

সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগরের বাস্তববুদ্ধির কথা উত্তরকালের সব গবেষকই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। নারীর কল্যাণের জন্য বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগে এই চেতনা সবিশেষ লক্ষণীয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত : 'বিদ্যাসাগর শাস্ত্র, যুক্তি, বাস্তবজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োগ করে বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রমাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন' (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ১৯৭)। বাস্তববাদী ছিলেন বলেই বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য বিদ্যাসাগর রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বিধবাবিবাহের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরসংগ্রহ অভিযানে বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াস তাঁর দূরদর্শী চিন্তা এবং প্রখর বাস্তবতাবোধের পরিচয় বহন করে। সকল সংস্কারপ্রয়াসেই বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদিতা এবং বাস্তবতাবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। সমন্বয়বাদী চিন্তা দিয়ে সবকিছুকে তিনি বাস্তবদৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> ...রামমোহনের মতো প্রধানত 'idealist' বা কৃষ্ণমোহনের মতো 'extremist' কোনোটাই তিনি [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] হতে পারেননি। তাঁর সমকালীন সমাজকর্মীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সত্যকার 'realist', এবং আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তববাদের সমন্বয় তাঁর চরিত্রে যেমন ঘটেছিল, এমন আর কারো চরিত্রে বোধ হয় ঘটেনি। এই সমন্বয়ই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৩৯৩)

ঙ. **আধুনিকতা :** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন সর্বান্তকরণে একজন আধুনিক মানুষ। নবজাগরণের চেতনায় স্নাত ছিল তাঁর মানসলোক। তাই তিনি সমাজসংস্কারের জন্য নানামাত্রিক কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, যা ছিল একান্তই আধুনিক চিন্তাপ্রসূত। উনিশ শতকের মানুষ হয়েও বিদ্যাসাগর যা ভেবেছেন এবং করেছেন, একুশ শতকের চোখ দিয়ে তা দেখতে গেলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁকে অনায়াসেই আখ্যায়িত করা যায় একুশ শতকের মানুষ হিসেবে। বস্তুত, ইহজাগতিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদিতা এবং বাস্তববাদিতা—এসব বৈশিষ্ট্যের সমাহারেই বিদ্যাসাগরের চেতনায় সৃষ্টি হয়েছে আধুনিকতার স্বর্ণসৌধ।

সমাজসংস্কার, নারীকল্যাণ এবং শিক্ষা-উন্নয়নের জন্য বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াস আধুনিক চিন্তার পরিচয় বহন করে। আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোকে বিদ্যাসাগর সমাজের নানামাত্রিক সংস্কার করার চিন্তা করেছেন, আধুনিক মানুষের চোখ দিয়ে দেখেছেন অসহায় বাঙালি নারীদের। শিক্ষা-উন্নয়নের জন্যও তিনি আধুনিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য যে পর্যায়ক্রমিক পাঠ্যবই রচনা করেছেন, তাতে তাঁকে অনায়াসেই একজন আধুনিক শিক্ষাচিন্তক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কারের জন্য ডক্টর ব্যালেন্টাইনের অভিমত তিনি যুক্তি দিয়ে বাতিল করতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের নানা কর্ম ও আচরণেও তাঁর আধুনিক চিন্তার পরিচয় সুস্পষ্ট। বিধবাবিবাহের পক্ষে তিনি আন্দোলন করেছেন—এটা ছিল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম। তাই পুত্রের বিধবাবিবাহের সংবাদে তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন সানন্দে। যখন শুনেছেন, বিধবাকে বিয়ে করলে আত্মীয়-স্বজন বর্জন করবে পুত্র নারায়ণের বিয়ের অনুষ্ঠান, তাতেও তিনি পিছপা হননি। এখানেই বিদ্যাসাগরের অনন্য আধুনিকতা। আধুনিক মানুষের মতো তাঁর কথা ও কাজের মাঝে কোনো বৈপরীত্য ছিল না—কথা ও কাজে তিনি ছিলেন একান্তই সনিষ্ঠ ও একাত্ম।

উনিশ শতকে ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ সমাজে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও চিন্তা-চেতনায় বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর কালের অন্য মানুষদের থেকে অনেক অগ্রসর। প্রকৃত প্রস্তাবেই তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ কালের মানুষ। বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা ঋদ্ধ ছিল চিরকালীনতার সম্ভাবনায়। এ কারণেই শতাব্দীর সীমানা পেরিয়ে বিদ্যাসাগর বাঙালি সমাজে এখনও প্রাসঙ্গিক। অব্যাহত এই প্রাসঙ্গিকতাই বিদ্যাসাগরের অপ্রতিম

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকতার উৎস। আধুনিক ছিলেন বলেই পুরাতন রীতি-নীতি-প্রথায় তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন না, কিংবা প্রচল বলেই সকবিছুকে বিনা বিচারে মান্য করেননি। বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা নির্দেশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিমত এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> তাঁর [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন, বিদ্যাসাগর সেই যুগকে এড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থ্যাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে ; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকে বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৬ : ৪৭)

চ. **মানবমুখিনতা** : মানবমুখিনতাই ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-বিষয়ক চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। মানবতাবাদী দর্শন দ্বারা পরিস্রুত ছিল বিদ্যাসাগরের চিত্তলোক। বিদ্যাসাগরের সমুদয় কর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানবমুক্তি। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও কঠোর সাধনার ফলে মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ ও অন্ধ-বিশ্বাসের বন্ধন থেকে উনিশ শতকে বাংলাদেশে মানবমুক্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল। মানবমুখী এই প্রবণতা সৃষ্টিই বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সমাজচেতনা ও সাহিত্যভাবনা—উভয় ক্ষেত্রেই তার মানবমুখী ভাবনার প্রভাব পড়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় বিনয় ঘোষের অভিমত : '... কোনো গতিশীল সামাজিক আদর্শের সংগ্রামের ব্যর্থতা কেবল তার সাময়িক অনুষ্ঠানের ফলাফল দিয়ে বিচার করা যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনের 'হিউম্যানিস্ট' বা মানবমুখিন আদর্শ যেমন তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে তেমনি তাঁর সাহিত্যকর্মে, শিক্ষাসংস্কারে এবং সমাজকল্যাণের গণতান্ত্রিক কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্র সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছি। সেইখানেই তাঁর আসল ঐতিহাসিক সার্থকতা' (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৪৩০)।

সমকালীন বাঙালি সমাজে ব্যতিক্রমী মানবমুখী চিন্তার কারণে একটি স্বকীয় মর্যাদার আসনে উপনীত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল গভীর বিশ্বাস অতুল ভালোবাসা। তাঁর চেতনায় ধরা দিয়েছিল রেনেসাঁস-উত্তর ইউরোপীয় উদার মানববাদ ও যুক্তিনিষ্ঠা। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই মানবমুখিনতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে এভাবে : 'বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালী জীবনের জড়তা সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের দিকে নহে সাম্প্রদায়িতকার দিকে নহে করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার

Dhaka University Institutional Repository

সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমতো হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে, তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্য তাহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৬ : ৭৪)। রবীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই মনুষ্যত্বচেতনা ছিল তাঁর সকল কর্মের মূল শক্তি।

মানবমুখিতায় বিদ্যাসাগর অনন্য হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ইহজাগতিক চেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বাস্তববুদ্ধির শক্তিতে। সমালোচক এর সঙ্গে তাঁর অদম্য পৌরুষের কথাও উল্লেখ করেছেন (আব্দুল মালেক, ১৯৯২ : ৯৮)। বিজ্ঞানমনস্ক এবং ইহজাগতিক চেতনা তাঁর চিত্তলোকে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল বলে বিদ্যাসাগর অলৌকিক অতিপ্রাকৃত সত্তা নয়, মানুষকে সব সময় বিবেচনা করেছেন রক্তে-মাংসে গড়া প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে। মানুষকে তিনি দেবত্বের শক্তি দিয়ে আচ্ছাদিত করেননি। বস্তুত ধর্ম ও দেবতায় কোনো বিশ্বাস ছিল না বিদ্যাসাগরের। সমাজসংস্কার এবং নারীকল্যাণমূলক বিদ্যাসাগরের সকল চিন্তা ও কর্মের পিছনে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর মানবমুখী ভাবনা। সমালোচক লিখেছেন : 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারমূলক কাজ ও চিন্তার মূল সুরই ছিল মানবমুখিতা। বাঙালী সমাজে মানুষের প্রতি বিশেষ করে নারীর প্রতি যে অমানবিক আচরণ বিদ্যমান ছিল তার পরিসর ও গভীরতা উপলব্ধি করে বিদ্যাসাগর এসব সমাজসংস্কারমূলক কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ-সংক্রান্ত তাঁর যাবতীয় পদক্ষেপের মূলে ছিল তাঁর এই মানবমুখিন উপলব্ধির বিষয়টি' (আব্দুল মালেক, ১৯৯২ : ১০১)।

ছ. **নারী-পুরুষের সমতাভাবনা** : পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, উনিশ শতকে জন্ম হলেও চিন্তা-চেতনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক কালের মানুষ। আধুনিক চেতনা দিয়েই তিনি নারী-পুরুষের সমতার কথা ভেবেছেন। নারী-পুরুষের সমতাভাবনা বিদ্যাসাগর-চরিত্রের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। বাঙালি নারীকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি বিবেচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো অসমতা বা বৈষম্য নেই। সমকাল থেকে অনেকটা অগ্রবর্তী অবস্থানে থেকে বিদ্যাসাগর নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ে না দেখে, দেখেছেন সামাজিক জেন্ডারের দৃষ্টিকোণে। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমুক্ত সমান অগ্রগতি প্রত্যাশা করেছেন। সমান অগ্রগতির জন্য পিছিয়ে-পড়া নারীসমাজের জন্য তিনি প্রথমে নানামাত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

নারীসমাজের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর যে-সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং যেভাবে চিন্তা করেছেন, একুশ শতকের চোখ দিয়ে সেদিকে তাকালে বিস্মিত হতে হয়। বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ একালের উদার নারীবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সমাজকাঠামোর মধ্যে থেকেই বিদ্যাসাগর সংস্কারের মাধ্যমে নারীমুক্তির কল্পনা করেছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন নারী-পুরুষের সমতায় এক মুক্ত পৃথিবীর। এদিক বিবেচনায় বিদ্যাসাগরকে অনায়াসেই একজন উদার নারীবাদী চিন্তক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন নানা সদ্‌গুণের অধিকারী একজন আলোকিত মানুষ। তাঁর চিত্তলোকে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলেছিল আরও অনেক গুণ। হাজার বছরের বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি যথার্থই ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী আধুনিক মানুষ। নবজাগরণ যুগের সমস্ত সদ্‌গুণ আত্তীকরণ করেই বিদ্যাসাগর স্বকীয় সত্তা নিয়ে বাংলার সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিনয় ঘোষ যথার্থই বলেছেন : 'কেবল প্রাচীন ঋষিদের মতো জ্ঞান ও ইংরেজের মতো কর্মশক্তি নিয়েও বিদ্যাসাগর নবযুগের অদ্বিতীয় মানুষ হতে পারতেন না, যদি না তাঁর চরিত্রে যুগসুলভ প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, মানববোধ, সমাজচেতনা ও জাগতিক চেতনা প্রকাশ পেত। নবজাগরণের যুগের এই সমস্ত মহৎ গুণের সমাবেশ বিদ্যাসাগরচরিত্রে হয়েছিল বলেই, বিদ্যাসাগর বাংলার নবযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষের আসন অধিকার করতে পেরেছিলেন (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৩৮৩)। বিদ্যাসাগরের প্রতিভার এই বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য উনিশ শতকের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ছিল অনেকাংশে বিপ্লবাত্মক। বিশিষ্ট মার্কসবাদী সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দারের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

> He, as an intellectual, found in practical action the sole validity and utility for acquired truths, and thus embraced newer ideals of life, newer values and spiritual understanding. Or, Conversely, it could also be suggested that because he discovered through intellection new values of life, he could plunge into heroic deeds calculated to revolutionize Bengali social life (Arabinda Poddar, 1970 : 185)

সাহিত্যজীবন

বাঙালি সমাজকে শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্য বিদ্যাসাগর লেখনী ধারণ করেছেন। সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালি সমাজকে বিশেষত নারীদের তিনি শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। সাহিত্য রচনার জন্য তিনি সাধনা করেননি বরং তিনি সচেষ্ট ছিলেন পাঠ্যবই রচনায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় গবেষক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোক্ত অভিমত :

Dhaka University Institutional Repository

> Vidyasagar was not a man of literature, so to say—at least not consciously so—for he did not desire to be so. An out-and-out pragmatist in all spheres, perhaps he did not believe in art for art's sake. Definitely he did have the ability to create literary works, but he diverted it to writing textbooks. For this, some of his contemporaries tried to belittle his contributions branding him as a textbook writer. (Asit Kumar Bandyopadhyay, 1993 : 169)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম বই *বাসুদেব-চরিত* (আনুমানিক প্রকাশকাল : ১৮৪২)। পাণ্ডুলিপিতে রচয়িতার নাম না থাকলেও বিদ্যাসাগরের সকল জীবনীকার এবং অধিকাংশ গবেষক মনে করেন *বাসুদেব-চরিতই* বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ (অমিয়কুমার সামন্ত, ২০১২ : ৩৯৭)। আলোচ্য গ্রন্থটি *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর নির্বাচিত অংশের ভাবানুবাদ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম উল্লেখযোগ্য বই *বেতাল পঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭)। হিন্দি ভাষার লেখক লাল্লুজির *বৈতাল পচ্চীসী* নামক গ্রন্থের অনুবাদ *বেতাল পঞ্চবিংশতি*। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে লেখক হিসেবে বিদ্যাসাগরের নাম মুদ্রিত হতে থাকে। গ্রন্থ-রচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : 'কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ে তত্রত্য ছাত্রগণের পাঠার্থে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুক্ত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয় কোনও নূতন পুস্তক প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে আমি, *বেতাল পচ্চীসী* নামক প্রসিদ্ধ হিন্দি পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছিলাম।' (অমিয়কুমার সামন্ত, ২০১২ : ৩৯৭)।

বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশের পরপরই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। গ্রন্থটি এক সময় বাঙালির ঘরে ঘরে পঠিত হতো। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বিষয়ানুগ ভাষা ব্যবহার করেছেন। পাঠ্য বইয়ের অভাব দূর করার মানসে বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থ রচনা করেন। *বেতাল পঞ্চবিংশতির* পরে একে একে প্রকাশিত হয় *বাংলার ইতিহাস* (১৮৪৮), *জীবনচরিত* (১৮৪৯), *বোধোদয়* (১৮৫১), *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* (১৮৫১), *ঋজুপাঠ* (১-৩ খণ্ড : ১৮৫১), *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৩), ব্যাকরণ কৌমুদী (১-২ ভাগ : ১৮৫৩; ৩য় ভাগ : ১৮৫৪), *শকুন্তলা* (১৮৫৪)। *শকুন্তলা* গ্রন্থটি তৎকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহাকবি কালিদাসের *অভিজ্ঞান শকুন্তলম* শীর্ষক নাটকের গদ্যানুবাদ বিদ্যাসাগরের *শকুন্তলা*। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর রোমান্টিক ভাষা ব্যবহার করেন। *শকুন্তলা* গ্রন্থটিও বিদ্যাসাগর রচনা করেন পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার মানসে। একই সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঘরের মায়েরা অবসর সময় এই বই পাঠ করে যেন সাহিত্যরসের আস্বাদ পায়। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের সুবিখ্যাত প্রাইমার বা শিশুশিক্ষার বই *বর্ণপরিচয়* (১ম-২য় ভাগ)। বাংলা ভাষায় শিশুশিক্ষার বই হিসেবে বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়* একটি ঐতিহাসিক

প্রয়াস। সহজ ভাষায় এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এখানে বিদ্যাসাগর বর্ণ, বর্ণের শ্রেণিবিভাগ, লিখন কৌশল এবং পাঠ্য-বিষয় উপস্থাপন করেছেন। এ বছরেই প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের বহুল আলোচিত দুটি পুস্তিকা *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১ম পুস্তক : ১৮৫৫, ২য় পুস্তক : ১৮৫৫)। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত এই পুস্তিকাদ্বয় *Marriage of Hindu Widows* নামে অনূদিত হয়ে প্রকাশ লাভ করে। সমকালে এই গ্রন্থদ্বয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিদ্যাসাগর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে এই গ্রন্থদ্বয়ে বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন।

১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের উল্লেখযোগ্য প্রাইমার *কথামালা*। শিক্ষাবিভাগের পরিচালক গর্ডন ইয়ং-এর অনুরোধে টমাস জেমস-এর লেখা *AEsop's Fables* (১৮৪৯) গ্রন্থটি বিদ্যাসাগর বাংলায় *কথামালা* নামে অনুবাদ করেন। প্রথম সংস্করণে বইতে ছিল ৬৮টি কাহিনি, বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে শেষ সংস্করণে কাহিনির সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৪টি (অমিয়কুমার সামন্ত, ২০১২, ৩৯৯)। বিদ্যাসাগরের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রাইমার *চরিতাবলী* (১৮৫৬)। এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বিদ্যাসাগর লেখেন : 'যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে বালকদিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে' (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ১৩২৮)। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের অতি জনপ্রিয় বই *সীতার বনবাস* এবং অনুবাদগ্রন্থ *মহাভারত* (উপক্রমণিকা ভাগ)। *সীতার বনবাস* বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর ক্লাসিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তৎকালে *সীতার বনবাস* খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই গ্রন্থের উৎস সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

> এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতিপ্রণীত *উত্তরচরিত* নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত হইয়াছে। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ২৯০)

১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের *আখ্যানমঞ্জরী*। এ গ্রন্থে শিশু-কিশোর উপযোগী মোট আটাত্তরটি কাহিনি আছে। প্রাইমার বা বাল্যশিক্ষা হিসেবেই বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের একটি অতি জনপ্রিয় অনুবাদ গ্রন্থ *ভ্রান্তিবিলাস* (১৮৬৯)। উইলিয়ম শেক্সপীয়রের *The Comedy of Errors* নাটকের গদ্যানুবাদ বিদ্যাসাগরের *ভ্রান্তিবিলাস*। নাটকের বিদেশি আবহ পরিবর্তন করে বিদ্যাসাগর ভারতীয় আবহ সৃষ্টি করেছেন, ফলে এটি পাঠকনন্দিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিপক্ষে ছিলেন, গ্রন্থ রচনা করে এ বিষয়ে তিনি তাঁর যুক্তি তুলে ধরেছেন। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর রচনা করেন দুটি পুস্তিকা—*বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার :*

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৭১) এবং *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার : দ্বিতীয় পুস্তক* (১৮৭৩)। অপ্রধান রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য বিদ্যাসাগরের নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ : *অপূর্ব্ব ইতিহাস* (১৮৮৫), *নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস* (১৮৮৮), *সংস্কৃত রচনা* (১৮৯০), *শ্লোকমঞ্জরী* (১৮৯০), *ভূগোল খগোল দর্শন* (১৮৯২), *রামের রাজ্যাভিষেক* (১৯০৯), *শব্দসংগ্রহ* (১৯০১), *বাল্যবিবাহের দোষ* (১৮৫০), *ব্রজবিলাস* (১৮৮৪) ইত্যাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য *আত্মচরিত* (১৮৯০), এবং *প্রভাবতী সম্ভাষণ* (১৮৯২)। আত্মচরিতের মাত্র দুটি পরিচ্ছেদ বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। *আত্মচরিত* গ্রন্থে বিদ্যাসাগর নিজের জীবনের কথা সত্যস্পর্শী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। বিদ্যাসাগরের আর একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ *প্রভাবতী সম্ভাষণ* (১৮৯২)। প্রিয় বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাত্র চার বছরের কন্যা প্রভাবতী কলেরায় মারা গেলে বিদ্যাসাগর এই শোকোচ্ছ্বাসময় গ্রন্থ রচনা করেন। এটিই বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ—পরিধি মাত্র চার পৃষ্ঠা।

বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষার ইতিহাসে চিরকালের একটি উজ্জ্বল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই (১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই বাঙালি চিন্তাবিদ পরলোকগমন করেন। বিদ্যাসাগরের নানামাত্রিক চিন্তা বাঙালি সমাজের কাছে এখনো পথের দিশা হিসেবে কাজ করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১. সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্রের পূর্ণপাঠ বর্তমান অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্ট-১এ সংযোজিত হলো।

২. সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের আবেদনপত্রের পূর্ণপাঠ দেখুন পরিশিষ্ট-২এ।

৩. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের প্রকৃত সম্পাদক কে ছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। গ্রন্থে সম্পাদক হিসেবে কারও নাম মুদ্রিত হয়নি। অনেক গবেষকই বলেছেন সম্পাদনার কাজ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; আবার কারো মতে সম্পাদনা করেছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)। এ বিষয়ে বিশদ দেখুন—বিশ্বনাথ রায় : "অন্নদামঙ্গলের সম্পাদক মদনমোহন তর্কালঙ্কার" শীর্ষক প্রবন্ধ। দ্রষ্টব্য : নির্মল দাশ (সম্পাদক) (২০১৪)। *মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ* কলকাতা : পারুল প্রকাশনী, পৃ. ২২১- ২৩০

৪. বিদ্যাসাগর প্রেরিত পরিকল্পনার মূল পাঠ পরিশিষ্ট-৩এ সংযোজিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ‘Notes’ On The Sanscrit College’ শিরোনামে বিদ্যাসাগরের রিপোর্টটির পূর্ণপাঠ বর্তমান অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্ট-৪এ সংযোজিত হয়েছে।

৬. সংস্কৃত কলেজ সংস্কার প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা সম্পর্কে ডক্টর ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টের পূর্ণপাঠ অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্ট-৫এ দেখুন।

৭. শিক্ষা পরিষদের সচিব এফ. আই. ময়েটের কাছে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্রের পূর্ণপাঠ বর্তমান অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্ট-৬এ সংযোজিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উনিশ শতকে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান

বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাঁর সমকালীন তথা উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন। কেননা সামাজিক প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয় ব্যক্তির চিন্তাধারা, আবার কর্মোদ্যোগ ও চিন্তাধারা দ্বারাও প্রভাবিত হয় সমকালীন বা উত্তরকালীন সমাজ। সকল মানুষের জন্য একথা প্রযোজ্য না হলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক্ষেত্রে ছিলেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সমকালীন সমাজ প্রবণতা দ্বারা বিদ্যাসাগর যেমন প্রভাবিত হয়েছেন, তেমনি তিনি প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছেন সমকালীন সমাজধারাকে। বিদ্যাসাগরের সমকালীন বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার পাশাপাশি বাংলার নারীদের সামাজিক-পারিবারিক অবস্থা কেমন ছিল এবং এসব ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর কী ভূমিকা পালন করেছেন, বর্তমান অধ্যায়ে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের সমকালীন তথা উনিশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা বৈশিষ্ট্য বিরাজমান ছিল। পূর্ববর্তী সময়ের ধারাক্রমে উনিশ শতকে বাঙালির সমাজজীবনে প্রথাচল ধর্মীয় প্রবণতা ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। এসব প্রবণতার মধ্যে আছে সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান প্রথা, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদি। এসব প্রথার শৃঙ্খলে বাঙালি নারীর জীবন ছিল আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। অন্যদিকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে বাংলার সমাজজীবনেও দেখা দিয়েছিল নবজাগরণের কতিপয় ইতিবাচক প্রবণতা। দুই বিপরীতধর্মী প্রবণতার উপস্থিতিতে সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবেশও বিরাজমান ছিল। উনিশ শতকে প্রচলিত যেসব সামাজিক প্রথা ও বিধি-বিধানের সঙ্গে নারীর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিদ্যাসাগর সেসব প্রথা ও বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে তাঁর সাধনা ও শক্তিকে নিয়োজিত করেছেন। নারীর সামূহিক মুক্তিই ছিল তাঁর চিন্তা, কর্ম ও সাধনার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ এ প্রেক্ষাপটেই বিবেচ্য।

সতীদাহ প্রথা

বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই বাঙালি হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল সতীদাহ প্রথা (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ২২)। স্বামী মারা গেলে জ্বলন্ত চিতায় বিধবাকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হতো—এই বিধান হিন্দু সমাজে ধর্মীয় রীতি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবেই প্রচলিত ছিল। বিধবাকে বলা হতো—জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ হলে স্বামীর সঙ্গে অনন্তকাল সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে। বিধবা নারী কখনো স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন, কখনো-বা তাকে জোর করে চিতায় তুলে দেওয়া হতো। নব্যপন্থী হিন্দুসমাজ, বিশেষত কলকাতাকেন্দ্রিক কতিপয় আলোকিত মানুষের প্রচেষ্টায় অমানবিক এই প্রথা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয় রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) নাম। ১৮১৮ সালে লর্ড আমহার্স্টের কাছে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার আবেদন জানিয়ে রামমোহন রায় একটি ব্যক্তিগত পত্র লেখেন। ওই পত্রে তিনি সতীদাহ প্রথাকে 'সমস্ত ধর্মশাস্ত্র অনুসারে এবং সব দেশের মানুষের সহজ বুদ্ধির বিচারে নরহত্যা' বলে উল্লেখ করেছেন (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১ : ৮)। কিন্তু লর্ড আমহার্স্ট ভারতে প্রচলিত ধর্মীয় আচরণের বিরুদ্ধে কোনোকিছু করতে চাননি। তাঁর বক্তব্য থেকেই সরকারের মনোভাব বুঝা যাবে : "একটা ঘোরতর পাপাচার সম্বন্ধে আমাকে উদাসীন মনে হতে পারে এই অবাঞ্ছিত সম্ভাবনা আছে জেনেও আমি অকপটে স্বীকার করছি, আজকের দিনে এদেশীয়দের মধ্যে জ্ঞানোন্মেষের যে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে, এই অতি জঘন্য কুসংস্কারাপন্ন প্রথাটির [সতীদাহ প্রথা] ক্রমিক অবলুপ্তির জন্যে তারই উপর নির্ভর করে থাকার পরামর্শই আমার বেশী মনঃপুত" (উদ্ধৃত : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৭১ : ৮)। আমহার্স্টের পর ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক শাসনভার গ্রহণ করলে রাজা রামমোহন রায় পুনরায় সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবার সহযোদ্ধা হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন বয়ঃকনিষ্ঠ সহকর্মী দ্বারকানাথ ঠাকুরকে (১৭৯৪-১৮৪৬)।

উনিশ শতকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে শুরু হয় সামাজিক আন্দোলন। ক্রমে এই আন্দোলন দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। রাজা রামমোহন রায়ের পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টায় ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (রাজত্বকাল : ১৮২৮-১৮৩৫) আইনের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৯৮)। সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণ অনেক বিয়ে করতেন। ফলে এক ব্রাহ্মণের মৃত্যুকে অনেক নারী বিধবা হতেন। সহমরণ প্রথার কারণে অল্প বয়সী অনেক বিধবা নারীকে জোর করে স্বামীর চিতায় ঠেলে দেওয়া হতো। কেউ কেউ হয়তো স্বেচ্ছায় সহমরণের চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ত, কিন্তু অধিকাংশকেই বাধ্য করা হতো দগ্ধ হতে। এসব বিধবা নারীর অধিকাংশেরই বয়স থাকতো কম। সমাজে কুলীনদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকার কারণে অনেক শিশুও সতীদাহের শিকার হয়েছে। এক পুরুষের মৃত্যুতে শিশু থেকে মধ্যবয়সী অনেক নারীই বিধবা হতেন। অল্পবয়সী নারীরা বিধবা হবার পর কী সংখ্যায় সতীদাহের শিকার হতেন, ১৮২৩ সালের এক পরিসংখ্যান থেকে তা খানিকটা অনুধাবন করা সম্ভব (উদ্ধৃত : সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, ২০১০ : ৮) :

Dhaka University Institutional Repository

	২০ বছরের কম	২০-৪০ বছরের মধ্যে	৪০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে	৬০ বছরের বেশি	মোট
ব্রাহ্মণ	৭	৮৬	৯৭	৪৫	২৩৫
ক্ষত্রিয়	৬	১১	১১	৬	৩৪
বৈশ্য	২	৭	৩	২	১৪
শূদ্র	১৭	১০৪	১১৫	৫৬	২৯২
	৩২	২০৮	২২৬	১০৯	

হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীল সমাজপতিরা নিজেদের স্বার্থে চালু করেছিল সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার সুযোগ পাননি, কেননা ১৮২৯ সালে যখন এই প্রথা নিষিদ্ধ হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর। কিন্তু তিনি যে সহমরণ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তা তাঁর লেখা থেকে স্পষ্ট হয়।

সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। তারা বলতে থাকেন যে, ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকে সতীদাহ প্রথা চলে আসছে। এটি একটি ধর্মীয় বিধান। ভারতের দুটি প্রাচীন মহাকাব্য *মহাভারত* ও *রামায়ণ*-এ সতীদাহ প্রথার উল্লেখ আছে। ইবনে বতুতা, মার্কোপোলো, টাভার্নিয়ের—প্রমুখের ভ্রমণকাহিনিতে সতীদাহ প্রথার উল্লেখ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৬০-১১৭৮) সতীদাহ প্রথা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে চালু হয়। হিন্দু সমাজ সতীদাহ প্রথাকে তাদের পরম ধর্ম বলেই মানে ও জানে। রক্ষণশীল হিন্দুরা বলতে থাকেন যে, বিধর্মী বিদেশিরা হিন্দুর ধর্মাচরণে অবৈধ হস্তক্ষেপ করছেন। আইন পাশ করে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধর্মকর্ম ও প্রথা রহিত করার অধিকার বিধর্মী বিদেশি শাসকদের নেই। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ১৮৩০ সালের ১৭ই জানুয়ারি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ স্থাপন করে 'ধর্মসভা' নামের এক সংগঠন। ধর্মসভার সদস্যরা সংগঠন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে ১৮৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারি বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দুটি আবেদনপত্র উপস্থাপন করেন। সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত নিমাইচরণ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি দে, ভবানীচরণ মিত্র, গোকুলনাথ মল্লিক, রামগোপাল মল্লিক প্রমুখ। দুটি আবেদনপত্রের মধ্যে একটিতে কলকাতা শহরের ৬২৫ জন নেতৃস্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দু এবং ১২০ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য আবেদনপত্রে কলকাতার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জনপদের ৩৪৬ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ২৮ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর সংযুক্ত হয়। প্রথম আবেদনপত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল এরকম :

> ...for the benefit of husband's souls and for their own, the secrifice of self immolation called suttees which is not merely a secred duty but a high privilege to her who sincerely belives in the doctrines of their religion, and we humbly submit that any interference with a persuation of so high and self annihiliting a nature is not only an untrust and intolorant dictation in matters of consience, but is likely wholly to fail in precuring the end proposed. (উদ্ধৃত : J. K. Mazamder, 1973 : 156)

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ কর্তৃক উপস্থাপিত দুটি আবেদনপত্রই বড়লাট অগ্রাহ্য করে সতীদাহ নিষিদ্ধের পক্ষে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করার লক্ষ্যে স্থাপিত হয় 'ধর্মসভা'। ধর্মসভার প্রথম বৈঠক বসে ১৮৩০ সালের ১৭ই জানুয়ারি বটতলা গলিতে অবস্থিত কাশীনাথ মল্লিকের বাড়িতে। সেই সভায় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় কয়েকজকে সভার অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন হরনাথ তর্কভূষণ, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামজয় তর্কালঙ্কার, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, নাথুরাম শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিত। এই পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং এঁদের একাধিকজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষক ছিলেন। ক্রমে কলকাতার সমাজে সহমরণের পক্ষে ও বিপক্ষের শক্তির আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। সতীদাহ প্রথার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে *সমাচার চন্দ্রিকা*র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন : "আমাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শিউরে উঠছে। আমরা বিপন্ন, ভীত, বিস্মিত। এমন কি অত্যাচারী মুসলমান শাসকরাও আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেনি। ন্যায়পরায়ণ কোনো সরকারের আমলে যদি তা করা হয়, তাহলে তার চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে? মনে হচ্ছে হিন্দুধর্মের শেষ অবস্থা উপস্থিত। (উদ্ধৃত : জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ২৩)

সতীদাহ প্রথা বিলোপকারীদের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায় আর সতীদাহ প্রথার পক্ষে নেতৃত্ব দেন শোভাবাজারের রাজবাড়ির গোপীমোহন দেব ও রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৭৩-১৮৬৭)। রামমোহন ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সতীদাহ প্রথা যে ধর্মবিরোধী তা ব্যাখ্যা করেন। সমাজসংস্কার ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য ১৮৫১ সালে রামমোহন রায় স্থাপন করেন 'আত্মীয় সভা'। আত্মীয় সভার বৈঠকে যে-সব সামাজিক প্রথা ও সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা হতো, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল বাল্যবিবাহ ও বাল্যবৈধব্য। ১৮১৯ সালে আত্মীয় সভার এক বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় : "At the

Dhaka University Institutional Repository

meeting in question...the necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy, the practice of polygamy and of suffering widows to burn with the corpse of their husbands, were condemned.” (উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২৪২)। হিন্দুধর্মের কোনো গ্রন্থ বা শাস্ত্রে সতীদাহের কোনো উল্লেখ নেই। রামমোহন ও তঁর অনুসারীরা বললেন যে, সতীদাহ প্রথা একান্তই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের অপকর্ম। প্রতিক্রিয়াশীলরা বেদের ভাষ্যকে পরিবর্তন করে সতীদাহ প্রথা প্রচলন করেন। *ঋগ্বেদ*-এ মৃতের সৎকার-সম্পর্কিত একটি সূক্তের দুটি ঋকে মৃত ব্যক্তির বিধবার উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট উপদেশ দেওয়া হয়েছে। *ঋগ্বেদের* দশম মণ্ডলের ১৮ নম্বর সূক্তের ৭ ও ৮ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে :

৭. এ সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভাবনা করে, মনোমতো পতি লাভ করে অঞ্জন ও ঘৃতের সাথে গৃহে প্রবেশ করুন। এ সকল বধূ অশ্রুপাত না করে রোগে কাতর না হয়ে উত্তম-উত্তম রত্ন ধারণ করে সর্বাগ্রে গৃহে আসুন।

৮. হে নারি! সংসারের দিকে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ, সে গতাসু হয়েছে। (রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৯৭৮ : ৪৬৩)

—উপর্যুক্ত ঋকদ্বয় থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় সদ্যবিধবাকে শোক ও অশ্রুপাত থেকে নিরস্ত্র করা হচ্ছে এবং সংসারে প্রত্যাবর্তনের জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এখানে সতীদাহ বা সহমরণের কোনো কথা নেই। ৭ সংখ্যক ঋকের শেষে যে সংস্কৃত শব্দগুলো আছে, তা হলো –‘আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে’। এর বাংলা হলো–‘হে বধূগণ! প্রথমে তোমরা গৃহে প্রবেশ কর।’ ‘জোনিমগ্রে’ শব্দটি সন্ধিনিষ্পন্ন (জোণিম্+অগ্রে)। কিন্তু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা ‘অগ্রে’ শব্দের পরিবর্তে ‘অগ্নেঃ’ শব্দ স্থাপন করে সতীদাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা বলার চেষ্টা করেন (সুকোমল সেন, ১৯৯৩ : ৪৭)। প্রতারক ব্রাহ্মণরা একটি শব্দ পরিবর্তন করে যেভাবে সতীদাহ প্রথা চালু করেছিলেন, সে-সম্পর্কে ভারতবিদ ম্যাক্সমুলার লিখেছেন :

> বিবেকবর্জিত পুরোহিততন্ত্র কি করতে পারে এটা বোধ হয় তার একটা সাংঘাতিক উদাহরণ। এভাবে সহস্র সহস্র জীবনকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে এবং একটা পঙক্তির বিকৃত ও ভ্রান্ত তর্জমা এবং তার অপব্যবহার করে এবং সেটারই সঠিকতা দাবি করে একটা উন্মত্ত বিদ্রোহেরও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। (উদ্ধৃত : R. C. Dutt, 1977 : 74)

ঋগ্বেদের অপর একটি সূক্তে বিধবা বিবাহের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দশম মণ্ডলের ৪০ নম্বর সূক্তের ২ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে : “হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দিবাভাগে, কি রাত্রিকালে কোথায় গতিবিধি কর? কোথায়-বা কালযাপন কর? যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে, অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যজ্ঞস্থলে সেরূপ সমাদরের সাথে কে তোমাদের আহ্বান করে” (রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৯৭৮ :

Dhaka University Institutional Repository

৪৯৫) ? এই ঋকে স্পষ্টভাবেই স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারী স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করবে এমন কথাই বলা হয়েছে। *বেদের* কোথাও সতীদাহ প্রথার উল্লেখ নেই, বরং বিধবা নারীর সংসারে প্রত্যাবর্তন কিংবা পুনরায় বিয়ের কথাই পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর *A History of Civilization of Ancient India* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে *বেদের* বিভিন্ন ঋকে এমন সব তথ্য ও শব্দ সংযোজিত হয়েছে, যা দ্বারা তৎকালে বিধবা বিবাহের রীতি স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়। (R. C. Dutt, 1977 : 74)

বেদের বিকৃত ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা যেভাবে সতীদাহ প্রথা চালু করেছিল, উনিশ শতকে বাংলাদেশে তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে সবাই মেনে চলতো। *বেদের* আসল কথা যাতে সাধারণ মানুষ ধরতে না পারে সেজন্য প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রের বিধান দিয়ে সাধারণ মানুষকে বেদপাঠ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করে। এভাবেই তাদের হীন অমানবিক উদ্দেশ্য যুগের পর যুগ চলতে থাকে। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় সমাজ-রাজনৈতিক ব্যাখ্যাতা সুকোমল সেনের অভিমত :

> সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলদের এই চক্রান্ত সফল হয়েছিল এই কারণেই যে বেদকে পরবর্তীকালে কেবল পুরোহিততন্ত্রের একচেটিয়া সম্পত্তি হিসাবে পরিণত করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষকে বেদপাঠ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল–তাও শাস্ত্রের বিধান দিয়ে। (সুকোমল সেন, ১৯৯৩ : ৪৮)

বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ প্রথা

বিধবাবিবাহ ক্ষেত্রে সামাজিক বিধি-নিষেধ বাঙালি সমাজে দীর্ঘদিন যাবৎ একটি প্রথা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। বিধবা নারীর বিবাহ ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কৌলীন্য প্রথার দোহাই দিয়ে এক পুরুষ বহু নারীকে বিয়ে করতেন। এক পুরুষের মৃত্যুতে বহু নারী একসঙ্গে বিধবা হতেন। যেহেতু সমাজে তখন বাল্যবিবাহ প্রথা চালু ছিল, তাই এসব বিধবার অনেকের বয়স থাকতো খুব কম। বিধবা নারীরা সমাজে মানবেতর জীবন যাপন করতেন—এদের তখন আশ্রয় হতো পিতৃ বা ভ্রাতৃগৃহে। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলে সমাজে বিধবা নারীর সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামাজিক কারণে বিধবা নারীরা যেমন নানামাত্রিক বিপন্নতার শিকার হতেন, তেমনি জৈবিক তাড়নায় অনেকে লিপ্ত হয়ে পড়তেন নানা ধরনের ব্যভিচারে। এরই প্রেক্ষাপটে সতীদাহ প্রথা নিবারণের পর প্রগতিশীল চিন্তামনস্ক বাঙালি সমাজ-সংস্কারকেরা বিধবাবিবাহ আইন প্রচলনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ পৌরাণিক যুগ থেকে চলে আসছিল। একাধিক পুরাণে বিধবার বিয়ের উল্লেখ আছে, যা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১ ও ২) শীর্ষক পুস্তকদ্বয়ে বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। বিদ্যাসাগরের পূর্ব থেকেই বিধবাবিবাহ প্রচলন নিয়ে আন্দোলন চলে আসছিল। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১) নেতৃত্বে হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী এক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ১৮৩৩ সালে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়ে কলকাতায় একটি সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করে। কিন্তু রক্ষণশীলদের ভয়ে শেষ পর্যন্ত তারা সে-সভা আয়োজন থেকে বিরত থাকে। এসময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্র-পত্রিকায় বিধবাবিবাহের পক্ষে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গল দলের *জ্ঞানান্বেষণ*, *বেঙ্গল হরকরা*, *ক্যালকাটা কুরিয়ার*, *ইংলিশম্যান*, *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া*, *রিফর্মার*, *সমাচার দর্পণ*, *বেঙ্গল স্পেক্টেটর* প্রভৃতি পত্রিকা বিধবাবিবাহ প্রচলনের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মাঝেও বিধবাবিবাহ প্রচলনের দাবি উঠতে থাকে। সমাজের রক্ষণশীল পক্ষ বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে থাকলেও ইংরেজি শিক্ষিত যুবকরা বিধবা-বিবাহের পক্ষে নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। এক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্রদের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আইন প্রচলনের সংগ্রামে ডিরোজিওর ছাত্ররাই তাঁর প্রধান সহায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ২৪)। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্তের নিম্নোক্ত অভিমত :

> Trained under teachers like Derozio and D. L. Richardson, the first young men who came out from the Hindu College were fired with ambitions to reform all that was unhealthy and to reject all that was hurtful in Hindu customs and rules... it was those young Collegiate whose advanced ideas and training leavened the society in which they lived and made the sober reforms of later times possible. Men like Kashiprasad Ghosh, Ramproshad Railke, K. M. Benerjee, Prosanna Kumar Tagore were among the students of the Hindu College and the ideas which they received with their English education permitted the society in which they lived. The writings of Akshay Kumar Dutta reflected the progress infused into Hindu society through the Hindu College. The reforms affected by Iswar Chandra Vidyasagar were possible only after Hindu society had been permitted with advanced ideas through a healthy English Education. (R. C. Dutt, 1962 : 193).

Dhaka University Institutional Repository

সমকালে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলনের জন্য নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিধবাবিবাহ প্রচলন-বিষয়ক খসড়া আইন প্রস্তুত করা। খসড়া আইনসমূহ সরকারের কাছে প্রেরিত হতো। উদ্দেশ্য ছিল খসড়া আইন পেলে এই প্রথা প্রচলনের জন্য আইন প্রণয়নে সরকার কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে। দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের মনোভাব এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি সম্পর্কেও ব্রিটিশ সরকার অবহিত হতে পারবে। অনেকে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে স্বাক্ষর-সম্বলিত গণ-আবেদন প্রেরণ করেন। মুর্শিদাবাদ-নিবাসী শতাধিক হিন্দুনেতা ১৮৫৬ সালের ২১শে ফ্রেব্রুয়ারি সরকারের কাছে এমন একটি গণ-আবেদন উপস্থাপন করেন। আবেদনকারীদের মধ্যে প্রথমেই স্বাক্ষর করেন বিদ্যাসাগরের পরম সুহৃদ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)। সরকারের কাছে উপস্থাপিত গণ-আবেদনের পাঠ ছিল নিম্নরূপ (দ্রষ্টব্য : নির্মল দাশ, ২০১৪ : ১৬৪) :

To
The Hon'ble the Members of the
Legislative Council of India

The humble petition of cretain native Inhabitants of Moorshedabad

Hon'ble Sirs,

We the undersigned Hindoo residents of Moorshedabad most respectfully beg leave to state that the misaries we and our fellow Hindoos have been hitherto suffering from the pernicious custom of keeping our widows unmarried are now become intolerable. We are therefore transported with joy to observe that a draft act about the removal of the deep rooted evil has lately passed the 1st reading in your Hon'ble Council.

As the remarriage of Hindoo widows is fraught with innumerable advantages and perfectly accords with our Shastras we earnestly pray that your Hon'ble Council will be graciously pleased to carry out the measure in question.

As the interference of the Legislative in the present instance can be no infrigement of our religious rights we firmly trust that our prayer will be reading acceded to.

Moorshedabad
21st February 1856

We have the honor to be,
Hon'ble Sirs,
your most obedient servents
Pundit Modun Mohun Tarkalankar
... ...

Dhaka University Institutional Repository

ইন্ডিয়ান ল' কমিশন নামের একটি সরকারি সংস্থাও এ সময় বিধবাবিবাহ প্রচলনের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৩৭ সালে গঠিত এই কমিশনের প্রথম দিকের প্রধান কাজই হয়ে দাঁড়াল বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ বিষয়ে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা। কমিশনের সদস্যরা অনুধাবন করেছিলেন যে, বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের আইন না থাকার কারণে সমাজে ব্যভিচার ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেছে এবং তার ফলে ভ্রূণ হত্যা ও শিশু হত্যার প্রবণতাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন থেকে বিরত হয়ে যায়। ভারতবর্ষের প্রচলিত হিন্দু-ধর্মাচারে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ ঘটলে শাসনকার্যে বিঘ্ন দেখা দিতে পারে—এই আশঙ্কায় বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন থেকে তারা সাময়িক দূরে চলে যায়। (মো. আব্দুল মালেক, ১৯৯২ : ৩১-৩২)

উনিশ শতকে প্রগতিপন্থী হিন্দুরা যেমন বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করেন, বিপরীতক্রমে রক্ষণশীল হিন্দুরাও বিধবাবিবাহের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। কোনো কোনো রক্ষণশীল পণ্ডিত মানবিক কারণে বিধবাবিবাহ সমর্থন করলেও, সমাজচ্যুত হবার ভয়ে প্রকাশ্যে তা প্রকাশ করতে চাননি। কেউ আবার চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছেন। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের তৃতীয় অনুজ শম্ভুচন্দ্রের বিশদ বিবরণ ঋষি দাস জানাচ্ছেন এভাবে, "পটলডাঙ্গা-নিবাসী শ্যামাচরণ দাস কর্মকার তাঁর নিজের বাল্যবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের জন্যে পণ্ডিতদের কাছ থেকে একটি ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। এই ব্যবস্থাপত্রে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্ক সিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ স্মার্ত পণ্ডিতদের সই ছিল। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ এই ব্যবস্থাপত্রটি স্বহস্তে রচনা করেছিলেন। কিছুদিন পরে যখন এই ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে বিচারসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনে তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন এবং তর্কে জয়ী হয়ে একজোড়া শাল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু পরে এঁরাই বিধবাবিবাহের ব্যাপারে সর্বাধিক বিরোধিতা করেছিলেন। শ্যামচরণ দাস কর্মকার পণ্ডিতদের এই মত-পরিবর্তন দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রও বিধবাবিবাহ সম্পর্কে পণ্ডিতদের নিয়ে বিচার করান। পণ্ডিতরা বিধবাবিবাহ 'শাস্ত্রসম্মত সর্বজনহিতকর' বলে স্বীকার করলেও প্রকাশ্যে তাঁদের এই মত ব্যক্ত করতে চাইলেন না। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় লিখেছেন, "তাঁহাদের প্রধান ভয় হইল যে, তাঁহারা এই মত ব্যক্ত করিলে, সাধারণে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রহিত করিবেন। কেহ কেহ বলিলেন, 'যদি আমাদিগকে অন্যের দ্বারে যাইতে না হয়, জীবিকানির্বাহের এরূপ সংস্থান করিয়া দিতে পারেন, তবে মুক্তকণ্ঠে আমাদিগের মত প্রচারিত করিতে পারি।' শ্রীশচন্দ্র তাঁদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নি, তাই বিধবাবিবাহের প্রতি পণ্ডিতদের প্রকাশ্য সমর্থন আর প্রচারিত হয়নি।" (ঋষি দাস, ১৯৭১ : ৫১)

সতীদাহ প্রথার পক্ষ-বিপক্ষীয়দের মতো বিধবাবিবাহের সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যেও শুরু হয় ব্যাপক বাদানুবাদ। কলকাতাকেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকাগুলোও এ বিষয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে। যুগের দাবিকে মূর্ত ও প্রত্যক্ষ করে তোলবার জন্য তখন এমন এক যুগপুরুষের প্রয়োজন ছিল, যিনি পাণ্ডিত্যে হবেন অসাধারণ, পৌরুষে ও মানবিকতায় হবেন অদ্বিতীয়, যাঁকে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ শঙ্কিত বা দমিত করতে পারবে না। এমনি একজন সিংহ-পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার আন্দোলনের মতো বিধবাবিবাহ চালু করার সংগ্রামেও তিনি হয়ে উঠলেন প্রধান সেনানী। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হলে বিধবাবিবাহ আন্দোলন বিশৃঙ্খল এবং সাময়িক স্তিমিত হয়ে পড়ে। উত্তরকালে তাঁরই শূন্যস্থান যোগ্য সাধনায় যিনি পূরণ করলেন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিধবাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগর প্রকাশ্যে কথা বলা আরম্ভ করলেন, রচনা করলেন একের পর এক নিবন্ধ ও গ্রন্থ। তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ও কর্মকাণ্ডে তুমুল ঝড় ওঠে বাংলার সমাজ-সংগঠনে। বিদ্যাসাগরের মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে লিখিত অভিমত প্রকাশ করলেন শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব। উভয় পক্ষের তীব্র বাদানুবাদের মধ্যেই ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই ব্রিটিশ সরকার 'বিধবাবিবাহ আইন' পাশ করে। আইন পাশ হলো বটে, কিন্তু সমাজজীবনে তা বাস্তবায়ন অত সহজ হলো না। সমাজের উচ্চবর্ণ এবং সমাজপতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিধবার বিয়ে দেওয়া কিংবা বিধবাকে বিয়ে করা—কোনটাই সহজ ছিল না। যে ব্যক্তিই বিধবাবিবাহের পক্ষে সায় দিত, তাকে সমাজপতিদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকার হতে হতো। যে যুবক বিধবাকে বিয়ে করতে চাইত কিংবা বিধবা নারীটি যে পরিবারের, সমাজপতিরা তাদের একঘরে করে রাখত। বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবা নারী ভবসুন্দরীকে বিয়ে করলে বিদ্যাসাগরের পরিবারও এমন পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য অনুজ শম্ভুচন্দ্রের কাছে লেখা বিদ্যাসাগরের এই পত্রাংশ :

> ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবা বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনমতেই উচিত কর্ম্ম হইত না। আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্তক। আমরা উদযোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ...নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে।... সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমার অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। (দ্রষ্টব্য : সফিউদ্দিন আহমদ, ২০০৮ : ১০১-০৭)

যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলে কলকাতায় রক্ষণশীল হিন্দুদের উদ্যোগে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি হয়। সতীদাহ প্রথার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির মধ্যে দেখা দেয় প্রবল বিরোধ। ব্যক্ত হয়েছে যে, ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন, তখন বিদ্যাসাগরের বয়স মাত্র নয় বছর। কিন্তু উত্তরকালে এই আন্দোলন যখন প্রবলতর হয়ে ওঠে, তখন বিদ্যাসাগর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহের পক্ষে লেখনির মাধ্যমে প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ ও রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-বিষয়ক দু'খানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকদ্বয় হলো—*বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৫) এবং *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব–দ্বিতীয় পুস্তক* (১৮৫৫)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিধবাবিবাহের পক্ষে কথা বলার অর্থই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। কেননা বিধবার দাহ হলে তারতো বিয়ের প্রশ্নই আসে না। বিধবাবিবাহের পক্ষে গ্রন্থ রচনার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বিদ্যাসাগর লেখেন :

> বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সর্বাগ্রে এই বিবেচনা করা আবশ্যক যে এদেশে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই; সুতরাং, বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রবর্তিত করিতে হইবেক। কিন্তু, বিধবাবিবাহ যদি কর্তব্য কর্ম না হয়, তাহা হইলে কোনও ক্রমে প্রবর্তিত ও প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ, কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব, বিধবাবিবাহ কর্তব্য কর্ম কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৬৯৫-৯৬)

বেদ, *স্মৃতিশাস্ত্র*, *মনুসংহিতা*, *পরাশরসংহিতা*, *নারদসংহিতা*, *মহাভারত*, *স্কন্দপুরাণ*, *আদিত্যপুরাণ*—ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর সহমরণ নয়, বরং বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা প্রমাণ করেন। *নারদসংহিতায়* তিনি পেলেন এই তথ্য :

> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ॥
> অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণীপ্রোষিতং পতিম্।
> অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোহন্যং সমাশ্রয়েৎ ॥

ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদ প্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসেৎ ॥
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিতযোষিতাম্।
জীবতি শ্রূয়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ ॥
অপ্রবৃত্তৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোহন্যগমনে স্ত্রীণামেষ দোষো ন বিদ্যতে ॥

—অর্থাৎ, স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর, তৎপরে বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রীয়জাতীয়া স্ত্রী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে তিন বৎসর। বৈশ্য-জাতীয়া স্ত্রীর প্রতীক্ষার কাল নিয়ম নাই। অনুদ্দেশ হইলেও, যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত কাল নিয়ম। প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মত। অতএব, এমন স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা দোষাবহ নহে। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ৭১৩-১৪)

এভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্র থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি চয়ন করে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের সমর্থনে তাঁর অভিমত তুলে ধরেন। দীর্ঘ আলোচনার পর *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব-দ্বিতীয় পুস্তক*-এর উপসংহারে বিদ্যাসাগর লেখেন : "দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ! আপনারা, অন্ততঃ কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস হইয়া, শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগেক যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করা এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রুণহত্যাপাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত; অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত। এ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃকল্প, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ৮৩৪)। বিধবাবিবাহের পক্ষে নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কৌশল হিসেবে পাঠকবর্গের কাছে বিদ্যাসাগর দায়িত্ব অর্পণ করেন। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন পাঠকবৃন্দই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়। বিদ্যাসাগর নারীর দুঃখে বেদনার্ত হয়েছেন। এবার সেই যন্ত্রণাদগ্ধ বিপন্ন নারীদের সঙ্গেই যেন বিদ্যাসাগর কথা বলে বই শেষ করেছেন এভাবে :

Dhaka University Institutional Repository

> তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ৮৩৯)

বিধবাবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হলে সতীদাহ প্রথার পক্ষাবলম্বনকারীরা বিদ্যাসাগরের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইতঃপূর্বে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে রাজা রামমোহন রায়ের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিবরণ : “সে সময়ে ধর্মসভা প্রবল ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অতি সংকট কাল ছিল। কেহ বলিতেন ব্রাহ্মসমাজ জ্বালাইয়া দিবেন, কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্যভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর নাই থাকুক। যেমন গঙ্গার বা জগন্নাথের যাত্রীরা দূর হইতে পদব্রজে আইসে, তেমনি তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত একত্র হইয়া মাণিকতলা হইতে পদব্রজে এই সমাজে আসিতেন” (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৪৭ : ১৪-১৫)। বিধবাবিবাহের পক্ষে গ্রন্থ রচনার জন্য বিদ্যাসাগরেরও প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। কলকাতায় ব্যাপকভাবে বিদ্যাসাগরের প্রাণনাশ প্রচেষ্টার কথা ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর কাছে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠি থেকে প্রসঙ্গটি জানা যায়। রাজনারায়ণের কাছে চিঠিতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

> মোদিনীপুর হইতে আগত হরিশচন্দ্রের প্রমুখের মাধ্যমে অবগত হইলাম আমার প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা করিয়া আপনারা অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াছেন এবং সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছেন। এ বিষয়ে সেখানে যে রূপ জনরব শুনিয়াছেন এখানেও সেরূপ জনরব প্রথম প্রথম উঠিয়াছিল। এবং তদনুসারে আমাকে সকলে সাবধান থাকিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করাতে আমিও সাবধানে আছি। ফলতঃ সে সকল অলীক কথা। যাহা হউক সাবধানে থাকিলে কোন হানি নাই; এই বিবেচনায় আমি সাবধানে আছি। তদর্থে আপনারা উৎকণ্ঠিত হইবেন না। এরূপ সংবাদ শুনিলে যথার্থ বন্ধুর যাহা কর্তব্য তাহা আপনারা করিয়াছেন। বড়বাবু, বিধিনাথবাবু, গোবর্দ্ধনবাবু, নবগোপালবাবু ও শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ ঘোষ প্রভৃতি আত্মীয় মহাশয়দিগকে এই সংবাদ দিয়ে নিরুদ্বেগ করিবেন—কহিবেন, আমি এ পর্যন্ত জীবিত আছি...। (দ্রষ্টব্য : খন্দকার রেজাউল করিম, ২০১৬ : ১৩০)

Dhaka University Institutional Repository

বিধবাদের বিয়ে প্রচলনের সংগ্রামে বিদ্যাসাগর কখনো সহযোগিতা, আবার কখনো প্রবল বিরোধিতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। যে-কোনো সময় চরম অঘটনের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকতেন। পিতা ঠাকুরদাস পুত্রের জীবন আশঙ্কায় ভীত হয়ে তাঁকে সর্বক্ষণ পাহারা দেবার জন্য বীরসিংহ গ্রাম থেকে শ্রীমন্ত নামের এক জেলেকে কলিকাতায় পাঠিয়েছিলেন। এই শ্রীমন্তই ছিল একটা পর্বে বিদ্যাসাগরের নিত্যসঙ্গী (খন্দকার রেজাউল করিম, ২০১৬ : ৭২)। অবশ্য অকুতোভয় বিদ্যাসাগর কোনো কিছুই পরোয়া করতেন না—আপন সাহস ও সততার জোরে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতেন। বস্তুত, সাহস আর সততাই ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় *হিতবাদী* পত্রিকায় লেখা ডাক্তার অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের এই বিবরণ : "বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারদিক হইতে লোক আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিত, কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত, কেহ কেহ প্রহার করিবার এমনকি মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইত। বিদ্যাসাগর এ সকলে ভ্রুক্ষেপও করিতেন না। একদিন শুনিলেন, মারিবার চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে মারিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। দুর্বৃত্তরা প্রভুর আজ্ঞা পালনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। বিদ্যাসাগর কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না। যেখানে বড় মানুষ মহোদয় মন্ত্রিবর্গ ও পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া প্রহরী-রক্ষিত অট্টালিকায় বিদ্যাসাগরের ভবিষ্যৎ প্রহারের কাল্পনিক সুখ উপভোগ করিতেছিলেন বিদ্যাসাগর একেবারে সেইখানে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেই অপ্রস্তুত ও নির্বাক হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ গত হইলে, একজন পারিষদ বিদ্যাসাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, লোক পরম্পরায় শুনিলাম, আমাকে মারিবার জন্য আপনাদের লোকেরা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্ধানে ফিরিতেছে ও খুঁজিতেছে। তাই আমি ভাবিলাম, তাহাদিগকে, কষ্ট দিবার আবশ্যক কি, আমি নিজেই যাই। এখন আপনাদের সিদ্ধ করুন। ইহা অপেক্ষা উত্তম অবসর আর পাইবেন না। লজ্জায় সকলে মস্তক অবনত করিলেন।" (উদ্ধৃত : খন্দকার রেজাউল করিম, ২০১৬ : ৭২)

বিধবাবিবাহ চালু করার সংগ্রামে বিদ্যাসাগর সমকালীন বাংলাদেশের অনেকের সহযোগিতা পেয়েছিলেন, বিধবার বিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সাহায্য ও প্রতিশ্রুতির আশ্বাস। কেউ কেউ বিদ্যাসাগরকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, আবার কেউ-বা রক্ষা করেননি প্রতিশ্রুতি। ফলে মাঝে-মধ্যে বিদ্যাসাগর হতোদ্যম হয়ে পড়তেন। এমনি অসহায় মনের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে অনুজ শম্ভুচন্দ্রের কাছে লেখা বিদ্যাসাগরের এক চিঠিতে। সেই চিঠির নিম্নোক্ত অংশ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায় : "...আমি এত ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ... আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে

Dhaka University Institutional Repository

যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিধবাবিবাহ আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনেপ্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য দূরে থাকুক কেহ ভুলিয়াও এ বিষয়ে সংবাদ লয়েন না।" (দ্রষ্টব্য : সফিউদ্দিন আহমদ, ২০০৮ : ১০৭)

বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় আইনের আবশ্যকতা বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন। তাই একদিকে যখন তিনি ধর্মগ্রন্থ ও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ মন্থন করে বিধবাবিবাহের পক্ষে তাঁর যুক্তিসমূহ তুলে ধরেছিলেন, অন্যদিকে তখন বিধবাবিবাহ আইন পাশের জন্য আবেদনপত্র রচনা করে স্বাক্ষর সংগ্রহের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একশত পঁয়ষট্টি বছর পূর্বে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে গণতান্ত্রিক উপায়ে বিধবাবিবাহ আইন পাশের ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। সমাজের নানা শ্রেণির ও পেশার ৯৮৭ জন মানুষের স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বিদ্যাসাগর ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করেন। সেই আবেদনপত্রের বিষয় ও সংলগ্ন পত্রখানি ছিল নিম্নরূপ :

To
W. Morgan, Esquire,
Clerk to the Honorable the
Legislative Council of India

Sir,
On behalf of the petitioners, I have the honor to forward herewith the petition of certain Hindoo Inhabitants of the province of Bengal which I beg to request you will do me the favour to lay before the Honorable Council at their next sitting.

I have the honor to be
sir,
your most obedient Servant
sd/- Eshwur Chandra Sharma

Calcutta
Sanscrit College
the 4th October, 1855

আবেদনপত্রে বিষয়টি এইভাবে পেশ করা হয় :

'বাংলাদেশের নিম্নস্বাক্ষরকারী হিন্দুদের নিবেদন এই যে, বহুদিন থেকে প্রচলিত দেশাচার অনুসারে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে রয়েছে। আবেদনকারীদের মত এবং দৃঢ়বিশ্বাস এই যে এই দেশাচার শাস্ত্রসংগত নয়। এই নীতিবিরুদ্ধ দেশাচার নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক এবং সমাজের বহু অকল্যাণের কারণ।

হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন আছে। অনেক হিন্দুকন্যা চলতে ও কথা বলতে শেখবার আগেই বিধবা হয়। এতে সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট হয়।

আবেদনকারীরা ও অন্যান্য হিন্দুরা বিধবাবিবাহকে বিবেকবিরুদ্ধ বলে মনে করেন না। সামাজিক অভ্যাসের জন্য অথবা ধর্মের কদর্থের জন্য, এই বিবাহপ্রথা প্রচলনে কোনো বাধাবিঘ্ন হলে তাঁরা তা অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত আছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও মহারানীর বিচারালয়ে বর্তমানে হিন্দু দায়ভাগের যে রকম ব্যাখ্যা করা হয় তাতে বিধবাবিবাহ অসিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে, এবং বিধবার বিবাহজাত সন্তান অবৈধ বলে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

যে হিন্দুরা বিধবাবিবাহকে বিবেকবিরুদ্ধ বলে বিবেচনা করেন না, এবং ধর্মের ও সামাজিক কুসংস্কারের বাধা উপেক্ষা করেও যাঁরা বিধবাবিবাহ করতে প্রস্তুত, হিন্দু দায়ভাগের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা তাঁদের কর্তব্যের পথে বাধার সৃষ্টি করছে।

আবেদনকারীরা মনে করেন, শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যার জন্য যে সামাজিক বাধা প্রবল আকার ধারণ করেছে, ব্যবস্থাপক সভার কর্তব্য তা অপসারণ করা। বিধবাবিবাহের আইনঘটিত বাধা দূর করা বহুসংখ্যক নিষ্ঠাবান স্বধর্মপরায়ণ হিন্দুর একান্ত ইচ্ছা। যাঁরা বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে মনে করেন, তার জন্য যাঁদের সংস্কারে আঘাত লাগতে পারে এবং যাঁরা সামাজিক মঙ্গলচিন্তার বশবর্তী হয়ে তার বিরুদ্ধতা করেন, বিধবাবিবাহের আইনঘটিত বাধা দূর হলে তাঁদের কোনো ক্ষতি হবে না। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে, অন্য কোনো জাতির মধ্যে, বিধবাবিবাহ এরকম কোনো আইনের বলে নিষিদ্ধ আছে বলে আমরা জানি না। এই প্রথা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ বলেও বোধ হয় না।

এইসব কারণে আবেদনকারীদের প্রার্থনা এই যে, ব্যবস্থাপক সভা যত শীঘ্র সম্ভব বিধবাবিবাহের বৈধতা স্বীকার করে এক আইন প্রণয়ন ও প্রচার করেন, যাতে হিন্দুদের বিধবা-বিবাহের সর্বপ্রকারের বাধা দূর হয় এবং বিবাহজাত সন্তানেরা সমাজে বৈধ সন্তান বলে গৃহীত হয়।' (উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২৫৫-৫৬)

কোনো বাধা কিংবা অসহায়তা বিদ্যাসাগরকে দমাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তিনি সফলকাম হলেন। অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়, যে-আইনের ষষ্ঠ ধারায় বলা হয় :

> Whatever words spoken, ceremonies performed or engagements made on the marriage of a Hindoo female who has not been previously married, are sufficient to constitute a valid marriage, shall have the same effect, if spoken performed or made on the marriage of a Hindoo widow; and no marriage shall be declared invalied on the ground that such words, ceremonies of engagements are inapplicable to the case of a widow. (উদ্ধৃত : খন্দকার রেজাউল করিম, ২০১৬ : ৭১)

বিধবাবিবাহ আইন পাশ হলে বিদ্যাসাগর স্ব-উদ্যোগে অনেক বিধবা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বিধবাবিবাহ আইন পাশ ও বিধবা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করা বিদ্যাসাগরের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

নিজের পুত্রের সঙ্গে তিনি যেমন বিধবা নারীর বিয়ের সম্মতি দেন, তেমনি বাংলাদেশের অসহায় অনেক বিধবা নারীকে তিনি বিয়ে দিয়েছেন। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৭—এই ১১ বছরে বিদ্যাসাগর ৬০ জন বিধবা নারীকে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এসব বিয়েতে তাঁর মোট ব্যয় হয়েছিল ৮২ হাজার টাকা। ঋণ করে তিনি এই অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এই ঋণের কথা জানতে পেরে *হিন্দু-পেট্রিয়ট* পত্রিকার সম্পাদক ও অপর কয়েকজন ব্যক্তি বিধবাবিবাহ তহবিল গঠনের অভিপ্রায়ে *হিন্দু-পেট্রিয়ট* পত্রিকায় (মতান্তরে *এডুকেশন গেজেট*) অর্থ সাহায্যের জন্য একটি আবেদন প্রচার করেন। বিদ্যাসাগর এই আবেদনের কথা জানতে পেরে পত্রিকার সম্পাদককে ১৮৬৭ সালের ২৬শে জুন একটি চিঠি লেখেন। উক্ত আবেদন প্রচার না করার জন্য চিঠির শেষে তিনি লেখেন : "আমি যাহা ঋণ করিয়াছি তাহা শোধ করিবার জন্য সাধারণ সমীপে আবেদন করিবার ইচ্ছা আমার লেশমাত্রও নাই।...তাই আমি উক্ত প্রচারিত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছি। এবং যে সকল ভদ্রলোক এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সড়িয়া দাঁড়াইতে অনুরোধ করিতেছি" (রাধারমণ মিত্র, ১৯৯৪ : ৩৪১)। বিধবাবিবাহ আইন পাশ এবং বিধবা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করাকে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজ বল মনে করতেন। অনুজ শম্ভুচন্দ্রের কাছে লেখা এক চিঠিতে সেকথাই বিদ্যাসাগর অকপটে তুলে ধরেছেন এভাবে :

> বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। (উদ্ধৃত : সফিউদ্দিন আহমদ, ২০০৮ : ১০৬)

কৌলীন্য প্রথা

কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথা উনিশ শতকের বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বল্লাল সেনের সময় থেকেই বাংলায় কৌলীন্য প্রথার দাপট চলে আসছে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কৌলীন্যপ্রথায় বাংলার কত শত-সহস্র নারীর জীবন যে বিপন্ন হয়েছে, ইতিহাসে তার কোনো হিসেব নেই। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের যুগেও কোনো কোনো কুলীন পুরুষের শতাধিক বিয়ের খবর জানা যায়। ব্রাহ্মণ ও রক্ষণশীল হিন্দু নেতৃবর্গ প্রচার করেছিল যে, সকলে নয় সমাজের কেউ কেউ কুলীন—তারা ইচ্ছামতো বিয়ে করতে পারবে। কৌলীন্য প্রথার এই সুযোগেই কুলীন পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করত। এমনও দেখা যেত যে, বিবাহিত পুরুষটি তার স্ত্রীদের নাম-ঠিকমতো মনে রাখতে পারতেন না। একারণে স্ত্রীদের নাম-ঠিকানা তারা খাতায় লিখে রাখতেন। স্বামী পুরুষটি মারা গেলে একাধিক নারী বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করতেন। কৌলীন্যপ্রথার সময়ে নারীদের দুর্গতির পরিচয় দিতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন : "স্বামী মহাপুরুষটির সঙ্গে

স্ত্রীদের কারো জীবনে একবার বিয়ের সময় দেখ হত, কারো জীবদ্দশায় কয়েকবার, কারো বছরে একবার, কারো বছরে কয়েকবার দেখা হত। দেখা হলে স্বামীটিকে উপঢৌকন সমেত আপ্যায়নে ক্রুটি রাখা চলত না" (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ২৫)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় রাজা রামমোহন রায়ের ভাষ্য : "...ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীর দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন" (রাজা রামমোহন রায়, ১৯৮৭ : ২০২)। বহুবিবাহকারী কুলীন পুরুষের স্ত্রীরা কেবল যে পিতৃগৃহেই থাকত তা নয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে মেয়ের বরকে বাড়ি আনতে হলে পিতা-মাতাকে টাকা দিতে হতো, তা না হলে জামাই শ্বশুরবাড়িতে যেত না। বিদ্যাসাগর এরকম এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি শ্বশুরবাড়িতে যান কি না। তিনি সহাস্যবদনে উত্তর দিয়েছিলেন—যেখানে ভিজিট পাই, সেখানে যাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজা বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কৌলীন্য প্রথার কারণে বাংলার নারীদের নানামাত্রিক যন্ত্রণা, বঞ্চনা ও বিপন্নতার শিকার হতে হয়েছে। বল্লাল সেন যেসব ব্রাহ্মণকে কুলীন বলে শনাক্ত করেছিলেন, কালক্রমে তাদের নানামাত্রিক পতন ঘটে। তাই তাদের আর কুলীন বলার যৌক্তিক কারণ নেই—এমনই অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিদ্যাসাগর। তিনি লিখেছেন : "...বহুকাল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্যমর্যাদা লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কৌলীন্যের নিয়মানুসারে, কুলীন বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন, ইদানীং ঈদৃশ ব্যক্তিই অপ্রাপ্য ও প্রসিদ্ধ। অতএব, যখন কুলীনের একান্ত অসম্ভাব ঘটিয়েছে, তখন, বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইলে, কুলীনদিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ ঘটিবেক, এই আপত্তি কোনও মতে, ন্যায়োপেত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতে পারে না।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ৮৬০)

নারীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সর্বজনবিদিত। নারীর প্রতি সহমর্মিতাবোধ থেকেই তিনি কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। কৌলীন্যপ্রথার দোহাই দিয়ে কুলীন ব্রাহ্মণরা একের পর এক বিয়ে করতেন। অথচ স্ত্রীর প্রতি যথোচিত দায়িত্ব পালন করতেন না। পিতা-মাতারাও কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য অতি উৎসাহী কিংবা অন্ধ হয়ে যেতেন। প্রসঙ্গত স্মরণে আসে বিদ্যাসাগরের অভিমত : "...এতদ্দেশে পিতা-মাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্যমর্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্তবিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালে কন্যার ভাবি সুখ-দুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৮৬০)। এই কৌলীন্যপ্রথার কারণে নারীর জীবনে কী

অশেষ দুর্গতি নেমে এসেছিল, তার প্রমাণ হিসেবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৮৫০) *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) উপন্যাসের 'বল্লালী বালাই' অংশের ইন্দির ঠাকরুনের কথা বলা যায়। ভিন্ন একটি বিষয়ের কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কুলীন ব্রাহ্মণের অভাবে কুলীন বংশের অনেক কুমারী নারীর কখনো বিয়ে হতো না। ফলে অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃ বা ভ্রাতৃগৃহে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে হতো। নারীমুক্তির অন্যতম উপায় হিসেবে বিদ্যাসাগর কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। কেবল অবস্থান নেওয়াই নয়, নারী-জাগরণের জন্য কৌলীন্য প্রথার অসারতা প্রমাণে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিদ্যাসাগরের *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার* গ্রন্থটি অতি উচ্চ গবেষণার ফল। বিবিধ শাস্ত্র এবং সামাজিক ইতিহাস মন্থন করে বিদ্যাসাগর কৌলীন্য প্রথার অসারতা প্রমাণ করেন এবং এই অমানবিক ও নারী জাতির জন্য অবমাননাকর প্রথার চির-অবসান কামনা করেন। কুলীন ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের উদ্দেশ্য করে বিদ্যাসাগর লেখেন :

> এক্ষণে, কুলীনদিগের মধ্যে যে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন তন্নিবারণের আর সদুপায় নাই। যদি তাঁহারা সুবোধ, ধর্মভীরু ও আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, অকিঞ্চিৎকর কুলাভিমান বিসর্জন দিয়া, কুলীননামের কলঙ্ক বিমোচন করুন। আর, যদি তাহারা কুলাভিমান পরিত্যাগ নিতান্ত অসাধ্য বা একান্ত অবিধেয় বোধ করেন, তবে তাঁহাদের পক্ষে কোনও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। এ অবস্থায়, বোধ হয়, পুনরায় সর্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিত্রাণের পথ নাই। এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের অকারণে একাধিক বিবাহের আবশ্যকতা থাকিবেক না; কোনও কুলীন-কন্যাকে, যাবজ্জীবন বা দীর্ঘ কাল অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নরকগামী করিতে হইবেক না; এবং রাজনিয়ম দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইলে, কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা ঘটিবেক না। এ বিষয়ে কুলীনদিগের ও কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের যত্ন ও মনোযোগ করা কর্তব্য। অনিষ্টকর, অধর্মকর কুলাভিমানের রক্ষাবিষয়ে, অন্ধ ও অবোধের ন্যায়, সহায়তা করা অপেক্ষা, যে সকল দোষবশতঃ কুলীনদিগের ধর্মলোপ ও যার পর নাই অনিষ্ট-সংঘটন হইতেছে, সেই সমস্ত দোষের সংশোধন-পক্ষে যত্নবান্ হইলে, কুলীনপক্ষপাতী মহাশয়দিগের বুদ্ধি, বিবেচনা ও ধর্মের অনুযায়ী কর্ম করা ইহবেক। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ৮৬২-৬৩)

বহুবিবাহ প্রথা

প্রচলিত কৌলীন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে শত শত বছর ধরে বাংলার সমাজে চলে এসেছে বহুবিবাহের প্রবণতা। কৌলীন্যের দোহাই দিয়ে এক পুরুষের অনেক বিয়ে করার বিষয়টি উনিশ শতকে সামাজিক আচারে পরিণত হয়েছিল (মো. আব্দুল মালেক, ১৯৯২ : ৩২)। বহুবিবাহ প্রথা সমাজদেহে কীভাবে একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল নিচের তথ্য থেকে তা কিছুটা উপলব্ধি করা যাবে। ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় *ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবজার্ভার* পত্রিকায় কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের নিম্নোক্ত তথ্য প্রকাশিত হয় :

Dhaka University Institutional Repository

ব্রজ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	বিবাহ সংখ্যা ৪৩
কালী ঠাকুর	—	বিবাহ সংখ্যা ৬০
শ্রীধর চ্যাটার্জি	—	বিবাহ সংখ্যা ৬০
রামলোচন শর্মা	—	বিবাহ সংখ্যা ১০০
রামলোচন তর্কবাগীশ	—	বিবাহ সংখ্যা ৬০

(উদ্ধৃত : জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ২৬)[১]

বহুবিবাহ প্রথা নিরসনের জন্য উনিশ শতকে বাংলার সমাজে নানামাত্রিক আন্দোলন দেখা দেয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা কিংবা বহুবিবাহ প্রবণতা—চারটি বিষয়ই পরস্পর সম্পর্কিত। *ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবজার্ভার* পত্রিকার মতো *জ্ঞানান্বেষণ*ও প্রথম থেকেই বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করতে থাকে। *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকা একাধিক বিবাহকারী পুরুষের নাম, ঠিকানা এবং তিনি কতগুলো বিয়ে করেছেন এরকম সাতাশ জন ব্রাহ্মণ কুলীনের নাম ও বিয়ের সংখ্যা প্রকাশ করে। উনিশ শতকে তিরিশের দশক থেকে সাময়িকপত্রগুলো বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—এ প্রশ্নে তুমুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত পত্রিকাদ্বয়ের পাশাপাশি *সমাচার দর্পণ*, *সমাচার চন্দ্রিকা*, *সংবাদ প্রভাকর*—এসব পত্রিকার নাম উল্লেখ করা যায়। হিন্দু কলেজ এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'হিন্দু ফিলাডেলফিক সোসাইটি' নামের একটি সংগঠন। এই সংগঠনের উদ্যোগে ছাত্ররা বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৪৩ সালের জুলাই মাসে হিন্দু ফিলাডেলফিক সোসাইটির এক সভায় লাডলিমোহন দত্ত বহুবিবাহ রোধ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে লাডলিমোহন বহুবিবাহ প্রথার অশাস্ত্রীয় ও অমানবিকতার কথা উল্লেখ করে এই প্রথা রদের জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ২৭)। হিন্দু কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বহুবিবাহ প্রথা রদ করার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

বহুবিবাহ প্রথা রদ করার জন্য প্রগতিপন্থী হিন্দুরা সংঘবদ্ধভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকেন। এই প্রথা বন্ধ করার জন্য কলকাতার সচেতন ব্যক্তিবর্গ ১৮৫৪ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। কলকাতার সাধারণ মানুষও বহুবিবাহ প্রথা রদের দাবিতে একত্র হতে থাকেন। ১৮৫৫ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমিতির কাছে বহুবিবাহ প্রথা রদ করার ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানায়। ১৮৫৫ সালের মার্চ মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'বহুবিবাহ রদ হওয়া উচিত'-বিষয়ক একটি আইনের খসড়া প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করেন। রাজা দেবনারায়ণ সিংহের

উদ্যোগের কলকাতার বিখ্যাত আইনবিদদের সহযোগিতায় বহুবিবাহনিষেধক একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করা হয় (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ৮৯৫-৯৭)।[২] রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ও আইনবিদ মি. গ্রান্টের সহযোগিতায় একটি বিলের খসড়া তৈরি করেন। গ্রান্টও আশা করেন তিনি খুব তাড়াতাড়ি বহুবিবাহ রদ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে সমর্থ হবেন। এ সময় কলকাতায় 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' নামের একটি সংগঠন বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন সংগঠিত করে।

বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে যেমন জনমত সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি এই প্রথার পক্ষেও অনেকে নানা প্রচারণায় লিপ্ত হয়। কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে বহুবিবাহের বিরুদ্ধপক্ষ যখন সরকারের কাছে আবেদন করেন, তখন রক্ষণশীল হিন্দুরা তড়িঘড়ি করে এই প্রথা রদ না করার জন্য সরকারের কাছে পাল্টা আবেদন জানায়। কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ১৬৩৮ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে পাঠানো হয়। উভয় পক্ষের বাদানুবাদে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি সমাজ তখন আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সীপাহি বিদ্রোহ শুরু হলে বহুবিবাহ প্রথা রদ-বিষয়ক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। সীপাহি বিদ্রোহের ছয় বছর পর বহুবিবাহ রদ-বিষয়ক আন্দোলন পুনরায় শক্তিশালী হতে থাকে। পক্ষ ও বিপক্ষ—উভয় দলই পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের জন্য ১৮৬৩ সালে প্রগতিপন্থী হিন্দুরা সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করে। ১৮৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা বহুবিবাহ প্রথা বজায় রাখার পক্ষে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সহযোগে একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে উপস্থাপন করে। ফেব্রুয়ারি মাসেই এই প্রথার বিরোধী পক্ষ নানা যুক্তি উপস্থাপন করে সরকারের কাছে পুনরায় আর একটি আবেদনপত্র পেশ করে।

বহুবিবাহ প্রথার পক্ষ এবং বিপক্ষ শক্তির নানামাত্রিক কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার এ বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়নে উৎসাহী হয়নি। সীপাহি বিদ্রোহের ধাক্কায় ব্রিটিশ সরকার তখন ছিল বিপন্ন। অন্যদিকে তারা মনে করেছে, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য আইন পাশ করার ফলেই সীপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। সে-কারণে তারা বাংলা তথা ভারতের প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার মতো আর কোনো নতুন আইন প্রণয়নে আগ্রহী হয়নি। (মো. আব্দুল মালেক, ১৯৯২ : ৩৩)

বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের আন্দোলন কেবল কলকাতা শহর নয়, সমগ্র বাংলাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পালন করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের জন্য বিদ্যাসাগর বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন, এ বিষয়ে নিজস্ব যুক্তি তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। ১৮৫৫ সালের মার্চ মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্তৃক বহুবিবাহ রদ-বিষয়ক খসড়া আইনের প্রস্তাব সরকারের কাছে উপস্থাপনের আট মাস পরেই ১৮৫৫-র ২৭শে ডিসেম্বর বহুবিবাহ প্রথা রদ করার জন্য সরকারের কাছে বিদ্যাসাগর আবেদন করেন। বহুবিবাহের কুফল এবং অপকারিতা বিশদ ব্যাখ্যা করে বিদ্যাসাগর দু'খানি গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থদ্বয় হচ্ছে—*বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার* (১৮৭১) এবং *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার—দ্বিতীয় পুস্তক* (১৮৭৩)। বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকার ফলে বহু নারীর জীবন যেভাবে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তা-ই বিদ্যাসাগরকে বহুবিবাহ রদ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে নারী জাতির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতাই ছিল তাঁর কেন্দ্রীয় দর্শন। *বহুবিবাহ রচিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার* গ্রন্থের সূচনাতেই বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

> স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিকনিয়মদোষে পুরুষ-জাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ, স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার নিতান্ত বশবর্তী হইয়া, হতভাগা স্ত্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনাপ্রদান করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এই অতিজঘন্য অতিনৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, স্ত্রীজাতির দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। এই প্রথার প্রবলতাপ্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ৮৪৩)

বিদ্যাসাগর যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে বহুবিবাহ কুলীনদের কাছে অনেকটা ব্যবসায়। বহুবিবাহ না করলে কুলীন ব্রাহ্মণদের মহা সর্বনাশ হবে বলে রক্ষণশীলরা যে প্রচারণা চালিয়েছেন, বিদ্যাসাগর যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের কুলীন ব্রাহ্মণরা কোন বয়সে কতগুলো বিয়ে করেছেন তার তালিকা দিয়ে বিদ্যাসাগর বলার চেষ্টা করেছেন যে এই প্রবণতা নারী জাতির অবমাননারই নামান্তর। বিদ্যাসাগর মনে করতেন বহুবিবাহ সামাজিক দোষ। সামাজিক দোষ সমাজস্থ লোকের মাধ্যমেই দূর করা উচিত। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছেন সমাজস্থ লোকেরা মুখে বললেও এই প্রথা নিরসনের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন না। তাই তিনি এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। রক্ষণশীল হিন্দু নেতা এবং কুলীন ব্রাহ্মণরা সামাজিক দোষ সামাজিকভাবে নিরসনের কথা বলতেন এবং এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করতেন। এই মত খণ্ডন করে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য্য, এ কথা শুনিতে আপাততঃ অত্যন্ত কর্ণসুখকর। যদি এ দেশের লোক সামাজিক দোষ সংশোধনে প্রবৃত্ত ও যত্নবান হয়, এবং অবশেষে কৃতকার্য হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা সুখের, আহ্লাদের ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু দেশস্থ লোকের প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, বিবেচনাশক্তি প্রভৃতির অশেষ প্রকারে যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে,

Dhaka University Institutional Repository

তাহাতে তাঁহারা সমাজের দোষ সংশোধনে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন, এবং সেই যত্নে ও সেই চেষ্টায় ইষ্টসিদ্ধি হইবেক, সহজে সে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। ফলতঃ, কেবল আমাদের যত্ন ও চেষ্টায় সমাজের সংশোধনকার্য সম্পন্ন হইবেক, এখনও এ দেশের সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হয় নাই; এবং কত কালে উপস্থিত হইবেক, দেশের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। বোধ হয়, কখনও সে দিন ও সে সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হইবেক না।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ৮৮৪-৮৫)

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার শীর্ষক গ্রন্থের প্রথম পুস্তক প্রকাশের পর অনেক শাস্ত্রজ্ঞ রক্ষণশীল পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মত খণ্ডন করে বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত সে-কথা প্রমাণে প্রবৃত্ত হন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে পাঁচ জনের কথা বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেছেন। এঁরা হলেন—গঙ্গাধর কবিরত্ন, রাজকুমার ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, সত্যব্রত সামশ্রমী এবং তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি। এই পাঁচ জনই বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত সে-কথা প্রমাণের জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার*—দ্বিতীয় পুস্তক-এ বিদ্যাসাগর এই পঞ্চ-পণ্ডিতের যুক্তি পাল্টা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্র থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেছেন যে বহুবিবাহ একান্তই কুলীন ব্রাহ্মণদের একটি বিকৃত ব্যবসায়। 'বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রবহির্ভূত ও ধর্মবিগর্হিত ব্যবহার' উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন এইভাবে :

> মানবজাতির হিতাহিত ও কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত যে শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহরূপ পিশাচব্যবহার সেই শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী কার্য্য, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না।... শাস্ত্রানুসারে, পূর্বপরিণীতা সবর্ণা, সহধর্মিণীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। যিনি যত ইচ্ছা বিতণ্ডা করুন, যিনি যত ইচ্ছা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ করুন, যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমত বা অনুমোদিত কার্য্য, ইহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইবার নহে। শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া, অথবা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া, কিংবা অভিপ্রেতসিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছানুরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড বৈধ বলিয়া ব্যবস্থা প্রচার করিলে, নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগকে নরকে নিক্ষিপ্ত করা হয়। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ১০৮৫-৮৬)

রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁদের অনুসারী বা সহযোগীবৃন্দের সামূহিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বিধবাবিবাহ আইন পাশ করার কারণে ব্রিটিশ সরকার ভারতে সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে যে সমস্যায় পড়ে, বহুবিবাহ নিষেধক আইন পাশ করে তারা নতুন ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। তবু উনিশ শতকে বাংলাদেশে বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে যে তর্ক-বিতর্ক ও আন্দোলন চলে বাঙালি নারীর মুক্তির প্রশ্নে তার রয়েছে ঐতিহাসিক মূল্য। বহুবিবাহ নিষেধক আইন প্রণয়ন না হলেও, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে বাঙালি জনগোষ্ঠী যেভাবে সচেতন হয়ে ওঠে, তা

এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য সুফল বলেই গবেষকরা মনে করেন।[৩] এ ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াস ও অবদান ঐতিহাসিক এবং মহা-তাৎপর্যবহ। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য বিনয় ঘোষের নিম্নোক্ত মূল্যায়ন :

> বহুবিবাহ-নিরারণের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সরকারী আইন প্রণয়নের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক ফলাফলের দিক থেকে তিনি কিছুটা সার্থক হয়েছিলেন। বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলন শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাঁরা আইনের দ্বারা সরকারী হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন তাঁরা তো বটেই, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে যাঁরা বাদানুবাদ করেছিলেন তঁদের মধ্যেও অনেকে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, একথা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও, কিছুটা অন্তত উপলব্ধি করেছিলেন। (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২৯৬)

বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান প্রথা

সতীদাহ প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকা এবং বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ থাকার মতো উনিশ শতকে বাঙালি নারীর উপর আর এক অভিশাপ চেপে বসেছিল, তা হলো বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান প্রথা। গৌরীদান বাঙালি সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কন্যাশিশুকে বিয়ে দেওয়ার প্রথা তখন চালু ছিল। আট বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে না হলে, কখনো-কখনো সে-মেয়ের আর বিয়েই হতো না। এমন পরিস্থিতিতে মেয়ের পিতা-মাতাকে সবাই গালমন্দ করতো, কখনো-বা একঘরে করে রাখতো সমাজ। কখনো কখনো কথা বলতে পারার আগেই কন্যাশিশুর বিয়ে দেওয়া হতো (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ২৮)। কেবল কন্যাশিশুই নয়, কখন ছেলেদেরও অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। কখনো কখনো দশ-বারো বছরের ছেলের বিয়ে হতো তিন-চার বছরের কন্যাশিশুর সঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) দশ বছর আট মাস বয়সে পাঁচ বছর বয়সী মোহিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বিয়ে করেন চৌদ্দ বছর বয়সে, কন্যা দিনময়ী দেবীর বয়স ছিল তখন সাত বছর। অল্প বয়সে বিয়ে করার আদৌ কোনো ইচ্ছা ছিল না বিদ্যাসাগরের, কিন্তু পিতার অনুরোধে বিয়ে করতে তিনি বাধ্য হন। (বিহারীলাল সরকার, ২০১৬ : ৩০)

উনিশ শতকে হিন্দু কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত যুবকেরা বাল্যবিবাহকে মেনে নিতে পারলো না—পিতা-মাতা বা বয়স্ক আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ-নির্দেশকেও তারা উপেক্ষা করলো। কেবল সভা-সমিতিতে আলোচনা করে নয়, অনেকে পত্র-পত্রিকায় বাল্যবিবাহবিরোধী নিবন্ধ প্রকাশ করলেন, তুলে ধরলেন বাল্যবিবাহের কুফলসমূহ। ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ারের অনুগামী নব্যশিক্ষিত যুবকবৃন্দ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৪২ সালে ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ছাত্র ও অনুগামীরা গড়ে তোলেন 'হেয়ার প্রাইজ ফান্ড'। এই ফান্ডের পক্ষ থেকে ১৮৪৭ সালে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজন করা হয়। হিন্দু কলেজের কৃতি ছাত্র সতীনাথ ঘোষ উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার লাভ করেন।

সমকালে বাল্যবিবাহের বিপক্ষে ঢাকা শহরেও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। একদল শিক্ষার্থীর উদ্যোগে ঢাকা কলেজে 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঢাকা কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক সোমনাথ মুখার্জী এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সভার সদস্যরা ২১ বছরের আগে বিয়ে করবেন না—এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতেন। ক্রমে জনমানসে বাল্যবিবাহের বিপক্ষে অভিমত প্রবল রূপ ধারণ করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাল্যবিবাহের বিপক্ষে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন যে, অল্প বয়সে যে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তার মুখ্য কারণ। সতীদাহ, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহকে তিনি একই সামাজিক-সূত্রে বিবেচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য সমালোচকের এই অভিমত : "বিদ্যাসাগরের রচনাবলির এক বড়ো অংশ নারীকল্যাণমূলক রচনা, এবং ওগুলো মানবিকতা, পাণ্ডিত্য, ও যুক্তিতে অসাধারণ। শাস্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু শাস্ত্র দিয়েই তাঁকে প্রমাণ করতে হয়েছিলো যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরোধী।... নারীকে জীবন দেয়ার জন্যে তিনি শুরু করেছেন শেকড় থেকে—বাল্যবিবাহ থেকে; কেননা বাল্যবিবাহই বালবিধবা উৎপাদনের প্রধান ব্যবস্থা" (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪ : ২৭৯)। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বিদ্যাসাগর নানা সভায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন—অভিন্ন বিষয়ে রচনা করেছেন পুস্তিকা। বাল্যবিবাহের দোষ (১৮৫০) শীর্ষক পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর লেখেন :

> লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিরকাল বাল্যবিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহকরণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্থ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক-বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতি অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপ মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৬৭৯)

বাঙালির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের দুর্বলতার প্রধান কারণ হিসেবে বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহকেই শনাক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন পৃথিবীর উন্নত ও সভ্য দেশসমূহ বিয়ের ব্যাপারে দিন-দিন আধুনিক হয়ে উঠছে, পক্ষান্তরে বাংলাদেশের রক্ষণশীলরা প্রাচীন পন্থাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। বাংলাদেশের সামাজিক দুর্গতি ও নারীজাতির দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ হিসেবে বিদ্যাসাগর সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা চালু থাকা এবং বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ থাকাকেই মুখ্য বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—"...যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, বর্তমান বিবাহনিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৬৮০)

বিদ্যাসাগর জানতেন বহুবিবাহ প্রথা নিরসন করার মতো বাল্যবিবাহ প্রথা দূর করাও অত সহজ কাজ নয়। তবু তিনি সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তিনি প্রত্যাশা করেছেন একদিন-না-একদিন বাংলাদেশ থেকে বাল্যবিবাহ প্রথা দূর হয়ে যাবে। সেই আসন্ন শুভদিনের কথা কল্পনা করে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "...অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাও মঙ্গল। বোধ হয়, কখন না কখন এতদ্দেশীয় লোকেরা সেই ভাবি শুভদিনের শুভাগমনে সুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক। ...বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম। অতএব আমরা বিনয়বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্যপরিণয়রূপ দুর্নয় অস্মদেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান্ হউন (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৬৮০, ৬৮৫)। বিদ্যাসাগরের আকাঙ্ক্ষা আংশিক পূর্ণতা পায় ১৮৭২ সালে। এ বছর ব্রিটিশ সরকার পাশ করে 'বিবাহ আইন'। এই আইনে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের বেলায় ১৪ এবং ছেলেদের বেলায় ১৮ ধার্য করা হয়। অন্যদিকে ১৮৯১ সালে পাশ হয় 'সম্মতির বয়স, যার ফলে যৌনসঙ্গমে অনুমতিদানের বয়স স্ত্রীর জন্য ১০ থেকে ১২ বছরে উন্নীত করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনভর যুদ্ধের ফলেই নারীজাতির জন্য এসব ইতিবাচক আইন প্রণীত হতে পেরেছে—এই ঐতিহাসিক সত্য অবশ্যই স্বীকার্য।

জাতিভেদ প্রথা ও ধর্মীয়-সামাজিক প্রেক্ষাপট

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশে জাতিভেদ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। জাতিবর্ণের দৃঢ় বন্ধন ভারতীয় সমাজে নিয়ে এসেছে শান্তি, সংহতি ও শৃঙ্খলা; আবার একই সঙ্গে এই ব্যবস্থার ফলে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও নানামাত্রিক অসমতা। জাতিবর্ণ বা casteকে আখ্যায়িত করা হয়েছে pure, unpolluted or unmixed stock or breed হিসেবে—অর্থাৎ বিশুদ্ধ, অকলুষিত কিংবা অবিমিশ্র কোন মানবগোষ্ঠীই হচ্ছে caste বা জাতি। তবে এ সূত্রে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, জাতিবর্ণ ব্যবস্থার ফলেই সমাজে দেখা দিয়েছে অবিশুদ্ধতা এবং অপবিত্রতার ধারণা (শিপ্রা সরকার, ২০১০ : ২৭)।

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ পরিব্রাজকেরা ভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসেবে স্বীকৃত বংশভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝাতে caste শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে। বংশনুক্রমিক পরিচয়ই জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আন্তর্বৈবাহিক এই গোষ্ঠীর সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে এই বৈশিষ্ট্যর দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন সমাজবিজ্ঞানী Colley। তিনি লিখেছেন : "When a class is somewhat strictly hereditary, we may call it a Caste." (C. H. Colley, 1981 : 28)। ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় জন্মসূত্রই সামাজিক মর্যাদার ক্রমোচ্চ বিভাজন নির্ধারণ করে দেয়। বংশ-পরিচয়গত স্তরায়ণ অতিক্রম করা ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় সম্ভব নয় বললেই চলে।

ভারতীয় সনাতন জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে বর্ণাশ্রম প্রথা, যা চতুর্বর্ণ প্রথা নামে সমধিক পরিচিত।[৪] সনাতন হিন্দুসমাজ চারটি শ্রেণি বা বর্ণে বিভক্ত ছিল। এই বর্ণগুলো হচ্ছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। চারবর্ণের বাইরে যারা তাদেরকে বলা হয় Scheduled Caste−untouchables বা নমঃশূদ্র। যে প্রথার মাধ্যমে বর্ণগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হতো, তারই নাম বর্ণাশ্রম প্রথা। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ বংশানুক্রমিকভাবে সুনির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে জড়িত থাকতো এবং সামাজিক মর্যাদা ও স্তরায়ণের ক্ষেত্রে উচ্চতা-নীচতার অনুক্রম দৃঢ়ভাবে মেনে চলতো। হিন্দুধর্মের অন্যতম দার্শনিক ভিত্তি *ঋগ্বেদ*-এ সনাতন চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। *ঋগ্বেদ*-এর দশম মণ্ডলের একটি শ্লোকে সর্বপ্রথম বর্ণবিভাজনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই শ্লোকে বলা হয়েছে :

> ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহ্ রাজন্য কৃতঃ।
> ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ (রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৯৮৬ : ৭০৪)

—বঙ্গানুবাদ : ব্রাহ্মণের জন্ম [পরম] পুরুষের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়ের জন্ম বাহু থেকে, বৈশ্যের জন্ম ঊরু থেকে, এবং শূদ্রের জন্ম চরণ থেকে। ঋগ্বেদের এই শ্লোক ব্যাখ্যা-সূত্রে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার উল্লেখ করেছেন, বর্ণবিভাজনের সূত্র ধরেই ভারতীয় সমাজে ধর্মের সূচনা হয় (রোমিলা থাপার, ২০০২ : ২২-২৩)।

ভারতবর্ষে বর্ণ-কাঠামোতে ব্রাহ্মণরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বহিরাগত এই গোষ্ঠী বাংলার সমাজকাঠামোতে, বর্ণ ব্যবস্থার সুবাদে অভিভাবকত্বের মর্যাদায় উন্নীত হয়। তারা নানা কৌশলে বর্ণবিভাজনের উচ্চতম স্থানটি দখল করে নেয় (রোমিলা থাপার, ২০০২ : ২২)। ব্রাহ্মণরা নিজেদের পবিত্র ভাবতেন এবং এই পবিত্রতা রক্ষার জন্য তারা অন্য বর্ণের স্পর্শ থেকে দূরে থাকতেন। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণের সম্পর্কের সূত্রটিও ছিল প্রভু-দাস তত্ত্বশাসিত। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা নানাভাবে শূদ্রদের শোষণ করতো। শাস্ত্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্রতা-অপবিত্রতার কথা বলে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের অধঃস্তন করে রেখেছিল (নীহাররঞ্জন রায়, ১৯৯৫ : ২৫৩-৫৪)। জাতিবর্ণের দোহাই দিয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। এক্ষেত্রে আবার নিম্নবর্ণের নারীদের অবস্থা হয়েছিল আরও শোচনীয়—কারণ তারা ছিল তলের তল (bottom of the bottom)। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র আর বর্ণপ্রথার জাঁতাকলে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে, বিদ্যাসাগরের সমকালে, জাতিবর্ণ ব্যবস্থার এই ভয়াবহতা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থার দাপটে বাঙালি নারীও নানাভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হতো। বর্ণব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে পুরুষের পাশাপাশি বাঙালি নিম্নবর্ণের নারীকে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা দাসী তথা ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করেছিল। বিদ্যাসাগরের সমকালে এই প্রথা চালু থাকলেও, এ-সম্পর্কে তিনি তেমন কিছু বলেননি কিংবা লেখেননি। *বিধাবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা বিষয়িণী* (১৮৮৪) শীর্ষক পুস্তিকায় তিনি একবার এ বিষয়ে সামান্য উল্লেখ করেছেন, যেখানে উচ্চবর্ণভুক্ত ব্যক্তিরা যে যথাযথভাবে হিন্দুধর্ম পালন করছেন না সে-কথা উল্লেখিত হয়েছে :

> ...ইদানীং যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে হিন্দুধর্মের কিছুমাত্র ঠিকানা নাই। এতদ্দেশীয় ধর্মশাস্ত্রে, চারি বর্ণের আচার ব্যবহার বিষয়ে, যেরূপ বিধি ও ব্যবস্থা আছে, প্রকৃত প্রস্তাবে, ঐ সমস্ত বিধি অনুসারে, চলিয়া থাকেন, অধুনা, এরূপ লোক নয়নগোচর হয় না। এ দেশের হিন্দু-সমাজে, আজকাল, যেরূপ ভয়ানক বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে, তাহাতে, যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, শাস্ত্রের বিধি ও ব্যবস্থা অনুসারে, বিচার করিয়া বলিতে গেলে, তাঁহাদিগকেও যথেচ্ছচারী বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, এবং তাদৃশ নির্দেশ অন্যায় বা অবিবেচনার কার্য বলিয়া পরিগণিত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ১১৬৩)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হলেও জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে কিছু না বললেও, এই ব্যবস্থার প্রতি তাঁর আনুগত্যের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় বিপরীত চিত্র। মোদিনীপুরে তিনি যাদের নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ। দেহরক্ষী হিসেবে এক পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমন্ত নামের এক ধীবর। বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া ও মোদিনীপুর জেলায় বিদ্যাসাগর যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেখানে তিনি নিম্নবর্ণের অনেক মেয়েকে ভর্তির সুযোগ করে দেন। কার্মাটারে গ্রাম্য সাঁওতালদের সঙ্গে তিনি অবাধে মেলামেশা করতেন, তাদের খাওয়াতেন, তাদের খাবারও গ্রহণ করতেন (সুকোমল সেন, ১৯৯৩ : ২৩২)। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদানের পর তিনি শূদ্র ছাত্রদেরও কলেজে ভর্তির সুযোগ করে দেন। এর পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য শিক্ষার্থীরাই ভর্তির অধিকারী ছিলেন। বিদ্যাসাগর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে শূদ্র

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যবস্থা করেন (বিহারীলাল সরকার, ২০১৬ : ১১৪-১৫)। সাঁওতাল নারীদের শিক্ষা দেবারও কিছু পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, বর্ণব্যবস্থা কেবল নিম্নবর্ণের হিন্দু নয়, বরং নিম্নবর্ণের নারীদের উপরও অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

গোটা মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার দাপট ও অত্যাচার ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। উনিশ শতকেও সে-ধারা অব্যাহত ছিল। রক্ষণশীলতা আর ব্রাহ্মণ্য স্বার্থপরতার কারণে দুর্বলের উপর নির্বিচার অত্যাচার নেমে এসেছিল। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবার এবং নিম্নবর্ণের অসহায় নারীদের উপর সে-অত্যাচার আরও চরম আকারে দেখা দিয়েছিল। একদিকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিকতার দাপটে সমাজে নারী জাতির উপর সব রকম অত্যাচার ও লাঞ্ছনা চলতে থাকে। নারীদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার কোনো প্রয়াস বা ভাবনা তখন চোখে পড়েনি। ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের মহলবন্দি করে রাখার পাশাপাশি ভোগের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করার সামাজিক চেষ্টার কোনো অন্ত ছিল না। ইংরেজদের প্রভাবে এই সামাজিক প্রবণতা আরও ভয়ানক কুৎসিত হয়ে ওঠে। উচ্চবর্ণের কিছু মানুষ ইংরেজদের খারাপ দিকগুলোর চর্চাতেই বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠে। তারা নিমজ্জিত হতে থাকে আকণ্ঠ পাপে। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত :

> চড়কের বীভৎসতা ও কদর্য সঙ, দুর্গাপূজার সময় বাইজি এনে মদ মাংস খেয়ে ফুর্তি করা (তত্ত্বাবোধিনীর মতে এই তিন দিন পাপের স্রোত প্রবাহিত হত), রাসযাত্রার সময় আমোদ-প্রমোদ, মাহেশে স্নানযাত্রার সময় মেয়ে মানুষ নিয়ে চূড়ান্ত হৈ-হুল্লোড় করা, যুবতী স্ত্রী পর্যন্ত বাঁধা রেখে জুয়া খেলা, অমানবিক সতীপ্রথাকে ধর্মের অঙ্গ মনে করে দলে দলে তামাসা দেখতে আসা, শাক্তদের বীভৎস বামাচার, ব্রাহ্মণদের অনাচার এবং অত্যাচার, তারকেশ্বরের মোহন্তের ‘স্বীয় ধর্ম কর্ম সংস্থাপনার্থ’ বেশ্যা রাখা, কবির দলে রাধাকৃষ্ণের নাম করে খিস্তি খেউড়—সবই ধর্মের নাম দিয়ে চলত, এবং কলকাতা বা বাংলার হঠাৎ নবাবরা ছিলেন এসবের প্রধান উৎসাহদাতা (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৭ : ১১)

গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং প্রতাপশালী জমিদাররা ধর্মের নামে নানা অনাচার ও ব্যভিচার চালাতো। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ এইসব দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে থাকলেও কেউ প্রতিবাদী হতে সাহস করতো না। নারীদের ক্ষেত্রে একথাতো আরও গভীরভাবে সত্য। উনিশ শতকেও বিভিন্ন সাহিত্যে নারীদের সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। “বাঙালী সমাজমানসে নারী : উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকার দর্পণে” শীর্ষক প্রবন্ধে ঐতিহাসিক স্বপন বসু লিখেছেন : “ভারতীয় শাস্ত্রকার এবং কবি-সাহিত্যিকদের একটা বড়ো অংশ যুগ যুগ ধরে মেয়েদের হীন প্রতিপন্ন করার কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন” (স্বপন বসু, ২০০১ : ১৮২)। নারী জাতির নিন্দায় *মহাভারত*কারও দক্ষ ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। “হিন্দুবিবাহ” শীর্ষক এক

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধে স্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহাদের অন্তকরণে কিছুমাত্র ধর্মভয় নাই" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০২ : ৬৫৯)। ধর্মগ্রন্থের এমন বাণী বাংলার পুরুষশাসিত সমাজে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নারীদের নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল—বঞ্চিত করা হয়েছিল সামাজিক- অর্থনৈতিক অধিকার থেকেও। বাড়ির অন্দরমহলই ছিল তাদের একমাত্র পৃথিবী—পথ-ঘাট প্রান্তর-আকাশ সবই ছিল তাদের জন্য নিষিদ্ধ। সন্তান জন্ম দেওয়া ও প্রতিপালন করা এবং পুরুষের লালসা মেটানোই ছিল তাদের নির্মম নিয়তি। ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সবাই অখুশি হতো। কন্যা সন্তানকে শৈশব থেকেই অযত্ন ও অবহেলার মধ্য দিয়ে বড় হতে হতো। কন্যা নয়, বরং পুত্রই ছিল সবার কাঙ্ক্ষিত।[৫] পুত্র সন্তানকে পরিবারের সম্পদ হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। কন্যা সন্তানকে মনে করা হতো পরিবারের বোঝা। নারীর উপর এসব অবিচার করা হতো ধর্মের দোহাই দিয়ে।

উনিশ শতকে বাংলার এই ধর্মীয়-সামাজিক পটভূমিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। যেকালে নারীকে মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করা হতো না, অস্বীকৃত ছিল তার সব মানবিক অধিকার, সেকালে তার শিক্ষা নিয়ে কিছু ভাবাও ছিল অকল্পনীয়। এখানেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকা। উনিশ শতেকের যে জগদ্দল প্রতিবেশে বাংলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, তখন নারীর শিক্ষার জন্য কোনো চিন্তা ও উদ্যোগ ছিল একান্তই অকল্পনীয়। সমকালে নারীশিক্ষা সম্পর্কে লোক-মানসের ভাবনা কেমন ছিল এবং নারীশিক্ষার পরিবেশই বা কেমন ছিল, বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ মূল্যায়নে তা অতি জরুরি প্রসঙ্গ, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ। *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*-দ্বিতীয় খণ্ড (সম্পাদক : তীর্থপতি দত্ত), কলকাতা : তুলি-কলম, পৃ. ৮৭৩-৮০। বর্তমান অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্ট-৭এ বিদ্যাসাগর সংগৃহীত তথ্য সংকলিত হয়েছে।

২. খসড়া বিলটির পূর্ণ পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

A BILL TO REGULATE THE PLURALITY OF MARRIAGES BETWEEN HINDUS IN BRITISH INDIA

Whereas the institution of marriage among Hindus has become subject to great abuses, which are alike repugnant to the principles of Hindu Law and the feelings

of the people generally ; and whereas the practice of unlimited Polygamy has led to the perpetration of revolting crimes ; and whereas it is expedient to make Legislative provision for the prevention of those abuses and crimes, alike at variance with sound policy, justice, and morality : It is enacted as follows :

I. No marriage, contracted by any male person of the Hindu religion, who has a wife alive, shall be valid, unless such person, on his remarriage, shall comply with the provisions of this act relative to remarriages.

II. Every male person of the Hindu religion, who desires to contract a fresh marriage, while he has a wife alive, shall prepare a written application, setting forth the grounds on which he claims to be allowed to remarry, and shall present the same to the Local Committee or Punchayet appointed to receive such applications. Every such Local Committee or Punchayet shall consist of persons conversant with the laws or usages of Hindus.

III. On receipt of an application under the last preceding section, the Local Committee or Punchayet shall proceed to inquire whether there are sufficient grounds for allowing the claim therein set forth. Every such claim shall be summarily disallowed, unless one or the following grounds be alleged in the application.

1. That the living wife of the applicant has committed adultery.
2. That the living wife of the applicant is a confirmed Lunatic.
3. That the living wife of the applicant is afflicated with incurable Leprosy or some other such incurable and loathsome disease.
4. That the living wife of the applicant has been incapable of bearing male children, for a period of not less than eight years after the consummation of marriage.
5. That the living wife of the applicant is guilty of practices by which a Hindu becomes an outcaste.
6. That the living wife of the applicant is a person with whom, according to the law and usages of the Hindus, he could not lawfully contract a marriage : and that his marriage with her had been contracted in ignorance of the true state of the case, or in consequence of fraud practised upon him.

IV. If the grounds alleged in an application relate exclusively to matters of private concernment, the Local Committee or Punchayet may require the applicant to testify to the facts on solemn affirmation and may record such testimony as sufficient prima facie evidence of the facts so testified. Provided, that nothing in

this act shall exempt any appicant, in respect to any fact so testified, for liability to prosecution in a charge of giving false evidence.

V. If any of the grounds, stated above, be alleged in the application for permission to remarry, the Local Committee or Punchayet shall proceed to investigate the claim and shall pass an award allowing or disallowing the same.

VI. Every such award of a Local Committee or Punchayet shall be trearted as an award of arbitrators and shall be forwarded without delay to the District Court, for registration.

VII. The District Judge, on receipt of any such award, shall issue a notice to every person concerned, allowing a stated period in which to show cause why the award should not be registered. Provided, that such notice shall not state the grounds upon which the award is based : the party wishing to know them, may apply to the Local Committee or Punchayet for a copy of their award.

VIII. If, within the period allowed, any of the parties concerned appear to show cause, the District Judge shall appoint a day for hearing the objection, and after such hearing shall pass judgement rejecting or admitting such objection. Provided, that if the objection relate to some point of Hindu Law or usage or to some matter of private concernment, it shall be competent to the District Judge, without passing judgement, to refer the objection to the Local Committee or Punchayet, by whom the award was made, for further investigation and report, and proceed, on receipt of their reply, to pass judgement as aforesaid.

IX. If the objection be admitted, the award shall be of no effect and shall not be registered.

X. If the objection be rejected, or if no objection be made within the period stated, the award shall be duly registered.

XI. When any such award shall be registered in the District Court, any party concerned may, at any time, obtain a copy of the same and may put it in as sufficient prima facie evidence that the remarriage, to which it refers, is not invalid.

XII. Any person infringing the provisions of this act shall, on conviction before a competent Court, be punished with imprisonment, with or without hard labor, for a period not exceeding five years, or a fine not exceeding five thousand Rupees, or both.

XIII. Any person or persons, who shall knowingly aid or abet any person in infringing the provisions of this act, shall, on convicton before a competent Court, be

punished with imprisonment, with or without hard labour, for a period not exceeding two years, of a fine not exceeding two thousand Rupees, or both.

XIV. On the registration, under this act, of an award of a Local Committee or Punchayet, a fee shall be chargeable at such rate as the Local Government shall from time to time prescribe.

—দ্রষ্টব্য : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ। *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*-দ্বিতীয় খণ্ড (সম্পাদক : তীর্থপতি দত্ত), কলকাতা : তুলি-কলম, পৃ. ৮৯৫-৮৯৭

৩. জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪। *উনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা : দে পাবলিকেশনস্, পৃ. ২৭; সুকোমল সেন, ১৯৯৩। *ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ*, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পৃ. ২৩৩ ; Ruby Maloni, 1993. "Iswarchandra Vidyasagar and the Changing Status of Women in Bengal" in *The Golden Book of Vidyasagar* (Editor : Ashim Mukhopadhyay), 1993, Calcutta : All Bengal Vidyasagar Death Centenary Committee, p. 124

৪. বিভিন্ন সূত্র পর্যালোচনা করে সমাজ-নৃতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অন্তত খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্ব থেকেই বর্ণাশ্রম প্রথা ভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। দ্রষ্টব্য : Vincent A. Smith, 1961. *The Oxford History of India*, London : Oxford University press, p. 64

৫. বৈদিক যুগে সমাজে পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। এ যুগে নারীর যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতা পুত্র সন্তানই কামনা করতেন। এরই ধারাবাহিকতা উনিশ শতকের বাংলাদেশেও চলে এসেছে।

—দ্রষ্টব্য : সুকোমল সেন, ১৯৯৩। ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পৃ. ৪৪-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উনিশ শতকে বাংলায় নারীশিক্ষা পরিস্থিতি

উনিশ শতকের বাংলাদেশে সতীদাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথা চালু থাকা এবং বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ থাকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নারীশিক্ষার বিষয়টি। সে-সময়ে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিত্বের আপ্রাণ যুদ্ধ ও কর্মোদ্যোগে যে সমাজসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, তার কেন্দ্রে প্রধানত ছিল নারীর সামাজিক-পারিবারিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। সমাজসংস্কারকদের এই লড়াইয়ে অনিবার্যভাবে মুখ্য হয়ে উঠেছিল নারীশিক্ষার বিষয়টি। সমকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যে সীমিত প্রভাব পড়েছিল কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি সমাজমানসে, তারও অন্যতম লক্ষণ ছিল নারীশিক্ষার বিস্তার। রক্ষণশীল সমাজের জড়তা ভেঙে উনিশ শতকে নারীপ্রগতির জন্য যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তারও মূল উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ নিবারণ, বহুবিবাহ রদ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রদ এবং নারীশিক্ষার প্রসার। বস্তুত, বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার বিষয়টি সচেতনভাবে প্রথম দেখা দিয়েছিল কল্লোলিত উনিশ শতকেই। বিদ্যাসাগরের সমকালীন উনিশ শতকে নারীশিক্ষার বিষয়টি সম্যক অনুধাবনের জন্য ইতিহাসের দিকে একবার নজর দেওয়া জরুরি।

প্রত্যাশিত মাত্রায় না হলেও প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষার বিষয়টি বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বিশদ অবগত হওয়া যায়। অতীতে নারীশিক্ষার কথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। এ সময় ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যেই নারীশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল, শিক্ষায় অন্ত্যজ নারীর কোনো অধিকার ছিল না (রোমিলা থাপার, ২০০২ : ২৫)। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে ছেলেদের সাথে-সাথে মেয়েদেরও উপনয়ন শেষ করে গুরুগৃহে যেতে হতো। ছাত্রের মতো ছাত্রীরাও গুরুর পরিচর্যা করত, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। নারীরাও এমন জ্ঞানের অধিকারী হতেন যে, তারাও বিজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। বেদমন্ত্রের রচয়িতা হিসেবে কমপক্ষে সাতাশ জন নারী-কবির নাম জানা যায়। এসব নারী-কবি বৈদিক যুগের ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এসব নারী-কবির মধ্যে আছেন অপালা, অদিতি, ইন্দ্রানী, ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, সরমা, রোমশা, লোপামুদ্রা, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, শাশ্বতী, গার্গী প্রমুখ (সনৎকুমার নস্কর, ২০১৪ : ৩০৪)। *বৃহদারণ্যক* গ্রন্থে রাজা জনকের রাজসভায় ঋষি যাজ্ঞবল্কের সঙ্গে তর্ক-আলোচনায় বিদুষী গার্গীর অংশগ্রহণের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। বৈদিক সমাজে শাস্ত্রবিদ বিদুষী নারীদের ব্রহ্মবাদিনী, মন্ত্রবিদ, পণ্ডিত ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হত (শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, ১৯৯৮ : ৬-৭)। সাধারণ ঘরের মেয়েদের গৃহ-পরিচর্যা ও সূচীশিল্পের শিক্ষা দেওয়া হত। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০-৩০০ অব্দে রচিত পাণিনি ব্যাকরণে নারীশিক্ষা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 'ছাত্র্যাদয়ঃ শালায়াম' (V1.2.৮৬) সূত্রে পাণিনি ছাত্রীশালা অর্থাৎ ছাত্রীদের

আবাসের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ব্যাকরণে 'উপাধ্যায়া' এবং 'আচার্যা' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে সেকালে নারীরাও শিক্ষকতা করতেন। প্রাচীন ভারতে উচ্চবর্ণের নারী এবং ঋষি-কন্যারা শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতেন। তবে সাধারণ ঘরের মেয়েদের শিক্ষার কোনো অধিকার ছিল না (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ৩৯)। *বেদ*পাঠের সময় শূদ্রের উপস্থিতি সযত্নে পরিহার করা হত (রামশরণ শর্মা, ১৯৮৯ : ২০৯)।

মহাভারত, *রামায়ণ* ও সূত্রসাহিত্যের যুগ তথা মহাকাব্যের যুগে সামাজিকভাবে নারীর মর্যাদা হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গটি এসময় উপেক্ষিত হয়। বৌদ্ধযুগে নারীশিক্ষার বিষয়টি যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। এসময় রাজপরিবার এবং অভিজাত ঘরের নারীরা বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পেতেন। তবে গৃহে বসেই তাদের বিদ্যাশিক্ষা আয়ত্ত করতে হতো। এসময় কবি বিজয়ংকার, পণ্ডিত উভয়ভারতী প্রমুখ নারীর জ্ঞান ও বিদ্যার কথা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধযুগের প্রথম দিকে নারীকে নির্বাণ লাভের পথে অন্তরায় হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। সঙ্ঘে নারীর প্রবেশাধিকার নিয়ে সকলেই আতঙ্কিত থাকতেন। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, গৌতম বুদ্ধও সঙ্ঘের বিশুদ্ধতা রক্ষায় নারীর প্রবেশাধিকারকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি (দীনেশচন্দ্র সেন, ১৯৯৩ : ৩১৯)। তবে উত্তরকালে তিনি সঙ্ঘে নারীর প্রবেশাধিকারের অনুমতি দেন। কিছুসংখ্যক নারীকে বুদ্ধদেব সঙ্ঘরামে আশ্রয় ও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষিত এই নারীরাই বৌদ্ধযুগে ভিক্ষুণী নামে পরিচিত ছিলেন (অতুল সুর, ১৯৮৪ : ৮৭)। ধর্মাচরণে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের পাশাপাশি ভিক্ষুণীদের অধিকার ও গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। যেসব বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বিহারে জায়গা পেতেন, নিজেদের উন্নতির জন্য তারা পড়াশোনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতেন। হীনযানী বৌদ্ধদের প্রাচীনতম রূপ থেরবাদ। এই শাখার ভিক্ষুণীদের অনেকেই ছিলেন রীতিমতো শিক্ষিতা—তাঁরা উৎকৃষ্ট থেরীগাথা রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন। থেরীগাথা রচনায় যেসব ভিক্ষুণী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন পূর্ণা, মিত্রা, ধীরা, ভদ্রা, চিত্রা, শ্যামা, শুক্লা, সোমা, নন্দী, শৈলী, বিশাখা, সুমনা, কপিলা, সুলেখা, অনুপমা, পটাচারা প্রমুখ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও এঁরা স্বশিক্ষিত ছিলেন বলেই গবেষক অনুমান করেন (সনৎকুমার নস্কর, ২০১৪ : ৩০৫)।

মৌর্যযুগে সামগ্রিকভাবে নারীশিক্ষার অবস্থা ভালো ছিল না। কেবল উচ্চস্তরের অভিজাত গৃহী নারীদের মধ্যে সামান্য শিক্ষা চালু ছিল। সাধারণ নারীদের শিক্ষার কোনো অধিকার ছিল না। গুপ্তযুগেও নারীশিক্ষার তেমন কোনো প্রয়াস ছিল না। বৈদিক যুগে নারীরা যেখানে *বেদ* রচনা ও *পাঠ* করতে পারতেন, গুপ্ত ও মৌর্যযুগে সেখানে নারীদের জন্য *বেদপাঠ* নিষিদ্ধ রাখা হয়। পাল ও সেন যুগে বাংলায় নারীশিক্ষার পথ কিছুটা সুগম হয়। গোরক্ষনাথের শিষ্যা ময়নামতীর জ্ঞান ও মনীষার কথা ইতিহাসখ্যাত। পালযুগের এই নারী

Dhaka University Institutional Repository

শিশুকালে পাঠশালায় যেতেন। সেনযুগে নারীশিক্ষার তেমন কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও অনেক জ্ঞানী ও নানাবিদ্যায় পারদর্শী বহু নারীর কথা ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে জানা যায় (দীনেশচন্দ্র সেন, ১৯৯৩ : ৫০৪)। নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণ বাঙালি নারীর শিক্ষা পাল আমলে যেভাবে হ্রাস পেয়েছিল, সেনযুগে তা আরও বেড়ে যায়। সেনযুগে সাধারণ নারী শিক্ষার কোনো সুযোগই পায়নি (নীহাররঞ্জন রায়, ১৯৯৫ : ৬১৩)।

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক কারণে নারীশিক্ষার কথা তখন কেউ কল্পনা করতেও পারতেন না। মুসলিম সমাজ নারীশিক্ষা থেকে অনেক দূরে ছিল, পক্ষান্তরে নানা ভ্রান্ত ধারণা ও অন্ধ কুসংস্কারের কারণে হিন্দুরাও নারীশিক্ষা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল (সনৎকুমার নস্কর, ২০১৪ : ৩০৫)। মুসলিম কিংবা হিন্দু—মধ্যযুগে উভয় সমাজেই নারীশিক্ষার কোনো উদ্যোগ না থাকলেও এই যুগের কয়েকজন বিদুষী নারীর কথা জানা যায়, কোনো কোনো সাহিত্যকর্মে মেয়েদের শিক্ষা লাভের ছবিও পাওয়া যায়। এ কারণে এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মধ্যযুগে কোনো কোনো অঞ্চলে সীমিত পরিমাণে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কোনো নারী আবার গৃহে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। পূর্ববঙ্গের নারী-কবি চন্দ্রাবতী স্বগৃহে বিদ্যাচর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেন—তিনি বাংলা *রামায়ণ*-এর অন্যতম কবি। বর্ধমানের সোঞাই গ্রামের প্রখ্যাত বিদুষী হটী বিদ্যালঙ্কারও সুবিখ্যাত। বেনারসে গিয়ে তিনি একটি টোল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় নারীর শিক্ষার কথা জানা যায়। অনেক নারীই টোল, পাঠশালা কিংবা মক্তবে পড়ালেখা করেছেন, অনেকেই গ্রন্থ-পাঠ কিংবা পত্রলিখনে সক্ষম ছিলেন। কবিরা বিভিন্ন নারীর চরিত্র যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে মধ্যযুগে নারীশিক্ষা সম্পর্কে সীমিত একটা ধারণা নির্মাণ করা যায়। খুল্লনা, লীলাবতী, বেহুলা, সুশীলা, জয়াবতী—বিভিন্ন শাখার মঙ্গলকাব্যের এসব নারী শিক্ষিতা ছিলেন বলেই মনে হয়। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের ব্রাহ্মণকন্যা লীলাবতী চিঠি লিখতে পারতেন, খুল্লনার পত্রপাঠের ছবি এঁকেছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী :

হাসয়ে খুল্লনা ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি ॥
খুল্লনা বলেন দিদি নাহি গো তরাস।
কে মোরে লিখিয়া পাতি করে উপহাস ॥
প্রভুর অক্ষর নহে দেখি ভিন্ন ছন্দ।
কেবা এ লিখিল পত্র করিয়া প্রবন্ধ ॥
লহনার কথা শুনি বলিছে খুলনী।
স্বামীর হস্তের পত্র নহে এইখানি ॥

কপট পাতি শুন দিদি লেখিঞাছ তুমি।
লেখিঞাছে লীলাবতী চিহ্নিলাম আমি ॥
(মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ১৯৫৮ : ২০৯)

—মুকুন্দরামের কাব্যে নারীশিক্ষার এই তথ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিকের অভিমত এখানে উল্লেখ করা যায় : "The woman in general could read and write. It is mentioned in Mukundaram's *Chandikavya* that Lilavati wrote a clever letter to Khullana, wife of a merchant named Dhanapati, as if it were written by her merehant husband". (Muhammad Abdur Rahim, 1967 : 318) ।

মধ্যযুগের নাথসাহিত্যেও পাওয়া যায় নারীশিক্ষার কথা। স্বামী-বিরহে জর্জরিত অদুনা-পদুনা স্বামীর উদ্দেশে পত্র লিখে শুক-শারীর ডানায় বেঁধে উড়িয়ে দিয়েছে—ময়নামতীও ছিলেন শিক্ষিতা ও বিদুষী। সতের শতকের কবি সৈয়দ আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যের নায়িকা পদ্মাবতী শিক্ষিত ছিল বলে সমালোচক মনে করেছেন (সনৎকুমার নস্কর, ২০১৪ : ৩১৩)। দৌলত উজির বাহরাম খানের *লায়লী-মজনু* (সতের শতক) কাব্যে নারীশিক্ষার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। শৈশবে লায়লী ও কএস (মজনু) একসঙ্গে পাঠশালায় লেখাপড়া করত। এই কাব্যে সহশিক্ষার (co-education) যে চিত্র পাওয়া যায়, মধ্যযুগের অন্য কোনো রচনায় এমন স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় না। কবির ভাষায় :

সেই উদ্যানেতে গিয়া কএস সুমতি।
গুরুপদ ভজিয়া পড়এ প্রতিনিতি ॥
সুন্দর বালকগণ অতি সুচরিত।
একস্থানে সভানে পড়এ আনন্দিত ॥
সেই পাঠশালাত পড়এ কথ বালা।
সুচরিতা সুললিতা নির্মলা উজ্জ্বলা ॥
সে সব সুন্দরী মধ্যে এক অকুমারী।
মর্তেত নামিছে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
লায়লী তাহার নাম মালিক নন্দিনী।
পূর্ণ শশী জিনি মুখ জগত মোহিনী ॥
(দৌলত উজির বাহ্‌রাম খাঁ, ২০০৮ : ৯৩)

মধ্যযুগের হিন্দু কিংবা মুসলিম—উভয় সমাজেই নারীশিক্ষা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রয়াসের কথা জানা যায় না। যে সামান্য ছবি বিভিন্ন উৎস থেকে গবেষকরা উদ্ধার করেছেন, তা একান্তই প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক। পর্দাপ্রথাই ছিল নারীশিক্ষার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কী করবে, তাই শিক্ষালাভ তাদের জন্য একান্তই নিরর্থক—এমনই ছিল সামাজিক ধারণা (বিনয়ভূষণ রায়, ১৯৯৮ : ২৬)। দারিদ্র্যও এক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিল। মুসলমান রাজদরবারে এবং অভিজাত ধনাঢ্যদের

Dhaka University Institutional Repository

অন্দরমহলে নারীর লেখাপড়া চলত সীমাবদ্ধ পরিসরে। মধ্যযুগে মোগল নারীর লেখাপড়ার বিশ্বস্ত একটা চিত্র তুলে ধরেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :

> পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলে শাহজাদীগণকে লিখিতে ও পড়িতে শেখান হইত; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ কন্যার ন্যায় তাঁহারা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে যাইতেন না। হারেমের মধ্যে 'আতুন' বা গৃহশিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষালাভ করিতেন এবং তাহাও স্বল্পকালের নিমিত্ত নহে। সতের-আঠের বৎসরের পূর্বে শাহজাদীগণের বিবাহ হইত না; তৎকালাবধি বিদ্যাচর্চাই তাঁহাদিগের বিশেষ অবলম্বন ছিল। কেহ কেহ পরিণয়ান্তে পরিণত বয়সাবধি বিদ্যালোচনায় রত থাকিতেন। কাহারওবা অনূঢ় জীবন একান্তে জ্ঞানানুশীলনে অতিবাহিত হইত। (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৫ : ২১)

—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিমত কেবল মোগল রাজদরবার সম্পর্কেই প্রযোজ্য—সমাজের অন্যত্র নারীশিক্ষার এমন তথ্য দুর্লভ। অপরদিকে, যদিও শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থে নারীশিক্ষা সম্পর্কে কোনো নিষেধ ছিল না, তবু উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু নারীর শিক্ষা বলতে তেমন কিছুই ছিল না। উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে (১৮৩৫-১৮৩৮) উল্লেখ করেন যে, বালিকাদের শিক্ষা গ্রহণকে হিন্দু সমাজে অমঙ্গলের উৎস হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। রক্ষণশীল হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা লাভ করলে মেয়েরা বিধবা এবং কুচক্রী হবে। শিক্ষালাভ পাপ কাজ—এমন কথাও হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। হিন্দু নারীর এই দুরবস্থা সম্পর্কে রামমোহনের অভিমত ছিল এরকম—একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের অন্য কিছু বলে বিবেচনা করা হত না (দ্রষ্টব্য : মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, ২০০৮ : ৫২৭)।

দীর্ঘকাল ধরে জমে ওঠা সনাতন প্রথা ও ধর্মীয় বিকৃতির কদর্যতা উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এ সময় ধর্মীয় কদর্যতা কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) *কলিকাতা কমলালয়* (১৮২৩)-*নববাবুবিলাস* (১৮২৫)-*নববিবিবিলাস* (১৮৩১) এসব গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। সামাজিক কদর্যতা এবং নারীর প্রতি উপেক্ষা ধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে করা হত বলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের তখনো আবির্ভাব ঘটেনি। অথচ সমাজের বেশির ভাগ মানুষই ছিলেন এইসব কদর্যতা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও জমিদারদের যৌথ প্রচেষ্টায় নারীর উপর যথেচ্ছাচার চলত বলে তাতে বাধা দেওয়া বা আপত্তি করার সাহস সাধারণ মানুষের ছিল না। অন্যদিকে ইংরেজরাও উনিশ শতকের বিশের দশকের আগ পর্যন্ত এদেশের ধর্ম ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয়নি। বরং ইংরেজরা এদেশের প্রচলিত ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান পালনকে উৎসাহ দিত (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ৩০-৩১)।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতক কিংবা তার পূর্বের সাহিত্যকর্মে নারীদের সম্পর্কে, নারীশিক্ষা সম্পর্কে নানা কুরুচিকর ও নেতিবাচক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় শাস্ত্রকার ও কবি-সাহিত্যিকদের একটা বড় অংশ নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। *মনুসংহিতায়* নারীনিন্দাবাচক যেসব শ্লোক আছে তা উদ্ধৃত করতে 'লজ্জা ও কষ্ট' বোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৯৪)। নারীজাতির নিন্দায় মহাভারতকারের দক্ষতার কথা অনুশাসন পর্বের অষ্টত্রিশত্তম অধ্যায়ে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন থেকে উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "কামিনীগণ সৎকুমলসম্ভূত রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই, উহারা সকল দোষের আকর। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্মভয় নাই" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৯৪)। ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্যকর্মের নেতিবাচক বাণী ও অভিমত বাংলার পুরুষশাসিত সমাজে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে নারীকে, তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক-শিক্ষাগত অধিকার থেকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী নারীকে সমস্ত উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে পুরুষতন্ত্র, পারিবারিক-সামাজিক সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীকে দেওয়া হতো না ন্যূনতম গুরুত্ব। নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল চরমভাবে অস্বীকৃত। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতা উনিশ শতকের বাংলাদেশে ছিল গভীরভাবে প্রবহমান। সামাজিক এই প্রবণতায় নারীশিক্ষার কথা ভাবাও ছিল অপরাধ এবং পাপ। শতাব্দীর শুরুতে যেমন, তেমনি শতাব্দীর শেষেও নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুরা ছিল খড়্গহস্ত। উনিশ শতকের কয়েকটি লেখা উদ্ধৃত করলে নারীশিক্ষা বিষয়ে সেকালের সামাজিক ধারণাটি সম্যক উপলব্ধি করা যাবে :

[১৮৩০]

নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা পত্রিকার সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন তাঁর পত্রিকায় লিখেছেন :

> নারী হইবেক কর্মে নিষ্কামতা, পুণ্যে পরিতৃপ্তা, পতিব্রতে সাবিত্রীসমা। গর্ভাধানই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শিক্ষালাভ করিলে নারীর গর্ভাধান ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং অচিরে বিধবা হয়। ইঙ্গরাজী মহিলাদিগের দ্বারা শিক্ষালাভ করিলে নারীর বক্ষদেশ জীবনতক সমতল হইয়া যায়। (নন্দকুমার কবিরত্ন, ১৮৩০)

[১৮৩১]

১৮৩১ সালে *বঙ্গদূত* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> মিসিনারী সাহেবরা প্রায় বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে ২ বালিকা পাঠশালা করিয়া বহুবিধ বিত্তব্যয় ও ব্যসনপূর্বক বাগদী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্যা বৈরাগি বালিকারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন। কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা বানান পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে, অধিক হওনের বিষয় কি। (উদ্ধৃত : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৭ : ৯১-৯২)

[১৮৩৫]

১৮৩৫ সালে উইলিয়ম অ্যাডাম বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন :

> ... it is considered highly improper to bestow any education on women and no man would marry a girl who was known to be capable of reading....the husbands are sometimes deceived, and find on receiving their wives that, after marriage they have acquired that sort of knowledge which is supposed to be most inauspicious to their husbands. (James Long (editor), 1868 : 76)

[১৮৪৮]

নারীশিক্ষাকে তীব্রভাষায় ভয়াবহভাবে ব্যঙ্গ করেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কুৎসিত ভাষায় নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে তিনি *সমাচার চন্দ্রিকা* পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৮৪৮ সালের ৭ই মে তারিখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ভবানীচরণ লিখেছেন :

> বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার হইবে সংঘটনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টি পথে পড়িলে অসৎ পুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। তাই বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠানো কোনোমতেই কর্তব্য হইতে পারে না। (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৪৮)

[১৮৫০]

১৮৪৯ সালের ৭ই মে জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (১৮০১-১৮৫১) কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) ভয়াবহভাবে ক্ষিপ্ত হন। ইতঃপূর্বে তিনি বিধবাবিবাহের বিপক্ষে কবিতা লিখেছেন, এবার লিখতে আরম্ভ করলেন নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে। কুৎসিত ভাষায় ব্যঙ্গাত্মকভাবে ঈশ্বর গুপ্ত নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে কবিতা লিখলেন *সংবাদ সৌদামিনী*, *সংবাদ প্রভাকর* প্রভৃতি পত্রিকায়। নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতার দুটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

(ক) আগে ছুঁড়িগুলো ছিল ভালো ব্রত ধর্ম করত সবে
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কী তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেয়ে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
এখন এ বি শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।
(ঈশ্বর গুপ্ত, ১৯৬৯ : ৭০)

(খ) লক্ষ্মীমেয়ে ছিল যারা
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া, চড়বে ঘোড়া।

Dhaka University Institutional Repository

ঠাট ঠমকে চালাক চতুর সভ্য হবে থোড়া থোড়া।
এরা পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে সেজে-গুজে সভায় যাবে
ড্যাম হিন্দুয়ানী বলে বিন্দু বিন্দু ব্র্যান্ডি খাবে ॥
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে সবাই দেখতে পাবেই পাবে
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
(ঈশ্বর গুপ্ত, ১৯৬৯ : ৮৭)

[১৮৫২]

১৮৫২ সালে *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* পত্রিকায় নারীশিক্ষার কুফল জানিয়ে রাখালদাস হালদার লেখেন :

> জগদ্বীশ্বর স্ত্রীলোকদিগকে এই সংসারের যে প্রকার কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহারদিগকে শিক্ষা প্রদান করা নিতান্ত অন্যায়। ইহা কোনক্রমে জগদ্বীশ্বরের অভিপ্রায় নহে যে নৃত্যগীত এবং শিল্পকর্ম প্রভৃতি কতিপয় ইতর কার্য্য শিক্ষা করিয়া স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের মনোরঞ্জন করিবে। প্রত্যুত তাহারা ধর্ম্মনীতি অভ্যাস করিয়া আপনারদিগের সন্তানদিগকে তাহা শিক্ষা দিবে, এবং তাদ্বারা সংসারের মঙ্গল সম্পাদন হইবে, এবম্প্রকার তাৎপর্য্যই তিনি স্ত্রীদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যে দেশে মনুষ্য ঈশ্বরের এই মঙ্গল অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কার্য্য করেন, সেখানেই তাঁহার অবস্থার দুর্দশা প্রতীত হয়। (রাখালদাস হালদার, ১৯৫২)

[১৮৬৩]

নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নানাভাবে ধর্মীয় ভীতি সঞ্চার করার চেষ্টা করতেন। সমাজে যেহেতু ব্রাহ্মণদের উচ্চ মর্যাদা ছিল, তাই তাদের কথা অমান্য করার কথা কেউ ভাবতেই পারত না। ১৮৬৩ সালে কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছেন :

> তৎকালীন পণ্ডিতগণ কহিতেন যে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবলা জাতির অধিকার নাই, আর স্ত্রীগণ গৃহমধ্যে কালীর অঙ্কপাত করিলে লক্ষ্মী ত্যাগ হয়, এবং উহারা যে কোন শাস্ত্রে অধ্যয়ন করুক না কেন তাহাতেই উহাদিগের বিষমানিষ্টের সম্ভাবনা, আরও কহিতেন যে স্ত্রীগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিলে অকালে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব, এইরূপ নানাবিধ অসঙ্গত বাক্যের দ্বারা তাহারা বামাগণকে বঞ্চনা করিতেন। ... তাঁহারা বণিতাগণকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের সুধাময় মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না অথবা পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া পুরুষগণকে অগ্রাহ্য করে কিম্বা গৃহকার্য্যে উপেক্ষা করতঃ কেবল শাস্ত্রালাপেই রত থাকে ও অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইতে ইচ্ছা করে অথবা পত্রদ্বারা আমন্ত্রণ করত অন্য পুরুষকে বরণ করিতে অভিলাষী হয়, এই প্রকার বিবিধ আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তাঁহারা স্ত্রীগণকে নিতান্ত নির্বোধ ও বিদ্যাভ্যাসে অশক্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেন। (কৈলাসবাসিনী দেবী, ১৭৮৭ শকাব্দ : ৭, ১১-১২)

[১৮৬৬]

১৮৬৬ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মিস মেরি কার্পেন্টার ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা আসেন। এদেশে শিক্ষিকার অভাব দূর করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে কলকাতা পৌঁছেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তদানীন্তন ডি. পি. আই. মিস্টার অ্যাটকিনসনের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মেরি কার্পেন্টারের পরিচয় ঘটে (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২৩০)। বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে নিয়ে কার্পেন্টার কলকাতার নিকটবর্তী কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। স্কুল পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে একবার তাঁরা হুগলির উত্তরপাড়া যান। উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে ফিরে আসার সময় বিদ্যাসাগরের গাড়ি উল্টে যায় এবং তিনি যকৃতে প্রচণ্ড আঘাত পান। এই দুর্ঘটনার কথা জেনে কার্পেন্টার এবং বিদ্যাসাগরকে ব্যঙ্গ করে কবিয়াল ধীরাজ নিম্নোক্ত গানটি রচনা করে বিভিন্ন জায়গায় গেয়ে শোনান :

> অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
> ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে।
> করে তুলছে তোলাপাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
> মিস কার্পেন্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
> কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
> এখন এসে কোল্‌কেতাতে (এবার) বাঙ্গালীদের নে পড়েছে।
> উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে,
> এট্‌কিনসন উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
> নাড়াচাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে,
> গাড়ী উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে।
>
> (উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২৩০)

[১৮৭৫]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার অবস্থা জানা যায় বাঙালি কোনো নারীর প্রথম আত্মস্মৃতি রাসসুন্দরী দেবীর (১৮১০-১৮৯৯) *আমার জীবন* (১৮৭৫) থেকে। রাসসুন্দরী জানিয়েছেন যে সেকালে মেয়েদের লেখাপড়া সমাজ একান্ত গর্হিত কাজ বলেই মনে করত। তিনি লিখেছেন : "সেকালে মেয়েছেলের বিদ্যাশিক্ষা ভারী মন্দ কর্ম্ম বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস ছিল" (রাসসুন্দরী দেবী, ১৯৮১ : ৩০)। মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে মেয়েরা বিদ্যাশিক্ষা করে পুরুষের সমকক্ষ হতে চায়। তাই যেভাবেই হোক নারীশিক্ষার প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। এজন্য যেসব নারী স্কুলে যেত তাদের তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করা হত। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> তখনকার লোকে বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই, এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে। (রাসসুন্দরী দেবী, ১৯৮১ : ২২-২৩)

[১৮৮৯]

কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত নারীশিক্ষাকে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় যেভাবে বিরোধিতা করেছেন, গদ্যে তার চেয়েও নির্মম পরিহাস করেছেন নীলকণ্ঠ মজুমদার। কলকাতানিবাসী রক্ষণশীল এই হিন্দু নেতা নারীশিক্ষাকে পরিহাস ও অশ্লীলতায় তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। উনিশ শতকে একদিকে যখন বাঙালির নবজাগরণের জোয়ার বইছে, তখন নীলকণ্ঠ মজুমদারের ব্যাখ্যা রীতিমত অবাক করার মতো বিষয়। তিনি লিখেছেন—লেখাপড়া শিখলে নারীর শারীরিক আকৃতির বিকৃতি ঘটবে, দেশীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এবার উদ্ধৃত করা যাক নীলকণ্ঠ মজুমদারের উদ্ভট সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যা :

> পুষ্পসৃজনের উদ্দেশ্য যেমন পুষ্পের আকার গঠন প্রভৃতি দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ নারীজাতির জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলেও নারীদিগের আকার, গঠন, যন্ত্রসংস্থান, দেহত ত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করিতে হইবে। নারীর মস্তিষ্ক, বক্ষ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে পুত্র প্রসব ও পুত্র প্রতিপালন করাই নারী জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।...নৃত্য, গীত, বাদ্য, কার্পেট-বুনা ও *বোধোদয়* পাঠ করা নারীদিগের পক্ষে এ সমস্ত উদ্দেশ্যবিহীন নিরর্থক কার্য্য। ইহাতে কাহারও কোনরূপ উপকার বা লাভের প্রত্যাশা নাই। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেননা, ইহা দ্বারা নারীর পুত্রপ্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদুষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়, এবং তাহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না। এতদ্ভিন্ন তাহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়। (নীলকণ্ঠ মজুমদার, ১৮৮৯ : ৪)

—যুক্তিবিন্যাস এবং কল্পনার অভিনবত্ব থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, নীলকণ্ঠ মজুমদার সাধারণ কোনো মানুষ ছিলেন না। তাঁর বিকৃত সৃষ্টিশীল ভাবনা বিস্ময়কর। অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তি না থাকলে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতির এমন নিপুণ কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা অসম্ভব।

[১৮৮৯]

কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বেদব্যাস* পত্রিকার সম্পাদক ভূদেব চট্টোপাধ্যায়ও নীলকণ্ঠ মজুমদারের মতো শিক্ষার সঙ্গে নারীর অঙ্গ-প্রত্যক্ষ বিকৃতির উদ্ভট তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় *বেদব্যাস* পত্রিকায় ভূদেব লিখেছেন : "পুত্র প্রসব ও পুত্রপ্রতিপালন নারী-জীবনের উদ্দেশ্য। ... বিদ্যাশিক্ষা নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেননা, ইহার দ্বারা নারীর পুত্র প্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। শিক্ষিত নারীর উন্নত বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়। ... বিদ্যা নানা রূপে পুরুষের জন্য মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু। (ভূদেব চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৯)।

[১৮৯১]

১৮৯১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *অনুসন্ধান* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় নারীশিক্ষাবিরোধী এমন মনোভাব : "বিদ্যা নানা রূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু। কঠোর শারীরিক পরিশ্রম ও গুরুতর মানসিক চিন্তা এ সমস্ত নারীগণের পক্ষে বর্জনীয়। কেননা ওই সমস্ত কার্য্যদ্বারা নারীজীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান (সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন) উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইতে পারে না। (*অনুসন্ধান*, এপ্রিল ১৮৯১)

—উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, উনিশ শতকের প্রথম থেকে শেষ অবধি নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে একদল বাঙালি সর্বদা খড়্গহস্ত ছিল। সমাজে নারীর শিক্ষালাভের প্রয়াসকে ভালো চোখে দেখা হত না। কিন্তু এ সময়খণ্ডেই বাংলায়, বিশেষত কলকাতায় প্রবাহিত হচ্ছিলো নবজাগরণের হাওয়া। নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীপ্রগতি ও নারীশিক্ষার স্বীকৃতি। তাই উনিশ শতকে নারীশিক্ষার ওই বিরুদ্ধ প্রতিবেশে বসেও নব্যশিক্ষিত যুব-সম্প্রদায় এবং সংস্কারপন্থীরা নারীশিক্ষার পক্ষে নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর নানা ধরনের সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষিত ও প্রগতিশীল সংস্কারপন্থীদের মিলিত প্রয়াসে এবং ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতায় উনিশ শতকের বাংলায়, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, ক্রমে দেখা দিয়েছে নারীশিক্ষার নানামাত্রিক প্রয়াস। বর্তমান অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে উনিশ শতকে নারীশিক্ষার যেসব উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা উপস্থাপনের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

নারী প্রগতির স্বার্থে নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠলো শিক্ষিত বাঙালির চিন্তায়। ব্যক্ত হয়েছে যে, সমকালে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে এই কুসংস্কার প্রচলিত ছিল—মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেই নির্ঘাত বিধবা হবে। এ কারণেই সতীদাহ প্রথা প্রচলিত থাকা অবস্থায় নারীশিক্ষার কথা চিন্তা করা প্রায়-অসম্ভব এক বিষয় ছিল। কেননা, শিক্ষা লাভ করলেই বিধবা হবে, আর বিধবা হলে স্বামীর সঙ্গে সহমরণের চিতায় জ্বলতে হবে। তাই সমাজপতি, পিতা-মাতা, এমন-কি নারী নিজেও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার কথা ভাবতে পারত না। এ কারণেই উনিশ শতকের প্রথম দশকের পূর্ব পর্যন্ত নারী-শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। একটি সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় মাত্র নয় জন নারী অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন (রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৯৪ : ৩৩৩)। সম্ভ্রান্ত ধনী বা জমিদার ঘরের কন্যারা নিজ গৃহে সামান্য লেখাপড়া শিখত—মধ্যস্তর বা নিম্নবর্ণের নারীর শিক্ষার কথা কল্পনাও করা যেত না। শিক্ষালাভ নারীর জন্য লজ্জার বিষয় বলে প্রচারিত ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীর এইকথা :

Dhaka University Institutional Repository

> তখন আমার বড় ছেলেটি তালপাতে লিখিত। আমি তাহার একটি তালের পাতা লুকাইয়া রাখিলাম। ঐ তাল পাতাটি একবার দেখি, আবার ঐ পুস্তকের পাতাটিও দেখি, আর আমার মনের অক্ষরের সঙ্গে যোগ করিয়া দেখি, আবার সকল লোকের কথার সঙ্গে যোগ করিয়া মিলাইয়া মিলাইয়া দেখি। ... দয়াময়! তুমি আমায় লেখাপড়া শিখাও। (রাসসুন্দরী দেবী, ১৯৮১ : ২০, ৩৭)

উনিশ শতকের জগদ্দল পরিবেশে নারীশিক্ষার দাবি ক্রমে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তায় অনুপ্রবেশ করে। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র বৈঠকে, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কিংবা *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকার সভাকক্ষে নারীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনা ও কথাবার্তা হতো। কিন্তু উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের পূর্ব পর্যন্ত নারীশিক্ষা বিষয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। নারীশিক্ষা বিষয়ে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই সর্বপ্রথম একখানি বই লিখে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। ১৮২২ সালে তিনি *স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক* নামে গ্রন্থ প্রকাশ করে নারীশিক্ষা-বিষয়ক কুসংস্কারের অসারতা এবং নারীর শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেন। সমসাময়িক কালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের এই সাহসী উদ্যোগ ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত আরও একজন পণ্ডিতের কথা বলা যায়। এঁর নাম গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। *সংবাদ-ভাস্কর*, *রসরাজ* প্রভৃতি পত্রিকায় নারীশিক্ষার পক্ষে অনেক প্রবন্ধ লিখে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় রক্ষণশীল হিন্দুদের আচরণের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন, নারীশিক্ষার পক্ষে *সংবাদ-ভাস্কর* পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তিনি লিখেছিলেন :

> আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কু-প্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পনার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি। ...সহমরণ পক্ষাবলম্বী পাঁচ-ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্নমেন্ট হৌসের প্রধান, হালে লর্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে আর ভয়ের বিষয় কি! সহস্র সহস্র কি লক্ষ লক্ষ লোক যদি আমাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব। (উদ্ধৃত : রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৯৪ : ৩৩৩)

উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে কয়েকজন ইউরোপীয় নারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮১২ সালে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির পক্ষে রেভারেন্ড মে চুঁচুড়ায় নারীশিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর ১৮১৮ সালের জুন মাসে চুঁচুড়ায় তিনি প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিরুদ্ধ ওই সময়ে বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী পাওয়া ছিল প্রায়-অসম্ভব এক বিষয়। অনেক চেষ্টা ও খোঁজাখুঁজির পর রেভারেন্ড মে মাত্র ৮জন ছাত্রী জোগাড় করে চালু করেছিলেন চুঁচুড়া বালিকা বিদ্যালয়। কিন্তু বেশি দিন স্কুলটি চালু রাখা সম্ভব হয়নি। ১৮২০ সালের শেষে বিদ্যালয়টির জন্য কোনো শিক্ষকই পাওয়া যায়নি। ফলে বিদ্যালয়টি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় (শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, ১৯৯৮ : ৭৪)।

Dhaka University Institutional Repository

১৮১৯ সালে কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে উল্টোডাঙ্গার গৌরবাড়ি অঞ্চলে জুভেনাইল স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্কুলটি প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে Calcutta Female Juvenile Society। 'মেয়েদের স্কুল তৈরি করার কাজ মেয়েদের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়'—একথা ভেবেই কলকাতায় বসবাসরত ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠে Female Juvenile Society। নারীদের এই সংস্থাকে যোগ্য সহায়তা করার জন্য ১৮২১ সালে মিস কুক (বিয়ের পর মিসেস উইলসন) নামের এক ইংরেজ শিক্ষাবিদ নারীকে বঙ্গদেশে পাঠান ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি। কুকের প্রচেষ্টায় এক বছরের মধ্যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৮টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব স্কুল প্রতিষ্ঠায় অর্থ জোগান দিয়েছে চার্চ মিশনারি সোসাইটি। বাংলা পড়তে ও লিখতে জানে—এমন একজন বান্ধবীকে নিয়ে ঘরে-ঘরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করেন মিস কুক। এসব স্কুলে বাংলা বর্ণ, বানান, ভূগোল, সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি শেখান হত। স্কুলগুলো ছিল অবৈতনিক। উল্টো সেলাই কাজের জন্য মেয়েরা স্কুল থেকে সামান্য পারিশ্রমিক পেত। এই স্কুলগুলোতে মেয়েদের পাঠদানের জন্য তিন জন নারীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। মিস কুক স্কুলের শিক্ষিকাদের নিয়ে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছাত্রী ভর্তির জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ করতেন। কুকের প্রচেষ্টায় ১৮২৭ সালের মধ্যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় এই স্কুলগুলোতে ৬০০ জন ছাত্রী বিভিন্ন শ্রেণিতে লেখাপড়া করত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের (১৮০০) বাংলার অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) ১৮১৯ সালে শ্রীরামপুরে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর মিশনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরো কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন উইলিয়ম কেরি। কলকাতার জেনারেল ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির মহিলা সদস্যদের উদ্যোগে ১৮৩০ সালের মধ্যে কলকাতায় আরও কিছু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পায়। জানা যায়, ১৮২৮ সালে কলকাতার একটি মিশনারি স্কুলে ছেলেদের সঙ্গে ৩জন ছাত্রীও অধ্যয়ন করত। সে-যুগে ইংরেজরা এদেশে সহশিক্ষা চালু করেছিল। সে-কালের বিচারে নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ।

ব্যক্ত হয়েছে যে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। একটি তথ্য থেকে বিষয়টির ভয়াবহতা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। ১৮২২ সালের অ্যাডামের রিপোর্টে দেখা গেছে, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতি পাঁচ লক্ষ নারীর মধ্যে মাত্র ৪জন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্না ছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা নারীশিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন সর্বদা খড়গহস্ত। ইংরেজ মিশনারিদের নারীশিক্ষার উদ্যোগকে তারা ভালো চোখে দেখেনি। রক্ষণশীল হিন্দুরা প্রচার করেছে এইকথা—খ্রিস্ট্রান বানানোর জন্যই মেয়েদের

Dhaka University Institutional Repository

স্কুল খোলা হয়েছে। মিশনারি বালিকা বিদ্যালয়ে উচ্চ শ্রেণির সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা তাদের মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য পাঠাতেন না। সামাজিক দাবির মুখে গোঁড়া হিন্দুরা মেয়েদের জন্য স্বগৃহে নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রচলনে সম্মতি দিয়েছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব নারীশিক্ষার সমর্থক হয়েও মেয়েদের বাড়ির বাইরে গিয়ে লেখাপড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অন্দরমহলে পর্দার আড়ালে বসে মেয়েদের লেখাপড়ার বিধান ছিল তাঁর। তিনি শোভাবাজারে নিজের বাড়িতে মেয়েদের পড়ালেখার জন্য একটি স্কুল খুলেছিলেন। ১৮১৯ সালের জুন মাসে পাদ্রি ডব্লিউ. এইচ. পিয়ার্সকে নারীশিক্ষা বিষয়ে রাধাকান্ত দেব যে কথা জানিয়েছেন, তা থেকে এ সম্পর্কে উনিশ শতকী সম্ভ্রান্ত হিন্দুবর্গের মনোভাব অনুধাবন করা যায় : "আমরা আমাদের কন্যাদের বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা পড়াইয়া থাকি। সকলে অবশ্য এইরূপ করেন না। আমার আশঙ্কা হয় শিক্ষকগণ ধনী এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ছাত্রীরূপে পাইবেন না" (তপতী বসু, ১৯৯১ : ২২৯)। এর ৩২ বছর পরে ১৮৫১ সালে নারীশিক্ষা সম্পর্কে রাজা রাধাকান্ত দেব ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে যে চিঠি লেখেন, সেখানেও তাঁর একই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। বেথুনকে রাধাকান্ত দেব লেখেন :

> বর্তমানে আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন, আমি এতকাল উপদেশ ও নিজের কাজের দ্বারা দেশবাসীকে জানাতে চেয়েছি যে আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান সমর্থক। ...১৮১৯ সালে আমি পাদরি পিয়ার্সকে লিখে জানিয়েছিলাম যে বিবাহের আগে মেয়েদের আমরা ঘরেই বাংলা লেখাপড়া শেখাই, তাই কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বাইরের স্কুলে লেখাপড়া করতে যাবে না। এরপর আমি বরাবরই একথা বলে এসেছি। নীতির দিক থেকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা আমি করিনি, তবে প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে আগাগোড়াই সন্দেহ ছিল। (উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২১৫)

—বেথুনের কাছে পাঠানো রাধাকান্তের চিঠি থেকে বোঝা যায়, তিন দশকের অধিক সময়েও নারীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে বিনয় ঘোষের এই মূল্যায়ন : "...পরিষ্কার বোঝা যায়, রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রাচীন। আধুনিক যুগের দৃষ্টি দিয়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করেননি, আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে, গৃহশিক্ষার গণ্ডির মধ্যে, নীতিগতভাবে স্ত্রীশিক্ষাকে তিনি সমর্থন করেছেন" (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২১৫)। বস্তুত, রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে বিনয় ঘোষের এই বিবেচনা সেকালের অনেক হিন্দুনেতা সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইংরেজ মিশনারিদের উদ্যোগের পূর্বে আঠার শতকের শেষ দশকে ১৭৯৪ সালে ক্যালকাটা ফ্রি স্কুলের উদ্যোগে কলকাতার জানবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল হিন্দু মেয়েরাই সেখানে লেখাপড়া করত। এই স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ১৮১৩তে ১০০, ১৮২০এ ১২০,

১৮২৬এ ১৯০, ১৮৩৩এ ১২০, ১৮৪০এ ১৪১ জন ছিল বলে গবেষক উল্লেখ করেছেন (তপতী বসু, ১৯৯১ : ২২৮)। স্কুলে গিয়ে বাঙালি মেয়েরা প্রথম লেখাপড়া আরম্ভ করে কলকাতার জানবাজারের এই বালিকা বিদ্যালয়েই। ১৮০৯ সালে কলকাতার বৌবাজার স্ট্রিটে বেনেভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন নামে আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ৭০জন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটি শুরু হয়। এই স্কুলের পড়ালেখার তত্ত্বাবধান করতেন মিস ফিঙ্ক নামের এক ইংরেজ মহিলা। স্কুলে মেয়েদের সূচিশিল্পের কাজ শেখাতেন মিসেস ফ্যারিয়ার। ১৮১৮ সালে জানবাজারে মেয়েদের জন্য আরও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলের নাম ফ্রি স্কুল ইনস্টিটিউশন। এখানে ছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও গৃহস্থালির জ্ঞানও দেওয়া হতো। পুর্তুগিজরা ২ নম্বর সুকিয়া লেনে নিউ স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ১৮১১ সালে। পর্তুগিজ মেয়েদের সঙ্গে বাঙালি মেয়েরাও এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করত। তবে এই বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াতে রক্ষণশীল হিন্দুরা মোটেই উৎসাহী ছিলেন না, কেননা এখানে প্রধানত খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে লেখাপড়া করান হত। সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা তখনো উপলব্ধ হয়নি বলে স্কুলে বাঙালি ছাত্রীসংখ্যা ছিল নগণ্য।

খ্রিষ্টান মিশনারিরা কলকাতা ও তার আশে-পাশে যেসব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে অল্প সংখ্যক বাঙালি মেয়ে পড়ালেখা করত। গোঁড়া হিন্দুদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কিছু উদারপন্থী হিন্দু তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতেন। ১৮২৩ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে মিস মেরি অ্যান কুক যে ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে কিছু বাঙালি ছাত্রী অধ্যয়ন করত। তবে পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে রাধাকান্ত দেব ও আরো কয়েকজন মুখে নারীশিক্ষা সমর্থন করলেও কুকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দু মেয়েদের পাঠানোর প্রবল বিরোধিতা করেন। কুকের স্কুল সম্পর্কে রাধাকান্ত দেব মন্তব্য করেছেন : "All classes of respectable Hindoo's have thought it derogatory to allow their daughters to attend the schools established by Miss Cook." (উদ্ধৃত : Ghulam Murshid, 1983 : 31)। সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের অনীহা এবং গোঁড়া হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতার কারণে মিস কুকের বালিকা বিদ্যালয়সমূহ ক্রমে ছাত্রীশূন্য হয়ে পড়ে এবং ১৮৩০ সালের মধ্যে সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দুদের অনীহা ও বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল ধর্মচ্যুতির ভয়। কারণ রক্ষণশীলরা জোরেশোরে প্রচার করেছিল যে খ্রিষ্টান নারীদের স্কুলে লেখাপড়া করলে মেয়েরা খ্রিষ্টান হয়ে যাবে। ভারতে নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার প্রাথমিক প্রয়াসগুলো এভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের (১৭৩৮-১৮০৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ১৮২৮ সালের Resumption Laws সমাজের অর্থনৈতিক-সামাজিক ও শিক্ষাগত ভিতকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করে। এই অভিঘাতে বাংলার সম্ভ্রান্ত শ্রেণির ধনসম্পদ, সামাজিক মর্যাদা, প্রতাপ ক্রমশ নিষ্প্রভ হতে থাকে এবং ক্রমে

নব্যশিক্ষিত নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি জন্মলাভ করে (সোনিয়া নিশাত আমিন, ২০০২ : ৩৫)। কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা নব্যশিক্ষিত যুবসম্প্রদায় এবং কলকাতা-ঢাকা-মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত ব্যক্তিরাই ছিলেন নবজাগ্রত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মূল শক্তি। উনিশ শতকে ত্রিশের দশক থেকে নব্যশিক্ষিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই নারীশিক্ষায় বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠে। সামাজিক সংস্কারের পূর্বশর্ত হিসেবে ক্রমে গুরুত্ব পেতে থাকে নারীশিক্ষা। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য ঐতিহাসিকের এই বিবেচনা—মেয়েদের প্রতিটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ-বিষয়ক বিতর্কের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত অনেক শর্ত। ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক এবং আইনগত পুনর্গঠন এবং সেইসঙ্গে সমসাময়িক কালে আদর্শগত দাবি সৃষ্টি করেছিল সংস্কারের প্রেক্ষাপট (A. F. Salahuddin Ahmed, 1987 : 24)।

সমকালে যাঁরা নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁরা কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। নানা কৌশলে সীমাবদ্ধ পরিসরে এঁরা নারীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পি. কে. ঠাকুর, শিবচন্দ্র রায়, চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কার, আশতোষ দেব প্রমুখ। এঁদের উদ্যোগ সমাজে সামান্য হলেও ইতিবাচক মাত্রা যোগ করেছিল। তবে এঁদের উদ্যোগের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল, তাঁরা সবাই ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের শিক্ষার কথাই ভাবতেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা শিক্ষাকার্যক্রম চালাতেন অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে, ফলে সমাজে তার তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। এসময় নারী-শিক্ষকের অভাব ছিল প্রবল। অধিক বেতন দিয়ে যোগ্য নারী-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ারও সামর্থ্য অনেকের ছিল না। এ অবস্থায় মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবি ক্রমশ ব্যাপক হতে আরম্ভ করে। এই গোষ্ঠীও ক্রমে নব্যশিক্ষিত গোষ্ঠীর নারীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে সহযোগিতা বিস্তার করতে আরম্ভ করে। এমনকি গোঁড়া হিন্দুনেতা রাধাকান্ত দেবের মধ্যেও খানিকটা প্রভাব পড়ে সামাজিক এই ভাবনার। ১৮২১ ও ১৮২২ সালে মিশনারি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের স্কুল সোসাইটির ছেলেদের সঙ্গে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি। এ সময় রাধাকান্ত দেব তাঁর শোভাবাজারের বাড়িতে ছাত্রীদের কলকাতা স্কুল সোসাইটির বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রথম দুই বছরে ৪০ জন মেয়ে সাফল্যের সঙ্গে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

প্রথমদিকে বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে নানামাত্রিক সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা পড়ালেখা করতে যেত না। বাইবেলের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার জন্য সম্ভ্রান্ত অভিভাবকরা মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গরিব ঘরের মেয়েদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা ছিল না। গরিব ঘরের এক-দুইজন মেয়ে স্কুলে যাওয়া আরম্ভ করে। এ ক্ষেত্রে রাজা বৈদ্যনাথ ও তাঁর স্ত্রীর অবদানের কথা উল্লেখ করা যায়। রাজা বৈদ্যনাথের স্ত্রী লেখাপড়ার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন। বৈদ্যনাথের অনুরোধে মিসেস উইলসন তাঁর স্ত্রীকে

বাড়িতে এসে ইংরেজি শিখিয়েছেন। স্ত্রীর অনুরোধেই ১৮২৬ সালে রাজা বৈদ্যনাথ কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলটির নাম ছিল সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল। স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য বৈদ্যনাথ ২০ হাজার টাকা দান করেন। সেকালের বিচারে টাকার পরিমাণটা যথেষ্টই বলতে হবে। বৈদ্যনাথের স্ত্রীর অনুরোধ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সেকালে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহবধূও উৎসাহী ছিলেন। সেন্টাল ফিমেল স্কুল কেবল বালিকাদের শিক্ষাই দেবার ব্যবস্থা করেনি, বরং শিক্ষকদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করে। বাংলাদেশে শিক্ষা-আন্দোলনের ইতিহাসে এই উদ্যোগ পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মেয়েদের স্কুলে শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান বাধা ছিল যোগ্য নারী-শিক্ষকের অভাব। এই অভাব পূরণে কলকাতার সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৮২৮ সালে সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুলের ১২ জন নারী শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন (তপতী বসু, ১৯৯১)। সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের মেয়েরা শিক্ষক হতে তখন এগিয়ে আসেনি। কয়েকজন বিধবা এবং স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ১৮৪৮ সালে *Hand Book of Bengal Mission* গ্রন্থে James Long লিখেছেন : "Young as they [monitors] were, they were all either widows of forsaken by their husbands; they had being educated in the schools of the society, and when they became distitute, they had recourse to Mrs. Wilson, who was thus able to employ them in the service of their countrymen". [উদ্ধৃত : তপতী বসু, ১৯৯১]

১৮২৬ সালে কলকাতার এন্টালি ও জানবাজারে মিশনারিরা যে সব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানে খ্রিষ্টান মেয়েদের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম মেয়েরাও পড়ালেখার জন্য ভর্তি হয়। তবে তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। মুসলমান মেয়েরা বোরখা পরে স্কুলে যেত। হিন্দু মেয়েদের তুলনায় মুসলমান মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হবার কারণে তারা পড়ালেখায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারত না। অল্প বয়সে বিয়ে হবার কারণে মুসলমান মেয়েদের স্কুল ছাড়ার কথা লেডিস এসোসিয়েশনের রিপোর্টে সেক্রেটারি রেভারেন্ড আইসাক উইলসনও উল্লেখ করেছেন : "The remaining ten schools contain about 160 girls, most of whom are Mohamedans. It is found by experience that this class of children leave schools at an early age than the children of the Hindoo". (তপতী বসু, ১৯৯১)।

মুসলমান মেয়েদের পড়ালেখার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য শ্রীরামপুর মিশনের কর্মকর্তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাঁচটি স্কুল চালু করেছিলেন। এসব স্কুলে হিন্দু মেয়েদের পাশাপাশি মুসলমান মেয়েরাও পড়ালেখা করত। উনিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে পরিস্থিতির দৃষ্টিগাহ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। সিপাহি বিদ্রোহের

(১৮৫৭) আগে কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা, মালদা, দার্জিলিং, হুগলি, জলপাইগুঁড়ি, নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এসব স্কুলে হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা একসাথে পড়ালেখা করত। বাংলার পাশাপাশি এসব স্কুলে ইংরেজিও শিক্ষা দেওয়া হতো। কোনো কোনো স্কুলে মেয়েদের জন্য ছাত্রীনিবাসেরও ব্যবস্থা ছিল (শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, ১৯৯৮ : ৭৮)। শতাব্দীর আশির দশকে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রীদের আনুপাতিক হার থেকে ওই সময়ে নারীশিক্ষার তুলনামূলক একটা ধারণালাভ সম্ভব। ১৮৮১-১৮৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলায় সরকার স্বীকৃত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রীদের পরিসংখ্যান ছিল এরকম :

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রী	হিন্দু ছাত্রী	মুসলিম ছাত্রীর হার	হিন্দু ছাত্রীর হার
ইংরেজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	-	৭৭	-	৪১.৮৪%
মাধ্যমিক ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৪	১৭৭	১.১%	৫২.০৫%
মধ্যম দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	৩৬৩	১.১%	৬৮.৮৮%
প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭৪৫২	১৫৭০	১৪৫৮০	৮.৯%	৮৩.৫৪%
নর্মাল বালিকা বিদ্যালয়	৪১	-	-	-	-

সূত্র : Report of the Indian Education Commission 1882, Calcutta, 1883, Appendix, pp. xlii, liv. (উদ্ধৃত : মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, ২০০৮ : ৫১৩-৩২)

১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসন শুরুর মধ্য দিয়ে অপরিবর্তনীয় ভারতবর্ষ প্রবল অভিঘাতে আন্দোলিত হয়ে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই আন্দোলনকে দেয় নবতর মাত্রা। ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল দল প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে। নব্যশিক্ষিত যুবসমাজের মানসিকতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তারা শিক্ষিত নারীকে বিয়ে করতে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ১৮৩০-এর দশক থেকে নব্যশিক্ষিত যুবকেরা স্ত্রীদের লেখাপড়া শেখাতে মনোযোগী হয়। পিতা কিংবা স্বামী অথবা পরিবারের অন্য কোনো পুরুষ সদস্যের অনুপ্রেরণা-সহযোগিতা পেয়ে অনেক নারী বিদ্যাচর্চা করে এসময় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কৈলাসবাসিনী দেবী, রাসসুন্দরী দেবী, দ্রবময়ী, বামাসুন্দরী, কুমুদিনী, নিস্তারিণী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী—প্রমুখ নারীর নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এ সময়, ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের ফলে বাংলার নারীরা আরও

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন—শিক্ষার প্রতি তারা ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়েন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে মোটামুটি শিক্ষিত নারী যাঁরাই ছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই পিতা বা স্বামীর কাছে বাড়িতে শিক্ষালাভ করেন। এ ধরনের শিক্ষা সেকালে 'জেনানা শিক্ষা' নামে পরিচিত ছিল। জেনানা শিক্ষার মাধ্যমে সে-সময়ের কয়েকজন শিক্ষিত নারীর নাম নিচে দেওয়া হলো, যাঁরা প্রত্যেকেই বিয়ের আগে নিরক্ষর ছিলেন :

নাম	কীভাবে শিক্ষালাভ করেছেন	কে অনুপ্রাণনা দেন
দ্রবময়ী দেবী	পিতার টোলে	পিতা
কৈলাসবাসিনী দেবী	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	স্বামী
বামাসুন্দরী দেবী	স্বশিক্ষিত	ব্রাহ্মসমাজ
কুমুদিনী	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	স্বামী
নিস্তারিণী দেবী	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	স্বামী
ব্রহ্মময়ী	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	স্বামী
আনন্দেনী লাহিড়ী	ব্যক্তিগতভাবে	পিতা ও কাকা
মনোরমা মজুমদার	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	স্বামী
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	স্বামী
রাজকুমারী ব্যানার্জী	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	স্বামী
সৌদামিনী দেবী	স্বামীর তত্ত্বাবধানে	স্বামী
স্বর্ণকুমারী দেবী	স্বগৃহে	পিতা
তরু দত্ত	প্রথমে গৃহে, পরে বিদেশে	পিতা

(সূত্র : Ghulam Murshid, 1983 : 39)

এঁদের মধ্যে কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। কৈলাসবাসিনী দেবী বিয়ের আগে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। অথচ ব্রাহ্মণ স্বামীর উৎসাহে বিদ্যাচর্চা করে তিনিই হয়ে ওঠেন আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের প্রথম নারী-লেখক। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা* শীর্ষক গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারায় স্বর্ণকুমারী দেবীর অবদানের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৮৪৯ সালের ৭ই মে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দিন। ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের উদ্যোগে এইদিন কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। ১৮৫১ সালে বেথুনের মৃত্যুর পর এই স্কুলের নাম দেওয়া হয় বেথুন স্কুল। ১৮৪৬ সালে বারাসাত-নিবাসী কালীকৃষ্ণ মিত্রের উদ্যোগে বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন সে-স্কুল পরিদর্শনে যান। বেথুন তখন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির শিক্ষা সংসদের সভাপতি। কালীকৃষ্ণ মিত্রের বারাসত বালিকা বিদ্যালয় দেখে বেথুন উদ্বুদ্ধ হন। তিনি কলকাতায় অনুরূপ একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এ ঘটনা ১৮৪৮ সালের কথা। এরপর এক বছরের বিরামহীন চেষ্টায় বেথুন প্রতিষ্ঠা করেন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। কালীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বারাসত বালিকা বিদ্যালয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এটিই হয়ত বেথুনকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় বিনয় ঘোষের অভিমত : “... শিক্ষাসংসদের সভাপতিরূপে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বারাসত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এসে, নিজে কলকাতায় অনুরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রেরণা পান। ... বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এইজন্য যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রথম সুসংগঠিত প্রকাশ্য বিদ্যালয় ‘হিন্দু কলেজ’ এবং স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্যে বারাসতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়, দুটি প্রতিষ্ঠানই বাঙালীর উদ্‌যোগে স্থাপিত হয়” (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২১৭)। স্কুল উদ্বোধনের দিন বেথুন শীর্ষস্থানীয় কোনো বাঙালি কিংবা মিশনারি কেউকেই নিমন্ত্রণ করেননি। স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য বেথুন কোনো সরকারি সাহায্যও চাননি। ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল উদ্বোধনের দিন বেথুন বলেন :

> বিদ্যালয়ে যে-ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে, সে-সম্বন্ধে দু’চার কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই। আপনারা জানেন, গবর্নমেন্ট স্কুলে কোনো বিশেষ ধর্মবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি, মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষার কথা বললে অনেকে বিদ্রূপের হাসি হেসে থাকেন। তাঁদের ধারণা, মেয়েরা যে-শিক্ষা পাবে তা তাদের জীবনে কোনো কাজেই লাগবে না। বাস্তবিক শিক্ষা যদি তাই দেওয়া হয়, তাহলে তাঁদের সঙ্গে আমিও সেই শিক্ষাকে বিদ্রূপ করব। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মতামত, যা আমি আগেও ব্যক্ত করেছি, আপনারা যদি তা লক্ষ্য করে থাকেন, তা হলে নিশ্চয় দেখেছেন যে আমি মাতৃভাষা শিক্ষা ও চর্চার উপর জোর দিয়েছি। ইংরেজি শিক্ষার কথা বলেছি, ইংরেজি সাহিত্য অনেক উন্নত বলে। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি শিক্ষা করে নিজের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করবে, এই আমার ইচ্ছা। এই বিদ্যালয়ের মেয়েদের প্রথমে ভাল করে বাংলা শিক্ষা দেওয়া হবে, তারপর কিছু কিছু ইংরেজিও শেখানো হবে। এ ছাড়া সেলাই, অঙ্কন, হাতের কাজ প্রভৃতি মেয়েদের যে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে, সেগুলিও শিক্ষা দেওয়া হবে। এইভাবে শিক্ষা পেলে মেয়েরা উপকৃত তো হবেই, তাদের গৃহের শ্রীও তারা সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলতে পারবে” (উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২১৭)।

ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা বেথুনের জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি। প্রবল বাধার মুখেও তিনি অটল মনোবল দিয়ে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে ৭ জন এবং পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে ২১ জন মেয়েকে নিয়ে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের পথ চলা শুরু। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, নীলকমল ব্যানার্জী, গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, দ্বারকানাথ গুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হেমনাথ রায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরিনারায়ণ দেব, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং হরকুমার বসুর বাড়ির মেয়েরা সামাজিক বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে এই স্কুলে প্রথম ভর্তি হয় (*Hindoo Intelligencer*, 25.05.1849, উদ্ধৃত : অশোককুমার রায়, ২০১৪ : ১৯৯)। যদিও অন্যান্য মিশনারি স্কুলের মতো খ্রিষ্টধর্ম পড়ানো হত না, তবুও বেথুন-প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল যাত্রারম্ভেই তীব্র সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। বালিকা বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করতেন এবং যাঁরা তাঁদের কন্যাকে স্কুলে পড়তে পাঠাতেন, রক্ষণশীল সমাজ তাদের একঘরে করে রাখত। সেই বাধার মুখে মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পাশে এসে দাঁড়ালেন নবপ্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে। মদনমোহন তাঁর দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে বেথুনের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। এ-কারণে মদনমোহনের জন্মভূমি বিল্বগ্রামের ব্রাহ্মণসমাজ তাঁকে আট-নয় বছর সমাজচ্যুত করে রাখে। শিবনাথ শাস্ত্রী *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯০৪) গ্রন্থে লিখেছেন যে, বেথুনের স্কুলে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে ভর্তি করানোর প্রতিক্রিয়ায় বিল্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতেন—'ওরে! মদনা করলেটা কি?' (শিবনাথ শাস্ত্রী, ২০০৩ : ৯৩)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই যে গ্রাম ছেড়েছিলেন, আর কোনোদিন নিজগ্রামে ফেরেননি (মৃণালকান্তি চক্রবর্তী, ২০১৪ : ১৭১)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও হিন্দুর নানা প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে কৃষ্ণনগরের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের চাপে রামতনু লাহিড়ীকেও (১৮১৩-১৮৯৮) কৃষ্ণনগর ছেড়ে বর্ধমানে চলে যেতে হয়েছিল। কেবল মদনমোহন তর্কালঙ্কার বা রামতনু লাহিড়ীই নন, নারীশিক্ষা সমর্থন করা কিংবা এ-সংক্রান্ত কোনো উদ্যোগ গ্রহণের কারণে উনিশ শতকে অনেক উদারপন্থী বাঙালিকেই এরূপ সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে।

কেবল অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালন এবং বেথুনের স্কুলে নিজের দুই কন্যাকে ভর্তি করিয়েই মদনমোহন তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের মতো কিছু পত্রিকাও বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটাতে আরম্ভ করে। এই কুৎসা রটানোর বিরুদ্ধে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫০ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে একটি প্রতিবাদপত্র *Friend of India*-সহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রেরণ করেন (দ্রষ্টব্য : নির্মল দাশ, ২০১৪ : ১৫০-৫১)। মদনমোহনের প্রতিবাদপত্রটি বর্তমান অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার এ সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তবু তিনি নারীশিক্ষার স্বার্থে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে বাংলার প্রথম শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ জন্য স্কুল থেকে তিনি কোনো বেতন নিতেন না। শুধু শিক্ষকতা নয়, স্কুলের কারিক্যুলাম তৈরি এবং প্রশাসনিক কাজেও বেথুন তাঁকে পরম নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার ঠিক পনের দিন পর ১৮৪৯ সালের ২৩শে মে সন্ধ্যায় ছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে স্কুলগৃহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা করেন বেথুন ও মদনমোহন। সেই সভায় স্কুলে ছাত্রী ভর্তি এবং পাঠ্যপুস্তক রচনার দুটি গুরুদায়িত্ব মদনমোহনের উপর অর্পণ করেন বেথুন। সভায় বেথুনের বক্তৃতার কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এভাবে :

> In the meeting Bethune also discussed the immediate problems of admission and text books. The gentlemen present raised the issue of non-availability of good text books. It was decided that a book committee would be formed with Modanmohan Tarkalankar and Peary Chand Mitra along with Bethune. The committee was to prepare a list of books to be translated.... A seven member admission committee was set up with Ramgopal Ghosh, Dakshinaranjan Mukherjee, Madanmohan Pandit, Nilcomal Banarjee, Peary Chand Mitra, Hurrachandra Ghosh and Bethune himself. (Sunanda Ghosh, 2006 : 61)

বেথুন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মদনমোহন কলম ধরেছিলেন ত্রিমাত্রিকভাবে। প্রথমত, পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করতে তিনি তিন খণ্ডে *শিশুশিক্ষা* শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বিতীয়ত, বেথুনের বালিকা বিদ্যালয়কে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছিল, এর প্রতিবাদে বেথুন ও তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে পত্র-পত্রিকায় প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন মদনমোহন। তৃতীয়ত, নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং এ বিষয়ে বেথুনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত শিশুপাঠ্য বাংলা বই বেথুন স্কুলের জন্য তেমন উপযোগী ছিল না। বাংলা ভাষায় শিশুপাঠ্য বই বলতে তখন ছিল স্কুল বুক সোসাইটির *বর্ণমালা* (১৮১৮), শ্রীরামপুর মিশনের *বর্ণশিক্ষার বই* (১৮৩৫), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রচিত *শিশুসেবধি*—১-২ ভাগ (১৮৪০), তত্ত্ববোধিনী সভার *বর্ণমালা* (১৮৪০), ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির *জ্ঞানারুণোদয়* (১৮৪৪) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই বেথুনের শিক্ষাচিন্তার চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। এই পটভূমিতেই বেথুনের অনুরোধে মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচনা করেন তাঁর ইতিহাসখ্যাত প্রাইমার *শিশুশিক্ষা* (১-৩ খণ্ড)। *শিশুশিক্ষার* প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ সালে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ১৮৫০এ। *শিশুশিক্ষা* বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

> ... *শিশুশিক্ষা* বইটি যেন শিশুশিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে সহসা আধুনিকতার অরুণালোকে নিয়ে এল। এই প্রথম একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি প্রাথমিক শিশুশিক্ষার উপযোগী পুস্তক রচনায় বিচারশক্তির প্রয়োগ করলেন। তাই এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন।...এক কথায়, তিনি মধ্যযুগীয় মানসিকতার অর্থাৎ চিরন্তন গতানুগতিকতার স্থলে আনলেন দেশকালপাত্রবিচারে যুক্তিপ্রয়োগের আদর্শ। প্রথার বদলে বিচার, রীতির বদলে নীতি। মদনমোহন প্রথমেই গণিত প্রভৃতি ব্যাবহারিক শিক্ষা থেকে ভাষাশিক্ষাকে স্বাতন্ত্র্য দান করলেন এবং জ্ঞাতব্যক্রমের প্রতি লক্ষ রেখে এই ভাষাশিক্ষাকে নানা পর্যায়ে বিন্যস্ত করলেন, ঠিক যেন শিশুর হাত ধরে তাকে একটি একটি সিঁড়ি পার করে ভাষা-মন্দিরের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দিলেন। (প্রবোধচন্দ্র সেন, ১৯৯৪ : ৩১২)

নারীশিক্ষার উপযোগিতা বিষয়ে মদনমোহন ও বিদ্যাসাগরের ক্রমিক আলোচনায় একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে আসে। দু'জনের পরামর্শের আলোকে ১৮৫০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় *সর্ব্বশুভঙ্করী* মাসিকপত্র। এ পত্রিকার সম্পাদনার ভার মদনমোহনের উপর ন্যস্ত ছিল। মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামের এক ব্যক্তি সংস্কৃত যন্ত্র থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকায় নারীশিক্ষা-বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। *সর্ব্বশুভঙ্করী* পত্রিকায় ১৭৭২ শকাব্দের (১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ) আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সুবিখ্যাত প্রবন্ধ "স্ত্রীশিক্ষা"। এই প্রবন্ধে নারীশিক্ষা বিস্তার, বাল্যবিবাহ নিরোধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের পথে যে-সব বাধাবিপত্তি আছে তা তিনি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। রক্ষণশীল সমাজের নারীশিক্ষা বিরোধী আপত্তি ও অভিযোগগুলোকে মদনমোহন সূত্রাকারে উপস্থাপন করেন এভাবে :

> প্রথম। শিক্ষা কর্মের উপযোগিনী। যে সকল মানসিক শক্তি বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রীজাতির তাহা নাই, সুতরাং কন্যাসন্তানেরা শিখিতে পারে না।
>
> দ্বিতীয়। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখনো নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে, এতএব লোকাচারবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ হইতে পারে না।
>
> তৃতীয়। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া কষ্টে জীবনযাপন করিবেক। অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়া-শুনিয়া পিতামাতা কেমন করিয়া প্রাণসমান স্বসন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন।
>
> চতুর্থ। স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক, বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পিতামাতাভর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক, এবং পরিশেষে দুশ্চরিত্রা হইয়া স্বয়ং পতিত হইবেক ও স্বকীয় পবিত্র কুলকে পাতিত করিবেক; অতএব, স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত, কদাপি জ্ঞানপথের সোপানপ্রদর্শন করা উচিত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

> পঞ্চম। এই সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দোষ উল্লঙ্ঘন করিয়াও যদ্যপি স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহাতেই বা ফল কি? ইহারা চাকরী করিতে পারিবেক না, আদালতে যাতায়াত করিয়া কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না, কোন সাহেব শুভার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারিবেক না এবং হাট বাজারে বসিয়া বা কোন দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেক না; কুলের কামিনী অন্তঃপুরে বাস করে তাহার বিদ্যাশিক্ষায় কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই, প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। (মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ২০১৪ : ১৫২-৫৩)

মদনমোহন প্রতিটি আপত্তি কিংবা অভিযোগ যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করে নারীশিক্ষার পক্ষে তাঁর অভিমত উপস্থাপন করেন। বিদ্যাচর্চা করলে নারী বিধবা হয় এবং সাংসারিক দুঃখে পতিত হয়—এই অভিমত খণ্ডন করে মদনমোহন লেখেন—“বিদ্যাভ্যাস করিলে নারীগণ বিধবা হয়, এই আপত্তি শুনিয়া হাস্য করাই বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমুচিত উত্তরপ্রদান। কারণ বিদ্যাভ্যাসের সহিত বৈধব্য ঘটনার কিরূপে কার্য্যকারণ ভাব ঘটিতে পারে। পতির মৃত্যু হইলে নারী বিধবা হয়, এই পতিমরণরূপ দুর্ঘটনা যদি স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাসরূপ কারণবশতঃ উৎপন্ন হইতে পারে, তবে একজনের মাদক দ্রব্য সেবনে অন্য জনের মত্ততা অন্য জনের চক্ষুর্লৌহিত্য অপর ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রম ও তদিতরের বাক্যস্খলন সর্ব্বদাই সম্ভবিতে পারে। ফলতঃ বিদ্যার এমত মারাত্মক শক্তিও এ পর্য্যন্ত কেহই অনুভব করেন নাই। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন করিতেছেন ও করিবেন, কেহই আপন পরিবারের সংহারক হন নাই এবং হইবেনও না। আর বিদ্যাভ্যাস করিলে নারী দৌর্ভাগ্য দুঃখভাগিনী হয়, ইহা আরও হাসিবার কথা। কারণ যাঁহারা বিদ্যাধনের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারাই এই সংসারে যথার্থ সৌভাগ্যশালী ও যথার্থ ধনবান, তদ্ভিন্নেরা কেবল এই বিশ্বম্ভরার ভারস্বরূপ, জীবন্মৃত, একান্ত হত ভাগ্য, ও নিতান্ত দরিদ্র। বিদ্যারূপ ধনশালী ব্যক্তিরা আপনার অবিনশ্বর নির্ম্মল সনাতন বিদ্যার প্রভাবে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় দুঃখাসম্ভিন্ন সুখাস্বাদ করিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। ইতর ধনবানের সেরূপ সুখ ভোগ হওয়া সুদূরে পরাহত মনেরও বিষয় নয়। অতএব, স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে বিধবা অথবা সৌভাগ্যবতী হইবে এই কথার উত্তর না দেওয়াই সমুচিত উত্তর” (মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ২০১৪ : ১৫৭)। মদনমোহনের “স্ত্রীশিক্ষা” প্রবন্ধটি সমকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রচনা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিনয় ঘোষ লিখেছেন : “স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীদের সমস্ত আপত্তি একে একে খণ্ডন করে মদনমোহন যে দীর্ঘ রচনাটি লেখেন, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সমসাময়িক রচনার মধ্যে তা একটি উৎকৃষ্ট রচনা” (বিনয় ঘোষ, ১৯৯১ : ১২৮)। ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার পরে বেথুন যেসব সমস্যার মুখোমুখি হন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার একে একে তার সবগুলোই কমবেশি সমাধা করতে সক্ষম হন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বড়লাট লর্ড ডালহৌসির কাছে লেখা বেথুনের বিখ্যাত চিঠি থেকে তার কিছুটা অনুধাবন করা যায় :

> ...one of Pundits of the Sanskrit College, who not only sent two daughters to the school, but has continued to attend it daily, to give gratuitous instruction to

> the children in Bengali, and has employed his leisure time in the compilation of a series of elementary Books expressly for their own use. (উদ্ধৃত : অলোক রায়, ২০১৪ : ১৯৩)

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পনের দিন পরে ১৮৪৯ সালের ২২শে মে রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজারের নিজ বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সুখসাগর, উত্তরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, বারাসত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে দ্রুত বেশ কিছু বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয় কিংবা খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বেথুনের ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের অনুকরণে বারাসতে একটি মহিলা বিদ্যালয় পুনর্গঠন করা হয়। তবে এসব বিদ্যালয়ের কোনোটিই বেশি দিন স্থায়ী হয়নি, কিংবা প্রাথমিক উদ্যোগ আর বাস্তবায়িত হয়নি। স্থানীয় মানুষের বিরোধিতা, ছাত্রীর অভাব, নারী-শিক্ষকের সংকট, অর্থব্যয়ে সরকারের অনীহা—এসব কারণে স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে বিপরীত চিত্রও আছে। বড়লাট-পত্নী লেডি আর্মহাস্ট লেডিস সোসাইটির উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সরকারের কাছে ১০,০০০ (দশ) হাজার টাকার জন্য আবেদন করলে সরকার তা না মঞ্জুর করেন। এমত-অবস্থায় স্কুল যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য রাজা বৈদ্যনাথ লেডি আর্মহাস্টকে ২০,০০০ (বিশ) হাজার টাকা অনুদান দেন। অনেক উদার মানুষ শত বাধা সত্ত্বেও নারীশিক্ষার জন্য নানাভাবে উৎসাহ দিতেন, সহযোগিতা করতেন। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর অভিমত :

> ... কলিকাতার কতিপয় ভদ্র ইংরেজ-মহিলা সমবেত হইয়া তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আর্মহাস্টের পত্নী লেডী আমহার্স্টকে আপনাদের অধিনেত্রী করিয়া স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিবিধানার্থ বেঙ্গল লেডীস সোসাইটি (Bengal Ladies Society) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার মহিলা সভ্যগণের উৎসাহে ও যত্নে নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয়সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই ইঁহারা সহরের মধ্যস্থলে একটি প্রশস্থ স্কুলগৃহ নির্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। কিছুকাল পরে মহিলাগণ মহাসমারোহে গৃহের ভিত্তিস্থাপন পূর্ব্বক গৃহনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ গৃহ নির্ম্মাণকার্য্যের সাহায্যার্থে রাজা বৈদ্যনাথ বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন বিষয়ে মহিলাগণ এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (শিবনাথ শাস্ত্রী, ২০০৩ : ১৮৬)

সামাজিক বাধা, একঘরে করার হুমকি, এমন-কি জীবননাশের আশঙ্কা উপেক্ষা করে সেকালে অনেক উদারপন্থী মানুষ নারীশিক্ষার পক্ষে কাজ করেছেন। ১৮৪৭ সালে কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখের উদ্যোগে বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ কারণে উদ্যোক্তাদের কম উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়নি। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন দেশাচার বিরুদ্ধ কাজ এই অজুহাত দেখিয়ে স্থানীয় জমিদার ডাকাত দিয়ে উদ্যোক্তাদের হত্যারও চেষ্টা করেন। কিন্তু উদ্যোক্তারা এতে ভয় পেয়ে পিছপা হননি (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ৫৬)। আরও একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বারাসতের এই স্কুলে শিবনাথ

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রীর পিতা হরচন্দ্র ভট্টাচার্য নিজ পরিবারের কন্যাদের ভর্তি করিয়ে দেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভগ্নিরা বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর গ্রামের নারীশিক্ষাবিরোধী জমিদার বাড়ি-বাড়ি লোক পাঠিয়ে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে নিষেধ করেন। জমিদারের নির্দেশ অমান্য করে তারা যদি মেয়েদের স্কুলে পাঠান, তবে তাদের একঘরে করার হুমকি দেওয়া হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা-মাতা জমিদারের হুমকি উপেক্ষা করে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠান। জমিদারের আদেশে ক্রুদ্ধ হয়ে হরচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন :

> 'কি এ ত বড়ো আস্পর্ধার কথা ! আমার ছেলে-মেয়ে পড়বে কি না, তার হুকুম অন্যে দিবে? যদি কাহারও মেয়ে স্কুলে না যায়, আমার মেয়ে যাবে। দেখি কে কি করে।' এই বলে তিনি স্কুলে মেয়েদের নিয়ে গিয়ে শিক্ষককে বললেন 'কেবল আমার মেয়ে আসবে ও তুমি আসবে, স্কুল একদিনের জন্যও বন্ধ করো না। (উদ্ধৃত : জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ৫৮-৫৯)

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার পর নারীশিক্ষার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেন, প্রতিষ্ঠা করেন অনেক বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগরের এসব উদ্যোগের কথা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সময়ের এই পর্বে কলকাতাসহ বাংলাদেশের অনেক স্থানে নারী নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মিস মেরি কার্পেন্টার নামে একজন ইংরেজ নারী ১৮৬৬ সালের শেষ দিকে কলকাতায় আসেন। এদেশে আসার তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার বিস্তারে ভূমিকা রাখা। শিক্ষা বিভাগের পরিচালক অ্যাটকিনসন, স্কুল-পরিদর্শক উড্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে নিয়ে মেরি কার্পেন্টার বাংলাদেশের অনেক বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বালিকা বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করে মেরি কার্পেন্টারের এই উপলব্ধি হলো যে এদেশে নারী-শিক্ষকের অভাব তীব্র। তিনি মনে করতেন, বালিকা বিদ্যালয়গুলো নারী-শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এ কারণে একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলবার জন্য অস্থায়ীভাবে বেথুনের বিদ্যালয়েই একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন মেরি কার্পেন্টার। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনমোহন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তি কার্পেন্টারের উদ্যোগ সমর্থন করেন। কার্পেন্টারের প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখার জন্য কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনমোহন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তি ১৮৬৬ সালের ১লা ডিসেম্বর ব্রাহ্মসমাজের একটি সভা আহ্বান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ওই সভায় আমন্ত্রিত হন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হয় বিদ্যাসাগর তার একজন সভ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু মতের অমিল হওয়ায় বিদ্যাসাগর এই কমিটি থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। বেথুন স্কুলের একাংশে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ স্কুল খোলার প্রস্তাব বিদ্যাসাগর সমর্থন করেননি। সরকার মেরি কার্পেন্টারের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের একাংশে কার্পেন্টারের নর্মাল স্কুল চালু হলো। মাসিক তিনশত টাকা বেতনে তিন বছরের জন্য মিসেস ব্রিট্‌শে নামের এক নারী বেথুন বালিকা বিদ্যালয় ও নর্মাল স্কুলের সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে যোগ দেন। তবে ফিমেল নর্মাল স্কুলটি বেশিদিন চলেনি। তিন

বছর যেতে-না-যেতেই ছোটলাট জর্জ ক্যাম্পবেল বেথুন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট নর্মাল স্কুলটি তুলে দিতে আদেশ দেন। অবশেষে অনেক বিতর্কের পর ১৮৭৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি ফিমেল নর্মাল স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।

নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি উনিশ শতকে অনেক লেখক নারীশিক্ষার পক্ষে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৫০ সালে *সর্ব্বশুভঙ্করী* পত্রিকায় প্রকাশিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "স্ত্রীশিক্ষা" প্রবন্ধটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এসময়ে উল্লেখযোগ্য যেসব লেখক নারীশিক্ষার পক্ষে বই লিখেছেন তাঁরা হচ্ছেন গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, হরচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ রায়, কৈলাসবাসিনী দেবী, রাধামাধব বসু, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী, কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এসব লেখকের নারীশিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থ এবং তার প্রকাশকাল নিচের তালিকায় উপস্থাপিত হলো :

	লেখক	বইয়ের নাম	প্রকাশকাল
১.	গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার	*স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক*	১৮২২
২.	কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	*A Prize Essay on Native Female Education*	১৮৪১
৩.	তারাশঙ্কর তর্করত্ন	*ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা*	১৮৫০
৪.	হরচন্দ্র দত্ত	*An Address of Native Female Education*	১৮৫৬
৫.	দ্বারকানাথ রায়	*স্ত্রীশিক্ষা বিধান*	১৮৫৭
৬.	কৈলাসবাসিনী দেবী	*হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি*	১৮৬৫
৭.	রাধামাধব বসু	*স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ*	১৮৭৮
৮.	যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	*বাঙ্গালী মেয়ের নীতিকথা*	১৮৮৯
৯.	গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী	*নারীশিক্ষা*	১৮৯৫
১০.	কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	*স্ত্রীশিক্ষা*	১৮৯৮

Dhaka University Institutional Repository

উর্পযুক্ত তালিকার সব বইই নারীশিক্ষাকে সমর্থন করে লেখা। নারীশিক্ষার সমর্থনে এসময় অনেকে পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে অনেক নারী-লেখকের নামও উল্লেখ করা যায়। এঁদের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, শৈলজাকুমারী দেবী, রমাসুন্দরী দেবী, মধুমিতা মুখোপাধ্যায়, শ্যামাসুন্দরী দেবী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭২ সালে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শ্যামাসুন্দরী দেবীর লেখা "প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার প্রভেদ" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ। *ভারতী* পত্রিকায় ১৮৮১ সালে "স্ত্রীশিক্ষা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। উপর্যুক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ উনিশ শতকে নারীশিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উনিশ শতকে নারীশিক্ষার পক্ষে যেমন বই ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, তেমনি লেখা হয়েছে নারীশিক্ষার বিপক্ষেও অনেক লেখা। এ ধারার লেখকদের মধ্যে আছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যয়, নন্দকুমার কবিরত্ন, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ঈশ্বর গুপ্ত, রাখালদাস হালদার প্রমুখ। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালীকচ্ছ গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রচনা করেন *স্ত্রীশিক্ষা* শীর্ষক একটি বই, যা ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। পূর্ববর্তী সব লেখকের নারীশিক্ষা-বিরোধী ধারণাসমূহ একত্র করে গ্রন্থকার মেয়েদের লেখাপড়ার আটটি আপত্তি তুলে ধরেন। তাঁর আপত্তিগুলো এরকম—লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা ১. অন্ধ হয়, ২. বিধবা হয়, ৩. নিঃসন্তান হয়, ৪. অবিনীতা হয়, ৫. লজ্জাহীনা হয়, ৬. অকর্মণ্য হয়, ৭. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত হয়, এবং ৮. দুশ্চরিত্রা হয়। কাশীপ্রসাদ ঘোষ *Hindoo Intelligencer* পত্রিকায় নারীশিক্ষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে ১৮৪৯ সালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে কাশীপ্রসাদের ভাষা ছিল ভয়ংকর আক্রমণাত্মক। কাশীপ্রসাদের বক্তব্যের সমালোচনা করে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর *সংবাদ ভাস্কর* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২২০)।

উনিশ শতকে নারীশিক্ষা প্রচলনের জন্য বালিকা বিদ্যালয়, নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং গ্রন্থ-প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও নারীশিক্ষার পাঠক্রম নিয়েও বাঙালি পণ্ডিতরা চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয়ে মেয়েরা কী শিখবে এ নিয়ে বিতর্ক ক্রমে চরম আকার ধারণ করে। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর অনুগামীরা বললেন যে মেয়েদের জ্যামিতি, দর্শন, গণিত ইত্যাদি পুরুষালি বিষয় পড়ার দরকার নেই; অন্যদিকে শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্নদাচরণ খাস্তগীর, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ র‍্যাডিক্যাল ব্রাহ্ম মেয়েদের সব বিষয় পড়ার এবং সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ১২১)। অনেক আলাপ-আলোচনার পর মেয়েদের স্কুলের জন্য পাঠক্রম প্রস্তুত করা হয়। বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য পাঠক্রম ছিল নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম শ্রেণি : বাংলা-*বোধোদয়*, গণিত।

দ্বিতীয় শ্রেণি : বাংলা-*আখ্যানমঞ্জরী*, *পদ্যপাঠ*-দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণ, ভূগোলসূত্র, গণিত।

তৃতীয় শ্রেণি : বাংলা-*চারুপাঠ*-তৃতীয় ভাগ, *পদ্যপাঠ*-তৃতীয় ভাগ, ব্যাকরণ, *ভূগোলসূত্র*, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, বস্তুসার, গণিত।

চতুর্থ শ্রেণি : বাংলা, টেলিমেকাস, *সদ্ভাবশতক*, ব্যাকরণ, ভূগোল, স্বাস্থ্যরক্ষা, গণিত।

পঞ্চম শ্রেণি : *রঘুবংশ* (অনুবাদ), *মেঘনাদবধ কাব্য*, ব্যাকরণ, প্রাকৃত ভূগোল, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, প্রাকৃত বিজ্ঞান, গণিত।

পরবর্তী সময়ে পাঠক্রমের সামান্য অদল-বদল হলেও উপরের পাঠক্রমই মোটামুটি সব স্কুলে অনুসৃত হতো। অন্যদিকে নর্মাল স্কুলসমূহে পাঠদান হত নিম্নোক্ত পাঠক্রম অনুসারে :

প্রথম শ্রেণি : বাংলা-*চরিতাবলী*, ইংরেজি-*First Book of Reading*, গণিত।

দ্বিতীয় শ্রেণি : বাংলা-*আখ্যানমঞ্জরী*-দ্বিতীয় ভাগ, *পদ্যপাঠ*-দ্বিতীয় ভাগ, ভূগোল, মৌল পদার্থবিদ্যা, বস্তুবিচার, ইংরেজি : *First Book of Reading*, Arithmetic।

তৃতীয় শ্রেণি : বাংলা-*চারুপাঠ*-তৃতীয় ভাগ, *পদ্যপাঠ*-তৃতীয় ভাগ, ইতিহাস-*বাঙ্গালার ইতিহাস*-প্রথম ভাগ, ভূগোল, ইংরেজি- *First Book of Reading*, গণিত।

চতুর্থ শ্রেণি : বাংলা-*মেঘনাদবধ কাব্য*, ইংরেজি-*Rudiments of Knowledge*, ইতিহাস-*ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ভূগোল, মৌল পদার্থবিজ্ঞান, গণিত।

পঞ্চম শ্রেণি : বাংলা-*মেঘনাদবধ কাব্য*, নারী জাতি-বিষয়ক প্রস্তাব, ইংরেজি-*Course of Reading*, ইংরেজি ব্যাকরণ, ইতিহাস-*The Landmarks of Ancient History*. ভূগোল, মনস্তত্ব, গণিত।

(জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ১২৩-২৪)

১৮৭৩ সালে অ্যানেট অ্যাক্রএডের পরিচালনায় হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা নিয়ে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়। মনমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ ব্যক্তির সহায়তায় অ্যানেট অ্যাক্রএড-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ই ছিল একটা সময় পর্যন্ত মেয়েদের উচ্চশিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। তবে এই উচ্চশিক্ষা উচ্চ-প্রাথমিক স্তর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী কাদম্বিনী বসু পরবর্তীকালে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে হেনরি বিভারিজের সঙ্গে অ্যানেটের বিয়ে হলে বিদ্যালয়টি সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির চেষ্টায় বিদ্যালয়টি ১৮৭৬ সালে পুনরায় চালু হয়। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ১৮৭৮ সালে বিদ্যালয়টি বেথুন

বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্র করা হয়। তখন বেথুন বলিকা বিদ্যালয় ও এর কলেজ শাখা বাংলাদেশে নারীশিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ১২৪-২৫)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি। কিন্তু শুরুতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়ালেখার কোনো সুযোগ ছিল না। ১৮৭৬ সালে বাঙালি খ্রিষ্টান কন্যা চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রবেশিকা বা এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের পরীক্ষা দেবার কোনো নিয়ম ছিল না। শুরু হয় নানা বিতর্ক, সভা-সমাবেশ। অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেয় যে, ছাত্রদের প্রশ্নপত্রে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা দিতে পারবে আবেদনকারী। ১৮৭৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন চন্দ্রমুখী বসু। চন্দ্রমুখী বসুই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হওয়া প্রথম নারী। চন্দ্রমুখীর এই কৃতিত্বে আনন্দিত হয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে শেক্সপীয়র রচনাবলি উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। পরের বছর কাদম্বিনী বসু অন্যসব পরীক্ষার্থীর সঙ্গে সমভাবে পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এভাবে শুরু হলো বাঙালি নারীর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ।

উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৪ সালে ঢাকার ফরাশগঞ্জে চালু হয় দ্য খ্রিষ্টান ফিমেল স্কুল। স্কুলটি স্থাপন করেন মিসেস লিওনার্দে নামের একজন পর্তুগিজ নারী। কিন্তু ১৮২৬ সালে লিওনার্দের আকস্মিক মৃত্যুতে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। মিসেস লিওনার্দের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পূর্ববঙ্গে বেশ কয়েকটি মিশনারি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরাই এগুলো চালাতেন। এসব স্কুল স্থাপিত হয় চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর ইত্যাদি অঞ্চলে। ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইডেন ফিমেল স্কুল পূর্ববঙ্গে নারীশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা নর্মাল স্কুল। ১৮৬৭-১৮৬৮ শিক্ষাবর্ষে পূর্ববঙ্গে আরও ছয়টি নর্মাল স্কুল খোলা হয়। এসব স্কুলে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের জন্য মেয়েরা পড়ালেখা করত। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল (১৮৭৩), ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী হাই স্কুল (১৮৭৩), বরিশাল গার্লস হাই স্কুল (১৮৭৫), চট্টগ্রামের ডা. খাস্তগীর হাই স্কুল ফর গার্লস (১৮৭৮), সিলেটের গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল (১৮৭৮), রাজশাহীর পি. এন. গার্লস হাই স্কুল (১৮৭৮) প্রভৃতি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তৎকালীন পূর্ববঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত মেয়েদের কোনো স্বতন্ত্র কলেজ ছিল না। ছেলেদের কলেজেই আগ্রহী মেয়েরা বিশেষ ব্যবস্থায় পড়ালেখা করত। এসময় সমগ্র বাংলায় প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুলগুলোর মধ্যে মাত্র দুটির দেখাশোনা করত

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের শিক্ষা বিভাগ—স্কুলদ্বয় হলো কলকাতার বেথুন বালিকা স্কুল এবং ঢাকার ইডেন বালিকা বিদ্যালয় (সোনিয়া নিশাত আমিন, ২০০২ : ১২৯)। পূর্ববাংলার বালিকা বিদ্যালয়সমূহে হিন্দু শিক্ষার্থীর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম শিক্ষার্থী পড়ালেখা করত। তবে মুসলিম মেয়েরা পড়ালেখায় বেশি দূর যেতে পারত না। বাল্যবিবাহের কারণে অনেকেই পড়ালেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। ১৮৮১-১৮৮২ সালের সরকারি রিপোর্টে দেখা যায়, মাধ্যমিক স্তরে শেষ পর্যন্ত অতি সামান্য সংখ্যক মুসলিম নারী পড়ালেখা করত (সোনিয়া নিশাত আমিন, ২০০২ : ১২৯)। ১৯০১ সালের ভারতীয় আদম শুমারি থেকে পূর্ববঙ্গে মুসলিম নারীর শিক্ষার অবস্থা জানা যায়। তাতে দেখা যায়, মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার শতকরা ১ থেকে শতকরা ৩ ভাগ পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে এবং ৪০০ জন মুসলিম মেয়ে বাড়িতে বসে ইংরেজি শিখেছে (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৭৭ : ২২)।

উনিশ শতকে বাঙালি নারীর এই সামাজিক-পারিবারিক-শিক্ষাগত আবহে মুক্তচিত্তদ্রোহী মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বল আবির্ভাব। নারীশিক্ষার এই সামূহিক পরিস্থিতিতে নারীর কল্যাণের জন্য বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার বিস্তারকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেন এবং নানারকম কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করলেন—যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্ম

উনিশ শতকের শুরুতে পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে বাঙালি নারীর অবস্থা ও অবস্থান ছিল খুবই হতাশাজনক। পুরো উনিশ শতক জুড়েই নারীর এই হতাশাজনক অবস্থা বাঙালি সমাজে বিরাজমান ছিল। বাঙালি নারীর এই দুরবস্থার প্রধান কারণ হিসেবে নারীশিক্ষার অভাবকেই সমাজচিন্তকেরা শনাক্ত করেছেন। শিক্ষার অভাবই সামাজিক অন্ধকূপে বন্দি রেখেছে, যুগের পর যুগ, বাঙালি নারীকে। তাই নারীজাতির অগ্রগতির জন্য প্রথমেই দরকার তার শিক্ষা—একথা উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাঙালি সমাজে জোরেশারে উচ্চারিত হতে থাকে। এই শিক্ষাগত ও সামাজিক পটভূমিতেই বাংলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দীপ্র আবির্ভাব। নারীজাতির সামূহিক উন্নতিই তাঁর কাছে বিবেচ্য হল প্রধান কর্তব্যকর্ম বলে। নারীজাতি সম্পর্কে বাংলাদেশের হৃদয়হীন সমাজের অবিচারমূলক ব্যবহার লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর যে বেদনা অনুভব করেছেন, তা-ই তাঁকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেছিল (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১ : ৮৯)। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা এবং অশিক্ষার অভিশাপ থেকে নারীকে মুক্ত করার প্রধান উপায় হিসেবে নারীশিক্ষা বিস্তারে তিনি নিজেকে সনিষ্ঠভাবে নিয়োজিত করলেন। বর্তমান অধ্যায়ে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ, বাঙালি সমাজে তাঁর নারীশিক্ষা প্রচেষ্টার উত্তরপ্রভাব—ইত্যাদি বিষয় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

২. শিক্ষাচিন্তা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রথমেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার সামূহিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা প্রয়োজন। সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করেই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার উদ্ভব। শৈশবে ইংরেজি স্কুলে পড়ার প্রবল আগ্রহ থাকলেও পিতার ইচ্ছায় তাঁকে পড়তে হয়েছে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত কলেজে। সংস্কৃত কলেজে পাঠাভ্যাস কালে বিদ্যাসাগর প্রধানত ভারতীয় শাস্ত্র ও ধর্মীয় বিষয় অধ্যয়ন করেছেন। অন্যদিকে পরিবার-সূত্রেও তিনি বেদ-পুরাণ-চতুষ্পাঠীর উত্তরাধিকারবাহী। কিন্তু তিনি ছিলেন মুক্তচিত্তদ্রোহী উদার মানবতাবাদী। তিনি ছিলেন ‘হিউম্যানিস্ট’ বিদ্যার সাধক, তাই তাঁর শিক্ষাদর্শেরও মৌল ভিত্তি ছিল হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৪০২)। তাঁর শিক্ষাদর্শনও মূলত মানবতাবাদী দর্শন। প্রাচীন ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল বিদ্যা ও ধর্মীয় শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেও, উনিশ শতকের মানবতাবাদী আদর্শ তাঁকে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষানীতির প্রতি অন্ধ-অনুরাগী করে তোলেনি।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতির দিক থেকে বিদ্যাসাগর ছিলেন সম্পূর্ণ আধুনিক। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় সনাতন শিক্ষা ও মূল্যবোধের সঙ্গে তিনি কখনো আপস করেননি। আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যা এবং ভারতীয় বিদ্যার সমন্বয় তাঁর কাম্য ছিল, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষায় বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণকে তিনি কখনোই সমর্থন করেননি। ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে শিক্ষাকে তিনি মুক্ত রাখতে চেয়েছেন—মানুষই ছিল তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রধান প্রেরণাউৎস। শাস্ত্রকার, পুরোহিত, গুরু বা পণ্ডিত নয়, মানুষ সৃষ্টি করাই ছিল বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য।

১৮৪৬ সালের ৬ই এপ্রিল মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন বিদ্যাসাগর। ছয় মাসের অভিজ্ঞতায় সংস্কৃত কলেজের সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে বিদ্যাসাগর খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েন। কলেজের উন্নতির জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন বিদ্যাসাগর। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তের কাছে পরিকল্পনাটি পেশ করেন তিনি। ওই পরিকল্পনার মধ্যে পাঠক্রম, পাঠ-পদ্ধতি, শৃঙ্খলা, অধ্যাপকবৃন্দের নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা—ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বতন্ত্র ভাবনা তুলে ধরেন। কিন্তু মাত্র ছ'মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগরের এতটা কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারলেন না রসময় দত্ত। দু'জনের মধ্যে মতান্তর দেখা দিল। ক্রমে পরিস্থিতি এমন হল যে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে আর স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় অনিশ্চিত জীবনের কথা জেনেও বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চাকুরি থেকে পদত্যাগ করেন। রসময় দত্তের কাছে পেশ করা পরিকল্পনা থেকে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের অনেক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায়।

সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেই বিদ্যাসাগর দেখলেন কলেজে কোনো শৃঙ্খলা নেই—ছাত্র-শিক্ষকদের আসা-যাওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। ক্লাসের সময় শিক্ষকেরা চেয়ারে বসে নিদ্রা যেতেন, ছাত্ররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের বাতাস করত। সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে শ্লীল-অশ্লীল কবিতার কোনো বাছ-বিচার ছিল না। এইসব অব্যবস্থা দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন বিদ্যাসাগর। পাঠক্রম থেকে আরম্ভ করে পাঠদান প্রক্রিয়া, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, সময়ের নিয়মানুবর্তিতা—ইত্যাদি বিষয় তিনি সুনির্দিষ্ট করে দিলেন। এ-বিষয়ে বর্তমান অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষাচিন্তক হিসেবে বিদ্যাসাগরের ভূমিকাই এখানে বলবার বিষয়। বিদ্যাসাগর সময়ানুবর্তিতাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করতেন। তাই সময়মতো বিদ্যালয়ে আসা এবং পাঠদানের জন্য তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এ ব্যাপারে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকবৃন্দ যে পাঠদানের সময় চেয়ারে বসে নিদ্রা যেতেন এবং শিক্ষার্থীদের দ্বারা বাতাস খেতেন—বিদ্যাসাগর নোটিশ পাঠিয়ে তা বন্ধ করে

দিলেন। বর্তমান অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্ত হয়েছে যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ সময়মতো ক্লাসে উপস্থিত হয় কি না, এজন্য তিনি কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কখনো-বা শিক্ষকের পাঠদান কৌশল সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করতেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে সংস্কৃত কলেজে এ ধরনের উদ্যোগের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি যথার্থই শিক্ষাকে ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন সংস্কৃত কলেজকে। তাই কারো কারো বিরাগভাজনের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই শিক্ষা-সংস্কারক থেকে শিক্ষা-দার্শনিকে উত্তরণের প্রাথমিক প্রয়াস বিদ্যাসাগরের কর্মোদ্যোগে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সমাজ-বিশ্লেষকরা মনে করেন, সংস্কৃত কলেজে যোগদানের ছয় মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর যে পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন, বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষার ভিত তার মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় বিনয় ঘোষের অভিমত :

> গত একশ-দেড়শ বছরের মধ্যে সামাজিক রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তা শিক্ষার প্রসার ভিন্ন হত না। উনিশ শতকের অনেক শিক্ষাব্রতী শিক্ষার এই প্রসারের কলাকৌশলের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁদের অনেকে বিদ্যাসাগরের সমকালীন ছিলেন। বাংলাদেশে থেকেও বিদ্যাসাগর তাঁদের শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাঁদের চিন্তায় ও আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তার মধ্যে যা গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য, তা এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগও করেছেন। অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যেও নির্ভয়ে প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হননি। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সংঘাতই শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘটেছে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে তো বটেই, বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গেও। তার মধ্যেও তিনি যতটুকু শিক্ষাসংস্কার করতে পেরেছিলেন, তার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়েছে এবং আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির ভিতও গড়ে উঠেছে। (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৪০৩)।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাব্রতীদের চিন্তা-ভাবনা বিদ্যাসাগরকে কীভাবে এবং কোন মাত্রায় প্রভাবিত করেছে, তা কোথাও লেখা নেই। কিন্তু বিদ্যাসাগর এসব বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত ছিলেন বলেই বিনয় ঘোষ মনে করেন। বিদ্যাসাগরের 'বিখ্যাত গ্রন্থাগারে' এমন সব বই পাওয়া গেছে, যা থেকে এমন অনুমান করা সম্ভব যে সমকালের সব শিক্ষাব্রতীর ভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তিনি। তাঁর সংগৃহীত পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকার মার্জিনের মন্তব্য থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তৎকালীন শিক্ষাচিন্তকদের ভাবনা তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডের জাতীয় শিক্ষা, নারীশিক্ষা, জনশিক্ষা, মডেল স্কুল, প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষানীতি, পাঠপদ্ধতি, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, পাঠক্রম বা কারিক্যুলাম—ইত্যাদি বিষয় বিদ্যাসাগর প্রয়োগ করায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। গবেষক লিখেছেন : "উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, তাঁর সমকালে, ইয়োরোপ ও ইংলন্ডের শিক্ষাব্রতীরা যেসব শিক্ষাসমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলেন, যে পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রসার ও সংস্কারের জন্য চেষ্টা করছিলেন, বিদ্যাসাগরের সংগৃহীত পুঁথিপত্র দেখে বোঝা যায়, তার সঙ্গে তাঁর গভীর

Dhaka University Institutional Repository

যোগ ছিল অন্তরের, এবং তার প্রতি তাঁর কৌতূহলও ছিল অসীম। ...ইংলন্ডে বা ইয়োরোপে প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষা, জনশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মডেল স্কুল, স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সমসাময়িক কালের বই তাঁর সংগ্রহে আছে। অকারণে অর্থ ব্যয় করে তিনি নিশ্চয় সেগুলি সংগ্রহ করেননি। ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে গেলেও, আজও এইসব বইয়ের 'মার্জিনে' তাঁর হাতে-লেখা 'নোট' ও চিহ্নাদি দেখে বোঝা যায়, কত আগ্রহ নিয়ে এগুলি তিনি পড়তেন (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৪০৩-০৪)। কেবল গ্রন্থপাঠ নয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, বেথুন বালিকা বিদ্যালয়—ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংলগ্নতা-সূত্রে অনেক ইংরেজ শিক্ষাব্রতীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছে। অনেক বিদেশির কাছ থেকেও বিদ্যাসাগর শিক্ষাদর্শের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণা লাভ করেছেন এবং ক্রমে বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কারের কাজে অনেকটা উৎসাহিত হয়েছেন।

সমাজসংস্কারের মতো শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর ছিলেন অনেক বেশি নির্ভীক ও দুঃসাহসী। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়েও, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের ভ্রান্তি, সারশূন্যতা, কুসংস্কার এবং অপ্রয়োজনীয়তা নির্দেশে তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত হননি। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে, সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী ও বিধিব্যবস্থা সংস্কারের জন্য যে বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষাসংসদে দাখিল করেন, এবং কলেজের অধ্যক্ষতাকালে ১৮৫৩ সালে বারানসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মি. ব্যালান্টাইনের কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন শেষে রিপোর্টের উত্তরে যে সমালোচনা সংসদে পাঠান, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা অনুধাবনে তা অতি জরুরি এবং যুগান্তকারী দুটি দলিল হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। এই দুটি দলিল থেকে আধুনিক শিক্ষাচিন্তক হিসেবে বিদ্যাসাগরের ভাবনার অনেক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা যাবে।

১৮৫০ সালের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজপণ্ডিতের চাকরি নিয়ে মুর্শিদাবাদ চলে গেলে পদটি খালি হয়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির শিক্ষা সংসদের তৎকালীন সেক্রেটারি মি. ময়েট ওই শূন্যপদে বিদ্যাসাগরকে নিয়োগ দানের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। শিক্ষাসংস্কার চিন্তায় ছিল বলে বিদ্যাসাগর প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। তিনি জানতেন ক্ষমতা, অধিকার এবং পদমর্যাদা না থাকলে শিক্ষাসংস্কার করা সম্ভব নয়। তাই সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে যোগদানে তাঁর অনিচ্ছা। ময়েট পুনরায় তাঁকে অনুরোধ করলেন। এবার বিদ্যাসাগর শর্তসাপেক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক পদে যোগদানে সম্মত হলেন। বিদ্যাসাগরের শর্তটি ছিল এই—যদি সংস্কৃত কলেজ তাকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয় তাহলে আপাতত সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে তিনি যোগদান করতে পারেন। ময়েটের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে বিদ্যাসাগর

সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের ১২ দিনের মাথায় ১৬ই ডিসেম্বর শিক্ষা সংসদের অনুরোধে বিদ্যাসাগর নতুন একটি শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ১৮৪৬ সালের পরিকল্পনার সঙ্গে নতুন এই পরিকল্পনা বিষয়ে ও ভাবনায় সাদৃশ্যপূর্ণ, দুটি পরিকল্পনার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিতেও মিল রয়েছে। কলেজের শৃঙ্খলা, নিয়ম-কানুন, ভর্তি প্রক্রিয়া, পাঠক্রম—ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের নানামাত্রিক ভাবনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিকল্পনাটি ইতিবাচক বিবেচনা করে শিক্ষা সংসদ বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের সর্বময় কর্তৃত্ব দেন। এসময় সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষা সংসদ সরকারকে এইকথা জানান :

> বাবু রসময় দত্ত গত দশ বছর ধরে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত আছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর কোনো জ্ঞান নেই বললেই চলে। ... নানারকমের অব্যবস্থার ফলে কলেজের অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হয়ে উঠেছে, কাজকর্মের ক্ষতিও হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তাতে এই অবস্থার আশু প্রতিকার না করলে সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। ... বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগের ফলে কলেজ পুনর্গঠনের প্রধান অন্তরায় দূর হল বলে মনে হয়। ক্যালকাটা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ড. স্প্রেঙ্গার আরবী ভাষায় যেমন পণ্ডিত, সেরকম সংস্কৃতের পণ্ডিত কোনো ইয়োরোপীয় যোগ্য ব্যক্তি কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষাসংসদ মনে করেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। একদিকে তিনি যেমন ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃতেও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য। শুধু তাই নয়,তাঁর মতো উদ্‌যোগী, কর্মতৎপর, বলিষ্ঠচিত্ত ব্যক্তি বাঙালীর মধ্যে দুর্লভ। তাঁর রচিত ‘ বেতাল পঞ্চবিংশতি’ ও ‘চেম্বার্সের বায়োগ্রাফি’র বাংলা অনুবাদ সমস্ত স্কুল-কলেজে বাংলার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হয়। তিনি যদি কলেজের অধ্যক্ষ হন তাহলে বর্তমানের সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ উঠিয়ে নেওয়া হবে। দুই পদের বেতন এখন মোট ১৫০্ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০্ টাকা দিলেই চলবে। সুতরাং পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোনো খরচ বাড়বে না। (উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৭২)

শিক্ষা সংসদের সুপারিশ ও প্রস্তাব সরকার মঞ্জুর করলে মাসিক ১৫০্ টাকা বেতনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারি। এবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে শিক্ষা সংস্কারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিদ্যাসাগর। ১৮৫২ সালের ১১ই এপ্রিল ‘Notes’ on the Sanskrit College’ শিরোনামে বিদ্যাসাগর তাঁর সামগ্রিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের নানা প্রসঙ্গ চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। ২৬টি অনুচ্ছেদে বিদ্যাসাগর উপস্থাপন করেন তাঁর মূল ভাবনা[১] :

১. বাংলাদেশে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

Dhaka University Institutional Repository

২. যাঁরা ইয়োরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সক্ষম নন, এবং সেগুলিকে ভাবগম্ভীর, প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

৩. যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না। সেইজন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে সুশিক্ষার প্রয়োজন।

৪. অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, যাঁরা কেবল ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী,তারা সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। তাঁরা এত বেশি ইংরেজিভাবাপন্ন যে তাঁদের যদি অবসর সময়ে খানিকটা সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলেও তাঁরা শত চেষ্টা করেও, পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোনো ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫. তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।

৬. পরের প্রশ্ন হল, এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে ?

৭. সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণে ও সাহিত্যে খুব ভালভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সাহিত্যের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য সবই থাকবে।

৮. অলংকারশাস্ত্রে তাদের দু'একখানি ভাল বই পড়ালেই চলবে, যেমন 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের দু'একটি অধ্যায়।

৯. ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্র পাঠ করলে ছাত্রদের সংস্কৃত-বিদ্যার ভিত্ দৃঢ় হবে।

১০. স্মৃতিশাস্ত্রে এইগুলি পাঠ্য হতে পারে : মনুস্মৃতি, মিতাক্ষরা—দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা। এই শাস্ত্রগুলি পাঠ করলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

১১. বর্তমানে গণিতশাস্ত্রের পাঠ্য হল লীলাবতী ও বীজগণিত। গণিতবিজ্ঞানের পক্ষে এই দু'খানি বই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এমন এক পদ্ধতিতে বই দু'খানি রচিত, প্রচলিত ছড়া আর্যা ইত্যাদির সাহায্যে, যে আসল বিষয়বস্তু এক একটি প্রহেলিকা হয়ে উঠেছে। সহজ বিষয় সরল করে না বলার জন্য ছাত্রদের অনেক বেশি সময় লাগে এই বিদ্যা আয়ত্ত করতে। প্রায় তিন চার বছর ধরে তাদের বই দু'খানি পড়তে হয়। বইয়ের মধ্যে দৃষ্টান্ত না থাকার জন্য অনেক 'সমস্যা' ছাত্রদের বোধগম্য হয় না। আসল কথা হল, সংস্কৃত-গণিত ছাত্রদের পড়ানোর কোনো সার্থকতা নেই, কারণ এতে ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শ্রম অপব্যয় হয়। সেই সময়ে তারা অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় পড়তে পারে।

১২. সেইজন্য সংস্কৃতে গণিতশিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১৩. এ থেকে একথা বুঝলে ভুল হবে যে আমি শিক্ষার ব্যাপারে গণিতবিদ্যার যথাযথ গুরুত্ব দিই না। তা আদৌ ঠিক নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে সংস্কৃতের বদলে ইংরেজির মাধ্যমে গণিতবিদ্যার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ তাতে ছাত্ররা অর্ধেক সময়ে দ্বিগুণ শিখতে পারবে।

১৪. হিন্দু-দর্শনের ছয়টি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় আছে, —ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা। ন্যায়দর্শনে প্রধানত তর্কবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, এবং মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ রসায়ন, আলোকবিদ্যা ও বলবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পতঞ্জল ও মীমাংসা সম্বন্ধেও প্রায় ওই একই কথা বলা যায়। মীমাংসায় উৎসবপার্বণের এবং পতঞ্জলে ঈশ্বরচিন্তা হল বিষয়বস্তু।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. কলেজপাঠ্য হিসেবে এইসব বিষয় প্রয়োজনীয় কিনা, সে সম্বন্ধে ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৫০, আমি আমার রিপোর্টে যে মত ব্যক্ত করেছি আজও তাই সমর্থন করি।

১৬. এ কথা ঠিক যে হিন্দু-দর্শনের অনেক মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না, কিন্তু তা হলেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত। ছাত্ররা যখন দর্শনশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে, তার আগে ইংরেজি ভাষায় তারা যে জ্ঞান অর্জন করবে তাতে ইয়োরোপের আধুনিক দর্শনবিদ্যা পাঠ করারও সুবিধা হবে তাদের। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দুই দর্শনেই সম্যক জ্ঞান থাকলে এদেশের পণ্ডিতদের পক্ষে আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে। সমস্ত রকম মতামতের দর্শন ছাত্রদের পড়তে বলার উদ্দেশ্য হল, সেগুলি পড়লে তারা দেখতে পাবে কিভাবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করেছে এবং এক দর্শনের পণ্ডিত ভিন্ন দর্শনের ভুলভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতা খণ্ডন করেছেন। সুতরাং আমার ধারণা, সর্বমতের দর্শন পাঠ করবার সুযোগ দিলে ছাত্রদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে, দুই দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কোথায় তাও তারা বুঝতে পারবে।

১৭. এই শিক্ষার আর-একটি সুবিধা হল এই যে পাশ্চাত্য দর্শনের ভাবধারা আমাদের বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (Technical word) জানা দরকার, তা পণ্ডিতদের আয়ত্তে থাকবে।

১৮. এ-সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে থাকার প্রয়োজন নেই। ছাত্ররা যদি এইগুলি পড়ে তাহলেই যথেষ্ট হবে : ন্যায়দর্শন—গৌতমসূত্র ও কুসুমাঞ্জলি ; বৈশেষিক-দর্শন—কণাদের সূত্র ; সাংখ্যদর্শন—কপিলের সূত্র এবং কৌমুদী ; পতঞ্জল দর্শন—পতঞ্জলের সূত্র ; বেদান্তদর্শন—বেদান্তসার এবং ব্যাসের সূত্র—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ; মীমাংসাদর্শন—জৈমিনির সূত্র। এগুলি ছাড়া ছাত্ররা 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' পড়বে, কারণ তার মধ্যে সমস্ত দর্শনের সারকথা পাওয়া যাবে।

১৯. সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ব্যাকরণ ও সাহিত্যশ্রেণীতে পড়বার সময় তিনভাগের দুইভাগ সময় সংস্কৃতের জন্য ও একভাগ সময় ইংরেজির জন্য দেওয়া উচিত। অলংকার, স্মৃতি ও দর্শনশ্রেণীতে পড়ার সময় ইংরেজির জন্য দেওয়া উচিত। অলংকার, স্মৃতি ও দর্শনশ্রেণীতে পড়ার সময় তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয় হবে ইংরেজি। অর্থাৎ তিনভাগের দু'ভাগ সময় ইংরেজি বিদ্যার জন্য নিয়োগ করা উচিত।

২০. বর্তমানে সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সাহিত্য, অলংকার, গণিত, স্মৃতি, দর্শন ও সংস্কৃত গদ্যরচনা—এই বিষয়গুলি আছে। এগুলি এইভাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে ; সাহিত্য ও অলংকার যেমন আছে তেমনি থাকবে। সংস্কৃত-গণিত ও সংস্কৃত গদ্যরচনা বাদ দিতে হবে এবং তার বদলে ইতিহাস, গণিত ও প্রাকৃতিক দর্শন ইংরেজিতে পড়াতে হবে এবং সেইটাই হবে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার বিষয়। দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রও বৃত্তিপরীক্ষার বিষয় হবে, এবং প্রতি বছরে একটি করে বিষয় নির্বাচন করা হবে।

২১. দু'জন শিক্ষক নিয়ে বর্তমানে যে ইংরেজি বিভাগ আছে, তা দিয়ে এই ধরনের শিক্ষা সংস্কার করা অসম্ভব। তা ছাড়া বর্তমান শিক্ষকরা গণিতে এবং বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী নন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সংস্কৃত কলেজে এই ধরনের শিক্ষক দিয়ে কোনো কাজ হবে না। তাঁদের যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে, যেখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানে বদলি করে দেওয়া যায়, তা হলে ভাল হয়।

২২. এ বিভাগটি সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করতে হবে, চারজন শিক্ষক দিয়ে, যথাক্রমে ১০০ টাকা, ৯০ টাকা, ৬০ টাকা এবং ৫০ টাকা বেতনে। এই বেতন দিলে ভাল শিক্ষক পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থা করতে হলে ইংরেজি বিভাগের জন্য মাসে ৩০০ টাকা খরচ করা প্রয়োজন।

২৩. সংস্কৃত-গণিতশ্রেণী তুলে দিলে দু'জন শিক্ষক মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে ইংরেজি বিভাগের জন্য পাওয়া যাবে। বাকি যে পঞ্চাশ টাকা মাসে লাগবে তা কলেজের বাৎসরিক গ্রান্ট ২৪০০০ টাকা, যা থেকে এখন ১৯০০০ টাকার কিছু বেশি খরচ হয়, তাই সেখান থেকেই নেওয়া যেতে পারবে।

২৪. যদি শিক্ষার খাতের তহবিল থেকে এই অতিরিক্ত ব্যয় এখন মঞ্জুর করা সম্ভব না হয়, তা হলে অন্য কোনো উপায়ে এই ব্যয় সংকুলানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে দু'জন 'রাইটার' আছে কলেজে, একজন বাংলার জন্য, একজন নাগরির জন্য। প্রত্যেকের বেতন মাসিক ১৬ টাকা। যে-সব পাণ্ডুলিপি তারা কপি করে তা অপ্রয়োজনীয়। সাধারণত পাণ্ডুলিপিগুলিতে ভুল থাকে যথেষ্ট এবং যতবার সেগুলি কপি করা হয় ততবার ভুল ও ছাড় দ্বিগুণ হতে থাকে। সুতরাং কপিস্টের দ্বারা লিখিত পাণ্ডুলিপি আর একবার কপিস্টকে দিয়ে লেখাবার ফলে প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তা ছাড়া যে দু'জন কপিস্ট সংস্কৃত কলেজে আছে, তারা মাসে পাঁচ-ছয় টাকার মতো কপি করে, অথচ মাসে ৩২ টাকা করে বেতন পায়। এই কপিস্ট দু'জনকে বরখাস্ত করা উচিত এবং তাদের বেতনের ৩২ টাকা অন্য ভাল কাজে লাগানো উচিত। ইংরেজি বিভাগের জন্য মাসিক ৮ টাকা করে একটি জুনিয়র বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। যদি ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়, তা হলে ইংরেজি বিভাগের জন্য আলাদা করে ৮ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করার দরকার হবে না। দু'জন কপিস্টের ৩২ টাকা এবং বৃত্তির ৮ টাকা যোগ করলে মাসে ৪০ টাকা হতে পারে। আগে যে ৫০ টাকা ঘাটতি পড়ছিল তা থেকে এইভাবে ৪০ টাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুতরাং বাকি থাকে আর ১০ টাকা মাত্র এবং এই ১০ টাকা কলেজের তহবিল থেকে নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে।

২৫. ১৮৫০ সালে আমি যখন এই প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগ দেই তখন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে আমার মতামত আমি একটি রিপোর্টে শিক্ষাসংসদের কাছে জানাই। তারপর কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমি আমার আগেকার মতামত কিছু কিছু অদল-বদল করার প্রয়োজনবোধ করেছি। এর থেকে বোঝা যাবে কেন আমার এই পরিকল্পনার সঙ্গে আগেকার পরিকল্পনার খানিকটা তফাত আছে।

২৬. আমার ধারণা, যে সমস্ত বিষয় সংস্কারের কথা আমি এখানে বলেছি, সেগুলি কার্যকর না হলে সংস্কৃত কলেজের কোনো প্রকৃত উন্নতি হবার সম্ভাবনা নেই, এবং তার আসল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করাও অসম্ভব। (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৭৩-৭৬)

বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষা-সংস্কার নোটস নানা করণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদানের অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, এবং অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদানের তিন মাসের মধ্যে যে নোটস পাঠিয়েছেন—সর্বত্রই একজন শিক্ষাদার্শনিক হিসেবে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের উপর্যুক্ত পরিকল্পনাদ্বয় থেকে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে শনাক্ত করা যায় :

১. মাতৃভাষা বাংলা বিষয়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন বিশেষভাবে আগ্রহী। তিনি বিশ্বাস করতেন মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করতে না পারলে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়।

২. মাতৃভাষার পাশাপাশি অন্য ভাষা আয়ত্ত করার কথাও বলেছেন বিদ্যাসাগর। এক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি। অন্যদিকে বাংলা ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের সহায়তা নেবার কথাও বলেছেন তিনি।

৩. কলেজের পাঠক্রম সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ভাবনা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে বিদ্যাসাগরের গভীর চিন্তার পরিচয় পরিকল্পনাদ্বয়ে বিধৃত। কোন বই পাঠ্য করতে হবে, কোন বই বাদ দিতে হবে—এ বিষয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যা তিনি নোট্‌সে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন।

৪. পরিকল্পিত শিক্ষা সংস্কারের জন্য বিদ্যাসাগর যোগ্য শিক্ষকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর সময়ে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকদের মান সম্পর্কে মন্তব্য করতেও বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হননি। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষা সংস্কার হলে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকদের পাণ্ডিত্য ও দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

৫. কলেজের এবং সরকারের অর্থ বিষয়েও তাঁর চিন্তা পরিকল্পনায় বিধৃত হয়েছে। অপ্রয়োজনে অর্থ ব্যয়ে তিনি উৎসাহী ছিলেন না। বরং তিনি সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহারের কথা বলেছেন তাঁর পরিকল্পনায়।

বিদ্যাসাগরের এই নোটস থেকে তাঁর শিক্ষাদর্শনের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রধান কথাটিই হল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই জন্যই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মাতৃভাষাকে তিনি জীবনের যপ-তপ ও পরম সম্পদ বলেই মনে করতেন। শৈশবেই শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা ভালোভাবে চর্চার কথা বলেছেন তিনি। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জানতে হলে ইংরেজি ভাষা জানার কোনো বিকল্প নেই। এ কারণেই মাতৃভাষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের তিনি ইংরেজি ভাষা শেখানোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার কথা বলেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার আদর্শ সমন্বয়ের কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। এই ভাবনা বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের এই মৌলিক শিক্ষাচিন্তার পরিচয় দিতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন :

> দেশীয় ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির চর্চা এবং শিক্ষার মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয়ের ওপর একটা কার্যকরী দখল ব্যতীত যে বাঙালাদেশে কোনো সৃষ্টিশীল সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানের উদ্ভব হতে পারে না, বিদ্যাসাগর এই সত্যকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করে সেই সত্যের ওপর নিজের শিক্ষা-চিন্তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমন্বয়সাধন ব্যতীত একদিকে 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা' এবং অন্যদিকে নব্য ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 'শিশুসুলভ

> উচ্ছৃঙ্খলতার' কুপ্রভাব অতিক্রম করে শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে গতিশলীতা ও সৃজনশীলতা সৃষ্টি যে সম্ভব ছিলো না, সে-বিষয়ে বিদ্যাসাগর যথার্থভাবেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৯০ : ৪৭)

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বিদ্যাসাগর, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনি—তাই সংস্কৃত কলেজকেই তিনি নিজস্ব শিক্ষাদর্শ প্রয়োগের পরীক্ষাগার করেছেন তিনি। এই পরীক্ষায় কতকটা তিনি সার্থক হয়েছেন, পুরোপুরি হতে পারেননি—কারণ পদে-পদে তাঁকে বাধা আর বিরোধিতা অতিক্রম করে আগাতে-আগাতে একসময় উৎসাহও প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বাংলার তৎকালীন ছোটলাট হ্যালিডে ১৮৫২ সালের ৩০শে জুন বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সংস্কারের নোটস্ শিক্ষা সংসদে পাঠিয়ে দেন নিজস্ব অভিমতসহ। মন্তব্যে হ্যালিডে লেখেন : "The accompanying paper has been drawn up by the Principal of the Sanskrit College at my request. It is the result of several consultations I have held with the Principal and, I lay it before the Council as deserving, in my humble judgement, of very careful consideration." (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৭৭)। কিন্তু কাউন্সিল অব এডুকেশন বা শিক্ষা সংসদ বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাটি সরাসরি গ্রহণ না করে তা পর্যালোচনার জন্য পাঠিয়ে দেন বারানসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ জেমস আর. ব্যালান্টাইনের কাছে। ১৮৫৩ সালের আগস্ট মাসে ব্যালান্টাইন একজন পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন শেষে বিদ্যাসাগরের নোটসের উপর তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেন শিক্ষা সংসদের কাছে।[২]

শিক্ষা সংসদের সচিব এফ. আই. ময়েটের কাছে সংস্কৃত কলেজের সামগ্রিক অবস্থা ও পাঠক্রম সম্পর্কে ব্যালান্টাইন যে রিপোর্ট দেন, তার মূল বক্তব্য ছিল এইরকম—১. সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি দুইই পড়ানো হয় বটে কিন্তু বর্তমানে দুই ভাষার বিদ্যার মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য কোথায় তা সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা নিজেরাই ঠিক করে নেবে, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের এই ক্ষমতা সন্তোষজনক নয় ; ২. কলেজের নির্দিষ্ট কিছু পাঠ্য ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু বই পাঠ করতে হবে ; ৩. বিদ্যাসাগর-প্রস্তাবিত কিছু বিষয়ের সঙ্গে তিনি ভিন্নমতও প্রকাশ করেন। শিক্ষা সংসদ ব্যালান্টাইনের রিপোর্ট ১৯৫৩ সালের ২৯শে আগস্ট বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দেন। ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের কড়া সমালোচনা করে বিদ্যাসাগর নিজের অভিমত ১৮৫৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা সংসদের কাছে প্রেরণ করেন।[৩] এই রিপোর্ট থেকে বিদ্যাসাগরের বাস্তবনিষ্ঠ শিক্ষাচিন্তার অনেক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা সম্ভব। পাঠের বিস্তৃতি, বিষয়ের প্রতি সুগভীর মনোযোগ—ইত্যাদি বিষয় অনুধাবন করা যায় বিদ্যাসাগরের রিপোর্ট থেকে। ব্যালান্টাইনের অভিমত তিনি একে একে খণ্ডন করেছেন এবং নিজস্ব অভিমতে অনড় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগর যা লিখেছেন, তা সংক্ষেপে এভাবে উপস্থাপন করা যায় :

১. ব্যালান্টাইন সংস্কৃত কলেজের যেসব পাঠ্যপুস্তকের কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। Mill-এর লজিকের একটি সংক্ষিপ্তসার ব্যালান্টাইন রচনা করেছেন। সে-বইটিই তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যবই করার প্রস্তাব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর লেখেন : "... সংস্কৃত কলেজে Mill-এর বই পড়ানো একান্ত প্রয়োজন। মিলের বই খুবই মূল্যবান, মনে হয় ব্যালান্টাইন সেইজন্যই তা পড়তে বলেছেন। কিন্তু যে-জন্য তিনি তাঁর নিজের লেখা সংক্ষিপ্তসার পড়াতে বলেছেন তা ঠিক নয়। আমাদের কলেজের ছাত্রদের প্রামাণিক বই একটু বেশি দাম দিয়ে কিনে পড়ার অভ্যাস আছে। বেশি দাম বলে একখানি উৎকৃষ্ট বই পাঠ্য না করার কোনো যুক্তি নেই। ব্যালান্টাইন বলেছেন, মিলের লজিক খুব বড় বই, ছাত্রদের প্রথমে পড়তে অসুবিধা হবে, তাই তাঁর সংক্ষিপ্তসার মুখবন্ধ হিসেবে পাঠ্য হতে পারে। কিন্তু মিল নিজে তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখে গেছেন যে হোয়েট্‌লির তর্কবিদ্যা বিষয়ের বই তাঁর লজিকের সবচেয়ে ভাল উপক্রমণিকা" (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৭৭)। কাজেই ব্যালান্টাইনের বই পাঠ্য করার ঘোর বিরোধিতা করেন বিদ্যাসাগর।

২. ব্যালান্টাইন সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় প্রকার পাঠপদ্ধতির কারণে 'সত্য দ্বিবিধ' এমন ভুল ধারণার শিকার হতে পারে শিক্ষার্থীরা—এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, যে-ছাত্র সংস্কৃত ও ইংরেজি এই দুই ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছে এবং অনুধাবনের চেষ্টা করেছে—তার সম্পর্কে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশের কোনো কারণ নেই। তিনি মনে করেন, যে-ছাত্র সত্যিকার ধারণা একবার করতে পেরেছে তার কাছে সত্য সত্যই। সত্য দ্বিবিধ—এমন ধারণা অসম্পূর্ণ প্রত্যয়ের ফল। তিনি মনে করেন, সংস্কৃত কলেজে যে ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি চালু আছে, তাতে শিক্ষার্থীর চেতনায় ব্যালান্টাইন-কথিত ভুল ধারণা সৃষ্টির কোনো আশঙ্কা নেই।

৩. ডক্টর ব্যালান্টাইন চেয়েছিলেন ছাত্রদের সংস্কৃত এবং ইংরেজি উভয় ভাষা শিক্ষা দিয়ে একদল শিক্ষিত মানুষ সৃষ্টি করতে, যারা ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য বিষয়ে টীকাকারের কাজ করবে। এরা দুই সংস্কৃতির মিল ও অমিলের জায়গাগুলো শনাক্ত করবে। ব্যালান্টাইনের মতে, হিন্দুদের দার্শনিক আলোচনা যেসব মৌলিক সত্যে পৌঁছেছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখিয়ে উভয়ের সমন্বয়ের পথ খুলে দেবে। বিদ্যাসাগর এই ধরনের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। তিনি মনে করেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সর্বত্র মিল দেখানো সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের মতে, আধুনিক ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য ভারতীয় মানুষের কাছে সমাদরযোগ্য করা রীতিমতো কঠিন। তাদের কুসংস্কারগুলো বহুকালের সঞ্চিত ও দৃঢ়মূল। সেগুলো নির্মূল করা সহজ কাজ নয়। ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশ্বাস—যে ঋষিদের মস্তিষ্ক থেকে শাস্ত্রসমূহ বেরিয়েছে তাঁরা সর্বজ্ঞ, অতএব তাঁদের রচিত শাস্ত্রবচন অভ্রান্ত। তাঁরা

পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মান্য করবে না, বরং হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবে। কাজেই ব্যালান্টাইন যে সমন্বয়ের কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা আশা করা যায় না।

৪. বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করেছেন বাঙালি ছেলেরা শিক্ষালাভে খুবই আগ্রহী। কাজেই ব্যালান্টাইনের ধারণা অনুযায়ী পণ্ডিতদের তোষামোদ করে সংস্কৃত কলেজে রাখা জরুরি মতের সঙ্গে বিদ্যাসাগর একমত হতে পারেননি। বিদ্যাসাগর বলেছেন, দেশীয় পণ্ডিতের মর্যাদা প্রায় লোপ পেয়েছে। তাঁদের সাহচর্য না পেলেও সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কারের কাজ চলবে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজটাই জরুরি—পণ্ডিতদের দিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকথা শুনিয়ে যুগের দাবি পূরণ করা যাবে না। এখন বেশি প্রয়োজন দেশের সর্বত্র বাংলা স্কুল স্থাপন, সেখানে পণ্ডিতদের বলতে গেলে কোনোও প্রয়োজন নেই। বরং এইসব স্কুলের জন্য শিক্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা এখন অনেক বেশি জরুরি। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতরা এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারবেন না বলেই বিদ্যাসাগর মনে করেন। তাই সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিতদের তোষামোদ করে চলার নীতি-বিষয়ক ব্যালান্টাইন-তত্ত্বের ঘোর বিরোধিতা করেছেন বিদ্যাসাগর।

৫. মাতৃভাষা বাংলা পঠন-পাঠনের উপর বিশেষ জোর দেন বিদ্যাসাগর। তিনি সমগ্র বাংলাদেশে অনেক বাংলা স্কুল স্থাপনের কথা বলেছেন, যা মেকলে এবং ব্যালান্টাইনের ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির একান্তই বিপরীত। বাংলা স্কুলের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দেশীয় শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। শিক্ষকের তিনটি গুণের কথা বলেছেন তিনি। এই গুণত্রয় হল—ক. শিক্ষক হবেন মাতৃভাষায় সুপণ্ডিত ও সুশিক্ষিত, খ. বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে, এবং গ. প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাস থেকে তাঁকে সর্বাংশে থাকতে হবে মুক্ত। বিদ্যাসাগর লিখেছেন—এই তিন ধরনের গুণসম্পন্ন শিক্ষক গড়ে তোলাই তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য এবং সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কারের প্রধান বিষয় হিসেবে এটাকেই তিনি বিশেষ উদ্যম দিয়ে সার্থকতামণ্ডিত করে তুলতে চান। স্বপ্নের সেই শিক্ষকের কথা বলেই বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্ট শেষ করেছেন এভাবে :

> In conclusion I beg most respectfully to state that if I may be so fortunate as to be permitted to carry out the system introduced, I can assure the Council with great confidence that the Sanskrit College will become a seat of pure and profound Sanskrit learning and at the same time a nurssery of improved vernacular literature, and of teachers throughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen. (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৬৭৫)

ডক্টর ব্যালেন্টাইন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রিপোর্টদ্বয় পর্যালোচনা করে শিক্ষা সংসদ মন্তব্য করেন[৪] : "ড. ব্যালেন্টাইন সংস্কৃত কলেজের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও উন্নতি সম্বন্ধে এমন সব আশাপ্রদ

Dhaka University Institutional Repository

অভিমত প্রকাশ করেছেন যা দেখে আমরা সত্যই আনন্দিত হয়েছি। কলেজের অধ্যক্ষের জ্ঞাতার্থে আমরা জানাচ্ছি যে তিনি বর্তমানের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকুন। তবে এই শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করবে অনেকটা তাঁর নিজের চেষ্টার উপর। যে-সব শিক্ষক ইংরেজিতে এবং সংস্কৃতেও, দর্শনশাস্ত্রের মতো উচ্চ বিষয় পড়াবেন, তাঁদেরও যদি যথেষ্ট যোগ্যতা না থাকে তাহলে এ-শিক্ষার সফলতার সম্ভাবনা কম। অধ্যক্ষের নিজের উদ্‌যোগ ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সংসদের গভীর বিশ্বাস আছে, এবং তাঁরা আশা করেন তিনি ড. ব্যালান্টাইনের লেখা বইগুলি শিক্ষার কাজে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করার জন্য কুণ্ঠিত হবেন না। তাঁর নিজের শিক্ষার কাজে এবং তাঁর অন্যান্য শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যাপারে ব্যালান্টাইনের বইগুলি খুবই কাজের হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ব্যালান্টাইনের বইগুলি পাঠ করে ছাত্ররা যে উপকৃত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অধ্যক্ষ মহাশয় ড. ব্যালান্টাইনের সঙ্গে তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের লেখাপড়ার উন্নতি সম্পর্কে চিঠিপত্র লিখে ভাবের আদানপ্রদান করবেন। সংসদের একান্ত ইচ্ছা, বারানসী ও কলকাতার এই দুটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মতামতের আদানপ্রদান হোক এবং তার ফলে উভয়ের ক্রমোন্নতি হোক। ইংরেজি থেকে সংস্কৃতে এবং সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে দার্শনিক বিষয় অনুবাদ করার সময় শব্দনির্বাচন ও প্রয়োগ যাতে নির্ভুল ও ভাবসম্মত হয় সেদিকে উভয়কেই নজর দিতে হবে" (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৮০-১৮১)। শিক্ষা সংসদের এই মন্তব্যে বিদ্যাসাগর স্বভাবতই বিচলিত, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর বিবেচনায় মনে হল সংসদ ইউরোপীয় পণ্ডিত ড. ব্যালান্টাইনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন এবং তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি কিছুটা হলেও অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৩ সালের ৫ই অক্টোবর শিক্ষা সংসদের সেক্রেটারি এফ. জে. ময়েটের কাছে চিঠি পাঠিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন। চিঠিতে বিদ্যাসাগর লেখেন :

> ড. ব্যালান্টাইনের রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষা সংসদের নির্দেশ আমি ধীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছি, যদি এই নির্দেশগুলি আমাকে বর্ণে-বর্ণে পালন করতে হয়, তা হলে সংসদের সম্মতিক্রমে সম্প্রতি আমি নিজের যে পাঠ্যসূচি কলেজে চালু করেছি, তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে বলে আমার ধারণা। তার ফলে কলেজে আমার নিজের মর্যাদাই যে ক্ষুণ্ন হবে তা নয়, আমার শিক্ষার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতাও অনেকখানি কমে যাবে। ...আমার বক্তব্য হল, আমাদের সংস্কৃতশিক্ষা দিতে দিন, প্রধানত বাংলাভাষার উন্নতির জন্য। তার সঙ্গে ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করার সুযোগ দিন। এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি যে সংসদের উৎসাহ ও সমর্থন থাকলে, আমি কয়েক বছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি করে দিতে পারব, যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিদ্যার প্রসারে, আপনাদের প্রাচ্য-বিদ্যার অথবা শুধু ইংরেজি-বিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে, অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে—আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম উদ্দেশ্য —আমাকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, কোনো রকম

Dhaka University Institutional Repository

> হস্তক্ষেপ করা চলবে না (রূঢ় কথার জন্য মার্জনা করবেন)। ড. ব্যালান্টাইনের যে-সব বই বা সারগ্রন্থ আমি ভালো বিবেচনা করব, Novum Organum গ্রন্থের চমৎকার ইংরেজি সংস্করণ, তা আমি নিশ্চয়ই সাগ্রহে বিদ্যালয়ে পাঠ্য করব। কিন্তু তাঁর সংকলন বা রচনা পাঠ্য হওয়ার যোগ্য কিনা, বিশেষ করে আমার অনুসৃত শিক্ষানীতির সঙ্গে সেগুলি খাপ খাওয়ানো সম্ভব হবে কিনা, তা বিচার করার এবং বিচারান্তে সাব্যস্ত করার সম্পূর্ণ অধিকার কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে আমার থাকবে। তা যদি না থাকে তা হলে আমার অধ্যক্ষতার প্রয়োজন কি? এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি অনুযায়ী চললে আমার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হবে না। (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৮১-৮২)

ড. ময়েটকে লেখা বিদ্যাসাগরের এই চিঠির মধ্যেও ধরা পড়েছে তাঁর স্বকীয় শিক্ষানীতির পরিচয়। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর যে-সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যে পাঠক্রম রচনা করেছেন—সর্বত্রই তার মূল দর্শন সমন্বয়, পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে ভারতবিদ্যার সমন্বয়। শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার প্রধান লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষা বাংলার উন্নতি। এ ব্যাপারে কোনো আপস তিনি করেননি। ড. ব্যালান্টাইনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের এটাই প্রধান কারণ। সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিরা এ কাজে যোগ্য—এমন আস্থা ছিল না বিদ্যাসাগরের। তিনি বরং মনে করতেন সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী না হলে কারও পক্ষে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কোনো কূপমণ্ডূকতা বা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বিদ্যাসাগর। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের জ্ঞানবিদ্যাকে তিনি গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন, যদি তা দেশীয় শিক্ষার্থীদের প্রকৃত উন্নতিতে সহায়তা করে। এ উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত কলেজকে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয়তীর্থরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দুই ভিন্নধর্মী বিদ্যার মধ্যে ভেজাল দিয়ে তিনি একটি কিম্ভূতকিমাকার পাণ্ডিত্যের পিণ্ড পাকিয়ে বাঙালি শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে চাননি। ব্যালান্টাইনের প্রস্তাব সেরকমই ছিল বলে তা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি এবং গ্রহণ করার পক্ষে সংসদের যুক্তি ও অনুরোধ দুইই অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৮৩)। শিক্ষা সম্পর্কে নিজস্ব দর্শন ছিল বলেই বিদ্যাসাগর ব্যালান্টাইন ও শিক্ষা সংসদের প্রস্তাব ও যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরেরই জয় হল। শিক্ষা সংসদ বিদ্যাসাগরকে স্বাধীনভবে কাজ করার অনুমতি দিয়ে তাঁর সংস্কারপ্রস্তাব ও কারিক্যুলামকেই স্বীকার করে নিয়েছে।

বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে চলতে চেয়েছেন, ভোগ করতে চেয়েছেন সর্বময় ক্ষমতা। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক নিয়োগেও তিনি নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষক নির্বাচন করেছেন। ১৮৫৭ সালে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, গণিতের অধ্যাপক মোহিনীমোহন রায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুনিয়র শিক্ষক তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নচন্দ্র রায়—এই চারজনের চাকরি বিদ্যাসাগর নিজের পছন্দ অনুযায়ী প্রদান করেছিলেন। এ-বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের পরিচালক গর্ডন ইয়ঙের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতবিরোধ এবং

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-বিনিময় হয়েছে। নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর গর্ডন ইয়ঙের নির্দেশ মানতে রাজি হননি। সংস্কৃত কলেজের উন্নতির জন্য এবং স্বীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর পছন্দ অনুযায়ী যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন—একথা জানানোর পর গর্ডন ইয়ঙ বিদ্যাসাগরকে লেখেন—"আমি স্বীকার করছি যে আপনি যে-সব লোক বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে 'যোগ্য' ব্যক্তি, কিন্তু তার জন্য একথা মানতে আমি রাজি নই যে তাঁরাই 'যোগ্যতম' ব্যক্তি। কর্মখালির বিজ্ঞাপন না দিলে কোনো পদে 'যোগ্যতম' ব্যক্তি নিয়োগ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। আপনি এই পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করেননি বলে সত্যিই আমি দুঃখিত। তবে তার জন্য আমি আপনার উপর কোনো দোষারোপ করি না। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এখনও এই পদ্ধতিতে কাজ করতে কেন সম্মত নন। আপনি যখন এই নিয়মের ঘোর বিরোধী এবং নিয়ম মেনে চললে আপনার কাজকর্মের অসুবিধা হবে জানিয়েছেন, তখন এই বিষয়ে আর কোনো অপ্রীতিকর তর্কবিতর্ক না করে আমি আপনার সিদ্ধান্তই মেনে নেব ঠিক করেছি এবং চাকরির ব্যাপারে আপনার পাত্র-নির্বাচনও অনুমোদন করব। এবারেও তাই করলাম" (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৮৪)। প্রচলিত নিয়ম মেনে চললে গর্ডন ইয়ঙের অভিমতকেই গ্রাহ্য করতে হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর পরিকল্পিত শিক্ষা-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিজের পছন্দকেই সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছেন, চলতে চেয়েছেন একান্ত স্বাধীনভাবে। অভিন্ন সময়ে সীপাহি বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলে সরকার সংস্কৃত কলেজে ইংরেজ সৈন্যদের থাকার নির্দেশ দেয়। উপায়ান্তর না পেয়ে ভাড়া বাড়িতে চলে যান বিদ্যাসাগর, কিন্তু মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি সরকারের এই আচরণ। সংস্কৃত কলেজকে সরকারি সেনাবিভাগের কুক্ষিগত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন বিদ্যাসাগর। এসব বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগের চিঠি দেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৮ সালের ৫ই আগস্টে লেখা বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সরকার ১৮৫৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তাঁর পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে থেকে বিদ্যাসাগর যেভাবে শিক্ষা পরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন, ঔপনিবেশিক সরকারের অসহযোগিতার কারণে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় ছিল গভীর চিন্তার ছাপ। সেই পরিকল্পনায় বাধা দেওয়া তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি, তাই পদত্যাগে তিনি বাধ্য হয়েছেন। ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৮—এই বারো বছরের মধ্যে দীর্ঘ নয় বছর কলেজ পরিচালনা, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ, পাঠক্রম তৈরিসহ শিক্ষার নানা বিষয়ে বিদ্যাসাগর নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে নানামাত্রিক কাজের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের ব্যতিক্রমী শিক্ষাদর্শের বহুমাত্রিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত কলেজে বিভিন্ন পদে থাকাকালীন বিদ্যাসাগরের চারটি পরিকল্পনার মধ্যে তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল আদর্শটি সম্যক প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা চতুষ্টয় হল—সহকারী সম্পাদক হিসেবে একটি, সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

একটি, অধ্যক্ষতার সময়ে হ্যালিডের কাছে একটি, এবং ব্যালান্টাইনের অভিমত খণ্ডন প্রসঙ্গে একটি। এইসব পরিকল্পনায় শিক্ষাদর্শের যে মূলসুরটি প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তার এবং উন্নত বাংলা ভাষার মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিদ্যাসাগর সংস্কৃতবিদ্যা ও ইংরেজিবিদ্যা, প্রাচ্যবিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিদ্যা—দুয়েরই আন্তরিক চর্চার উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই আদর্শই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেবল সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে নয়, বাংলার সর্বত্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যাসাগর তাঁর এই শিক্ষাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাচিন্তায় বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চার এমন প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন যাতে আধুনিক তথা বিজ্ঞানমনস্ক বাঙালির সৃষ্টি হয়। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল রক্ষণশীল সনাতনপন্থী পণ্ডিতদের মতামতকে বাদ দিয়ে নতুন মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষিত বাঙালি গড়ে তোলা, যারা হবে আধুনিক বাঙালি (আব্দুল মালেক, ২০১২ : ৮৪)। ড. ব্যালান্টাইনের রিপোর্টের উপর নিজস্ব অভিমত উপস্থাপন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "এদেশের পণ্ডিতদের কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। তাঁদের তোষণ করারও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, কারণ তাঁদের কোনো সাহচর্য না পেলেও আমাদের শিক্ষা সংস্কারের কাজ চলবে। আজ এই সব দেশীয় পণ্ডিতদের মর্যাদাও প্রায় লোপ পেয়েছে। কাজেই তাঁদের ভয় করার কোনো কারণ দেখি না। পণ্ডিতদের কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। মনে হয় না, তাঁরা তাঁদের আগেকার প্রতাপ-প্রতিপত্তি আবার ফিরে পাবেন। বাংলাদেশে যেখানেই শিক্ষা বিস্তার হচ্ছে, সেইখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বাঙালিরা শিক্ষালাভের জন্য খুবই আগ্রহশীল। এদেশের পণ্ডিতদের মন যুগিয়ে না চলেও আমরা কি করতে পারি, তা দেশের নানা জায়গায় স্কুল-কলেজ স্থাপন করে আমরা শিখেছি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার আমাদের প্রথম প্রয়োজন।" (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৮০)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি খুবই গুরত্বপূর্ণ। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকেই তিনি প্রথম কাজ বলে বিবেচনা করতেন। কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন বিদ্যাসাগর নারীর প্রতি সহমর্মিতাবশত তাদের সামান্য শিক্ষা দিতে চেয়েছেন—এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু উদ্ধৃত অভিমত সে-কথা প্রমাণ করে না। সমগ্র সমাজকে, নারী-পুরুষ সকলকেই তিনি শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই ছিল তাঁর জীবনের 'প্রিয়তম কাজ'। সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার মানসে জনসাধারণের মধ্যে তিনি শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষাচিন্তক হিসেবে এখানেই বিদ্যাসাগরের বিশিষ্টতা যে তিনি শুধু জনশিক্ষা বিস্তারের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, কীভাবে তা বাস্তবায়ন সম্ভব তার উপায়ের কথাও ব্যক্ত করেছেন (আব্দুল মালেক, ২০১২ : ৮৫)। শিক্ষার পদ্ধতি এবং উপায় নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

> আমাদের কতকগুলি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করতে হবে। এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ে কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে, এমন একদল লোক তৈরি করতে হবে, তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষকদের এসব গুণ থাকবে—তাঁরা নিজেদের ভাষায় সুশিক্ষিত হবেন, বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবেন এবং দেশের প্রচলিত কুসংস্কার থেকে যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকবেন, এ ধরনের এক শ্রেণীর শিক্ষক গড়ে তোলাই আমার জীবনের লক্ষ্য এবং সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে আমি আমার সমস্ত উদ্যম এই উদ্দেশ্যে পারিচালিত করতে চাই। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা তাদের লেখাপড়ার কাজ শেষ করবার পর, আমার বিশ্বাস এই যে, বাংলা ভাষার আদর্শ শিক্ষক হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। ...আশার কথা, সম্প্রতি তাদের চিন্তাধারার এমন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি যে, আমার ধারণা অদূর ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক সুশিক্ষিত ছাত্র দেশবাসীর প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে। ...এমন একদল ভবিষ্যতের শিক্ষক তৈরি হবে এখান থেকে, যাঁরা এদেশের জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের পথ সুগম করবেন। (উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৮০)

—উদ্ধৃতাংশের শেষ বাক্যের ‘দেশের’ এবং ‘জনসাধারণের’ শব্দদ্বয় বিশেষ গুরত্ববহ। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন সমগ্র দেশের মানুষ শিক্ষা লাভ করুক, মাতৃভাষায় তারা বিদ্যাচর্চা করুক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের সমন্বয়ে তারা আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে নবজন্ম লাভ করুক। সে-কালের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের এই ভাবনা প্রকৃত প্রস্তাবেই ছিল বিপ্লবাত্মক। কেননা, সে-সময়ে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেই জনশিক্ষা নিয়ে বিদ্যাসাগরের মতো কেউ ভাবেননি। অথচ কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটা সমাজ-প্রতিবেশে বসে তিনি সে-কথাই ভেবেছেন এবং তা বাস্তবায়নে নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে জনশিক্ষা প্রসারের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁর প্রায়োগিক মনোবৃত্তি (practical impulses) ও সৃজনশীল চিন্তার (creative thinking) স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। কেউ তাঁর শ্রেণিচরিত্রের সীমাবদ্ধতা এবং কৃষক-স্বার্থ বিমুখতার কথা বলেছেন (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৯০ :৪০), কেউ কেবল নারীর প্রতি সহানুভূতির কথা বলেছেন (চিত্তরঞ্জন কানদার, ১৯৯৭ : ৫৮), কেউ-বা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর নিস্পৃহতা আর নিরবতার কথা বলেছেন (সুকোমল সেন, ১৯৯৩ : ২৩২-৩৩) —কিন্তু আজ বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষের শুভার্থী মুহূর্তে দাঁড়িয়ে জনশিক্ষা বিষয়ে তাঁর ভাবনার অবিস্মরণীয় প্রাগ্রসরতার কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। বিশেষ কোনো অঞ্চল নয়, একটা ‘মডেল পরিকল্পনা’ নিয়ে তিনি সমগ্র বাংলাদেশেই তাঁর শিক্ষাদর্শ ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য গবেষকের এই বিশ্লেষণ :

> এমন অভিযোগ উঠতে পারে যে, বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের একটা বিশেষ এলাকাকে কেন্দ্র করেই তাঁর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। বস্তুত বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ধারা সৃষ্টি করাই ছিল

Dhaka University Institutional Repository

> বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাটা ছিল একটা ‘মডেল পরিকল্পনা’। এই মডেলকে ভিত্তি করে একদিন গোটা বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ধারা বিস্তার লাভ করবে এটাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি যে একটা সুষ্ঠু ও সুস্থ প্রাতিষ্ঠানিক ধারার রূপরেখা প্রণয়ন করে গিয়েছিলেন, তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল বাঙালি সমাজে চোখ বুলালে পরিদৃষ্ট হয়। (আব্দুল মালেক, ২০১২ : ৯২)

এই প্রধান শিক্ষাদর্শ ছাড়াও সংস্কৃত কলেজে আরও কিছু কাজের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার ভিন্নধর্মী অনেক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা যায়। শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বিদ্যাসাগর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য-সচেতন করার চেষ্টা করতেন। সংস্কৃত কলেজের একটি বৃহৎ হল ঘরে বিদ্যাসাগর শিক্ষকদের জন্য কুস্তির ব্যবস্থা করেন। অনেক শিক্ষকই প্রত্যূষে কলেজে এসে কুস্তিতে অংশগ্রহণ করতেন। শিক্ষকদের তিনি শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে বলতেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ১৮৪৫-১৮৫১ কালপর্বে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের (১৮২২-১৯০৩) পুত্র হরিশচন্দ্র কবিরত্নের স্মৃতিচারণ : “সংস্কৃত কলেজের ঈশানকোণে একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলানো ছিল। ঐ ঘণ্টা বাজিলে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইত। ঐ ঘণ্টাগৃহের পূর্বদিকে একটি মালীর ঘর ছিল। ঐ ঘরে অধ্যাপক মহাশয়গণ বিশ্রাম করিতেন ও কেহ কেহ তামাক খাইতেন। ঐ গৃহের পূর্ব্বদিকে আর একটি বৃহৎ ‘হল’ ঘর ছিল। ঐটিতে ‘পণ্ডিতগণ’ কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম করিতেন। আমি ‘পণ্ডিতগণ’ বলিলাম, তাহার কারণ, ঊর্দ্ধতন অধ্যাপক মহাশয় চতুষ্টয় অর্থাৎ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভারতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ কুস্তির আড্ডায় যোগ দিতেন না। অপেক্ষাকৃত বয়ঃনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং তারাশঙ্কর তর্করত্ন—এই কয়েকজন কুস্তির আড্ডায় যোগ দিতেন। আমার মনে পড়ে, আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিতাম, পিতৃদেব [গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন] ধূলি-ধূসরিত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কলেজ হইতে আসিতেন, তিনি কত প্রত্যূষে উঠিয়া যাইতেন তাহা আমরা জানিতে পারিতাম না। এই ব্যায়ামকার্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থাপিত করেন এবং এ কার্য্যে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল। এই ব্যায়াম করাতে পণ্ডিত মহাশয়গণ সকলেই খুব সুস্থশরীর ছিলেন এবং প্রায় রোগে পড়িতেন না” (হরিশচন্দ্র কবিরত্ন, ১৯২৫)।

শিক্ষক হিসেবে বিদ্যাসাগর পঠন-পাঠনের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছেন। তাঁর পূর্বে সংস্কৃত কলেজে সপ্তাহে ছুটির দিন বলে কিছু ছিল না। কেবল সংস্কৃত কলেজ নয়, এই তথ্য তখনকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই সত্য। বিদ্যাসাগরই প্রথম রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। ক্রমে সংস্কৃত কলেজের দেখাদেখি বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে নির্ধারিত হল। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও বিদ্যাসাগর কখনো ব্রাহ্মণ্য গর্বে

নিজেকে আচ্ছন্ন করেননি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশাধিকার ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগরের কাছে এই ব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্ট এবং অমানবিক বলে মনে হল। হিন্দুর চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা বা জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের কোনো সমর্থন ছিল না। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য বর্ণ বা অন্য ধর্মের শিক্ষার্থী ভর্তি না করানোর অর্থ তাঁর কাছে মানুষের অধিকারে আঘাত করার নামান্তর বলে মনে হয়েছে। সংস্কৃত কলেজে তিনি যে-কোনো বর্ণের শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ করে দিলেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শে মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রীবন্ধনের বাসনার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁর হাত দিয়েই সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির সংকীর্ণতাদুষ্ট নিয়ম পরিবর্তিত হল এবং কলেজের দ্বার সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য উন্মুক্ত হল।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সুসম্পর্কের কথা বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায়শই বলতেন। বস্তুত, বিদ্যাসাগর তাঁর স্বকীয় শিক্ষাদর্শ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মাঝেও প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। একথা সুবিদিত যে, ছাত্রদের তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন, দরিদ্র ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। শিক্ষার্থীকে তিনি কখনোই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন না, বরং বিবেচনা করতেন 'মানুষ' হিসেবে। শিক্ষার্থীর প্রতি দুর্ব্যবহার না করার জন্য তিনি সকল শিক্ষককে নির্দেশ দিয়েছেন। সেকালে, এবং উত্তরকালেও বটে, অধিকাংশ শিক্ষক বেত্রদণ্ড হাতে ক্লাসে যেতেন এবং কারণে-অকারণে শিক্ষার্থীকে প্রহার করতেন। ছাত্রেরা শিক্ষককে যমের মতো ভয় করত। ছাত্র-শিক্ষকের এই সম্পর্ককে বিদ্যাসাগর পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে-ওঠে যদি স্মরণ করা যায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের এই বিবরণ :

> তদানীন্তন গুরুমশায়দের যেরূপ বিগর্হিত আচরণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়। তাহাদের পাঠশালায় বালবুদ্ধিসুলভ কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না এবং কোন নীতিগর্ভ মিষ্টি গল্প বালকের কর্ণগোচর হইত না। কেবল ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সর্বাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরুমহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত।... কোন বিষয় ছাত্রের বোধগম্য করিয়া দিবার জন্য গুরুমহাশয় কোমল ভাব অবলম্বন করিতেন না। বালক শিক্ষা বিষয় বুঝিতে না পারিলে তাহার প্রতি নানাবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন এবং কখন কখন তাহার সুকুমার শরীরে প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ... ছাত্রেরা গুরুমহাশয়কে যম স্বরূপ জ্ঞান করিত। (কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, ১৯৭৮ : ৫৭)

—সমকালের এই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বকীয় জীবনদৃষ্টির আলোকে মানবিক এবং দায়িত্বশীল সম্পর্কে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শে শিক্ষার্থীরা মানুষের মর্যাদা পেত, গণ্য হত না অপাংক্তেয় কোনো তুচ্ছ জীব বলে। বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

"ছাত্ররা যাতে শিক্ষকদের যম না ভাবে এবং শিক্ষকরাও যাতে ছাত্রদের অসহায় জীব না ভাবেন, মানুষ বলে মনে করেন, সেদিকে তাঁর (বিদ্যাসাগর) সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ছাত্রদের আত্মমর্যাদায় আঘাত দিতে পারে, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত করতে পারে, এরকম কোনো শাস্তি বা নিষ্ঠুর আচরণের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। দীর্ঘকালের অভ্যাস শিক্ষকরা সহজে ছাড়তে পারবেন না জেনে, তিনি তাঁর নিজের বিদ্যালয় Metropolitan Institution-এর (শ্যামপুর শাখার) শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন ছাত্রদের প্রতি কোনো অপমানকর ব্যবহার না করা হয়, অথবা তাদের কোনোরকম দৈহিক দণ্ড না দেওয়া হয়। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে একবার ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একটি ছাত্রকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। সেই খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ হেঁটে বিদ্যালয়ে চলে যান এবং সমস্ত ব্যাপার অনুসন্ধান করে, প্রধান শিক্ষককে পদচ্যুত করেন। প্রতিবেশী ও অন্যান্য শিক্ষকরা তাঁকে সামান্য ব্যাপারে এতটা উত্তেজিত না হতে অনুরোধ করেন। কয়েকজন শিক্ষক প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর বিচলিত না হয়ে তাঁদেরও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন" (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৪০৯-১০)। সে-কালে কেন, বর্তমান কালের বিচারেও বিদ্যাসাগরের এই সৃজনশীল মানবতাবাদী চিন্তা এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর মানবতাবাদী শিক্ষাদর্শের ফলেই এটি সম্ভবপর হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষার বীজ প্রথম রোপিত হয়। তাঁর পূর্বে বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষার ধারণাই কারো মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে তিনি যথার্থই পথিকৃৎ। গোপাল হালদার লিখেছেন : "শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দানের প্রধান রূপ আমরা দেখেছি—শিক্ষাদর্শ নির্ণয়ে, শিক্ষানীতি প্রণয়নে এবং শিক্ষা-প্রণালীতে। সমগ্রভাবে দেখলে বুঝি—প্রথম জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ও রূপ বিদ্যাসাগরই নির্দেশ করেন" (গোপাল হালদার, ১৯৯৪ : ৩৫১)। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই বিদ্যাসাগর জাতীয় শিক্ষার কনটেন্ট বা প্রাণবস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছেন। কর্ম-উদ্যোগে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, পুরুষকারে জীবনকে সার্থকতামণ্ডিত করার মধ্যেই বিদ্যাসাগর খুঁজে পেয়েছেন আধুনিকতা। বিদ্যাসাগরের জাতীয় শিক্ষার মূলনীতি ছিল জাতীয় ভাষা বাংলা ও বাংলা সাহিত্যের সম্যক উন্নয়ন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এভাবে উন্নত করতে চেয়েছেন, যাতে তা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ বাহন হয়ে উঠতে পারে। আধুনিক জ্ঞান আহরণ করতে হবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য থেকে, কেননা ইংরেজি ভাষাতেই পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-উৎস। অন্যদিকে, বিদ্যাসাগর জাতীয় শিক্ষার জন্য সবল, স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ও বিষয়ানুগ বাংলা রচনারীতি আয়ত্ত করার কথা বলেছেন ; আর তা আয়ত্ত করতে হবে সংস্কৃত ভাষার সহায়তায়। বিদ্যাসাগরের মতে এই তিন ভাষাই জাতীয় শিক্ষার জন্য জরুরি তাই শিক্ষণীয়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিত হয়েও তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যত দ্রুত বাংলা ভাষা নিজস্ব শক্তির উপর দাঁড়াতে পারবে, হ্রাস পাবে সংস্কৃত ভাষা-নির্ভরতা—ততই

Dhaka University Institutional Repository

তা জাতীয় শিক্ষার জন্য মঙ্গলজনক। তবে ইংরেজির প্রয়োজনীয়তা কখনোই কমবে না—একথা স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন বিদ্যাসাগর। আজ থেকে সার্ধশত বছর পূর্বে জ্ঞানার্জনের জন্য 'ত্রিভাষা নীতি'র যে বীজ ঈশ্বরচন্দ্র রোপণ করেছিলেন, সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীকে শারীরিক শাস্তির বিষয়টাকে সমর্থন করা হয় না। বিদ্যাসাগরের সময়ে স্কুলে শিক্ষার্থীকে শারীরিকভাবে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। তখন 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ' এবং 'spare the rod and spoil the child' নীতিই এদেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধানতম শিক্ষা-উপায় বলে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীর শারীরিক শাস্তিকে বিদ্যাসাগর কখনোই সমর্থন করেননি। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবেই একরূপ ছিল (আব্দুল মালেক, ২০১২ : ৯৬)। তিনি মনে করতেন, শাস্তির মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীর মনে ভয় বাসা বাঁধে—ফলে সে যা শেখে তা ভয়ে শেখে, জানার আকর্ষণে শেখে না। ওই শিক্ষা সুদূরপ্রসারী কোনো ভূমিকা পালন করে না। তাই তিনি শিক্ষার্থীকে আদর-স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। পড়ালেখায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের তিনি নানা ধরনের উপহার দিতেন। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় এবং স্ব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তিনি নিয়মিতই নানা উপহার ও পুরস্কার দিতেন। *বর্ণপরিচয়* প্রথম ভাগের চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ পাঠ পর্যন্ত শিক্ষকগণের উদ্দেশ্যে আদর-স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে শিক্ষার্থীকে পাঠদানের কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। এভাবে বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তাকে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যায়। প্রসঙ্গত আমাদের মনে রাখা দরকার, বিদ্যাসাগরের এইসব ভাবনা আজ থেকে একশ' সত্তর-আশি বছর পূর্বের।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে পাঠ্যগ্রন্থে শিক্ষক নির্দেশিকা (teacher's guide) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসঙ্গ। বিদ্যাসাগর তাঁর বিভিন্ন পাঠ্যগ্রন্থের ভূমিকা বা মুখবন্ধে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশিকার উল্লেখ করেছেন। নর্মাল স্কুলের ক্লাসেও তিনি এ সম্পর্কে কথা বলতেন। কত আগে বিদ্যাসাগর আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের এই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাবনায় নিয়ে এসেছিলেন। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য গবেষকরে এই অভিমত :

> আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষক-নির্দেশিকার (teacher's-guide) বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কোন পাঠ্যপুস্তক বা সেই পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ কোন পাঠ কি কি সাধারণ উদ্দেশ্য (general objectives) এবং বিশেষ উদ্দেশ্য (special objectives) সামনে রেখে পড়ানো হচ্ছে তা শিক্ষকদের জানা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে এক্ষেত্রে শিক্ষণ-শিখনের (teaching-learning) সার্বিক উদ্দেশ্য বিফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এসব উদ্দেশ্যাবলী জানা থাকার সাথে সাথে এগুলো সাধনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কেও শিক্ষকের জানা থাকতে হবে। আগে থেকে এসব বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দান করাই হল শিক্ষক-নির্দেশিকার কাজ। বিদ্যাসাগরও যে এসব বিষয়ে সচেতন ছিলেন তা *বর্ণপরিচয়*-দ্বিতীয় ভাগ-এর বিজ্ঞাপন (মুখবন্ধ) থেকে বুঝা যায়। (আব্দুল মালেক, ২০১২ : ৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাকে বিদ্যাসাগর মানুষের জীবনে জাগতিক উন্নতির কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের অধিকারী হতে পারে। তাঁর মতে শিক্ষা কেবল মানসিক-সাংস্কৃতিক চেতনায় মানুষকে ঋদ্ধ করে না, শিক্ষা মানুষকে আর্থিকভাবেও সফলতা এনে দেয়। শিক্ষাচিন্তায় এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যাসাগরের প্রাগ্রসর সমাজদৃষ্টিকেই নির্দেশ করে। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে অর্থনৈতিক ভাবনা কীভাবে বিমণ্ডিত হয়ে গেছে, সে-বিষয়ে অশোক সেন বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন (Asok Sen, 2016)।

জাতীয় শিক্ষার জন্য ভাষানীতির প্রয়োজনীয়তা এই উপমহাদেশে প্রথম অনুভব করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জাতীয় শিক্ষার রূপ কী, বাহন কী, বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার ভাষানীতি কী—এসব বিষয় বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে তিনিই প্রথম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসকদের নানামাত্রিক স্বার্থচেতনা, বিরোধিতা এবং অসহযোগিতার কারণে বিদ্যাসাগরের জাতীয় শিক্ষার এই ভাষিক তত্ত্ব গৃহীত হয়নি। সরকারের সহযোগিতা এবং আর্থিক সহায়তা ছাড়া বিদ্যাসাগরের এই নীতি বাস্তবায়নেরও কোনো সুযোগ ছিল না। বৃহৎ একটি সম্ভাবনা, বলতে গেলে অঙ্কুরেই, বিনষ্ট হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরের এই স্বকীয় শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গোপাল হালদার লিখেছেন : "জাতীয় শিক্ষার রূপ কী, বাহন কী, বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার ভাষানীতি কী—বিদ্যাসাগরই তা বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে প্রথম ব্যাখ্যা করেন। সেদিন যদি বাঙলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করে আমরা এই ত্রিভাষিক শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম, তাহলে জাতীয় জীবনে ও শিক্ষাজীবনে একালের ভাষাবিভ্রাটের অভিশাপ ও তর্কের কুজ্ঝটিকা থেকে অব্যাহতি পেতাম" (গোপাল হালদার, ১৯৯৪ : ৩৫১-৫২)।

বিদ্যাসাগরের সমকালীন বাংলার সমাজে মাতৃভাষার চর্চা যে খুব ব্যাপক ছিল, তা বলার কোনো অবকাশ নেই। ব্যক্ত হয়েছে যে, যে পরিকল্পনা হতে পারতো জনশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক, ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরূপ দৃষ্টির কারণে তা সফল হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে ভিন্ন একটি অনুষঙ্গ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৮৫৫ সালে ছোট লাট হ্যালিডে বাংলা শিক্ষাকে সারা বাংলায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ হ্যালিডে উৎসাহভরে গ্রহণ করেন এবং আশান্বিত হয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু নতুন মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এক কাজে হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের প্রভূত সহায়তা লাভ করেন। বিদ্যাসাগরের নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও উৎসাহে মুগ্ধ হয়ে এই নতুন মডেল স্কুলগুলো পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের দায়িত্ব হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের উপর অর্পণ করেন। ১৮৫৬ সালে দক্ষিণ বাংলার স্পেশাল স্কুল ইন্সপেক্টর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর আওতাভুক্ত প্রতিটি জেলায় পাঁচটি করে মডেল স্কুল স্থাপন করেন। গ্রামবাসীরাই এসব স্কুলের ভবন নির্মাণ করে দিত এবং স্কুলের ব্যয়ভার

গ্রামীণ মানুষের আর্থিক অনুদানেই নির্বাহ হত। এসব স্কুলে শিক্ষার্থী আকর্ষণের জন্য প্রথম ছয় মাস কোনো বেতন নেওয়া হয়নি। ছয় মাস পরে স্কুলের অবস্থা বুঝে ক্ষেত্রবিশেষে বেতন নেওয়া হত। এই মডেল স্কুলগুলোর মূল উদ্দেশ্য এবং বিদ্যাসাগরের সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে ১৮৫৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি হ্যালিডে তাঁর রিপোর্টে লেখেন :

> বাংলাদেশে অসংখ্য দেশী পাঠশালা আছে। এদেশের ও বিদেশের দুই শ্রেণীর লোকের কাছে অনুসন্ধান করে আমি জেনেছি, পাঠশালাগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ যাঁরা সেখানে শিক্ষা দেন তাঁরা অধিকাংশই অতি অযোগ্য ব্যক্তি। এই পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতিসাধন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্বতন ছোটলাট (টোমাসন) এ বিষয়ে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, আমাদেরও তাই অনুসরণ করা উচিত। এমন কতকগুলি মডেল স্কুল স্থাপন করা উচিত যা এই সব পাঠশালার কাছে আদর্শস্থানীয় হবে। নিয়মতি যদি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে এই মডেল স্কুলগুলির শিক্ষাব্যবস্থা দেখে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা যাতে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদেরও উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে পারেন তার সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে।...
>
> এই বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অভিমত এই সঙ্গে পাঠালাম। সকলেই জানেন, বাংলাশিক্ষা প্রচারকার্যে বিদ্যাসাগর বহুদিন থেকেই বিশেষ উৎসাহী। সংস্কৃত কলেজে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী অনেক প্রাথমিক পাঠ্যবই রচনা করে তিনি এক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন, আমি তা মোটামুটিভাবে অনুমোদন করি। আমার ইচ্ছা, তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই কাজে পরিণত করা হোক।...
>
> সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, তাঁদের সকলের মত এই যে, সরকারি মডেল স্কুলে প্রথমদিকে প্রবেশ-দক্ষিণা কিছু না থাকাই উচিত। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়ের মতো মডেল স্কুলগুলিও নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করতে পারবে। ...
>
> শিক্ষকদের শিক্ষণ-বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য নর্মাল স্কুলের প্রয়োজনের কথা কিছু বলিনি। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার ফলে এখন বেশ ভাল ভাল শিক্ষক গড়ে উঠছে। বর্তমান অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে সংস্কৃত কলেজই নর্মাল স্কুলের স্থান অধিকার করেছে। (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২০১-০২)

নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ছোটলাট হ্যালিডের একান্ত ইচ্ছায় ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন চার্লস উডের সম্মতিতে ১৮৫৫ সালের ১লা মে থেকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণ বাংলার মডেল বিদ্যালয়ের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত এই কাজের জন্য বিদ্যাসাগরকে মাসিক ২০০ টাকা সম্মানী দেওয়া হত। সহকারী পরিদর্শক পদে নিযুক্তিলাভের পরেই বিদ্যাসাগর চারজন সাব-ইন্‌স্পেক্টর নিয়োগ দিলেন। স্থান-নির্বাচন, স্কুলগৃহ নির্মাণ, শিক্ষার্থী সংগ্রহ এসব কাজের দায়িত্ব দিয়ে বিদ্যাসাগর চারজন সাব-ইন্‌স্পেক্টরকে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। বিদ্যাসাগরের প্রধান

কাজ ছিল মডেল স্কুলগুলোর জন্য যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন এবং সার্বিক তত্ত্বাবধান। বিদ্যাসাগর ভালো করেই জানতেন যে, প্রকৃত গুণী এবং নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষক পাওয়া না গেলে মডেল স্কুলগুলোতে বাংলা শিক্ষার সমস্ত পরিকল্পনা ও উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সেকালে বাংলার সুযোগ্য শিক্ষক পাওয়া প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার ছিল। মডেল স্কুলে বাংলার শিক্ষক নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি যেভাবে চাচ্ছেন, তেমন যোগ্য কেউকে পাচ্ছেন না। তখন তিনি শিক্ষকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ স্কুল বা নর্মাল স্কুল স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করতে থাকেন। ১৮৫৫ সালের ২রা জুলাই একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের জন্য ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন চার্লস উডের কাছে একটি চিঠি লেখেন বিদ্যাসাগর। উডের কাছে তিনি নর্মাল স্কুল সম্পর্কে লেখেন : "নর্মাল স্কুল হলে, আমার ইচ্ছা, *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার সর্বজনখ্যাত সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত তার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রথমশ্রেণীর বাংলা-লেখক খুব অল্পই আছেন। যে দু'-একজন উৎকৃষ্ট লেখক আছেন, অক্ষয়কুমার তাঁদের অন্যতম। ইংরেজিতে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে, এবং সাধারণজ্ঞানের তথ্যাদিও তাঁর আয়ত্তে। শিক্ষকতার কাজেও তিনি দক্ষ। আমার ধারণা, তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি বর্তমানে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ... দ্বিতীয় শিক্ষক হিসেবে আমি পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নাম উল্লেখ করছি" (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২০৮)। বিদ্যাসাগরের এই চিঠি পেয়ে বাংলা সরকার এবং ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অনুমোদন করেন এবং ১৮৫৫ সালের ১৭ই জুলাই বিদ্যাসাগরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কলকাতায় একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। এভাবে সংস্কৃত কলেজ, নর্মাল স্কুল, চারটি জেলায় মডেল স্কুল ও হিন্দু কলেজের পাঠশালা শাখা—এই চারটি বিষয়ের ভার একসঙ্গে পড়ল বিদ্যাসাগরের উপর। ভারত সরকারের নির্দেশে এসময় তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার নাম হল—দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়ের স্পেশাল ইনস্পেক্টর। এসময় তিনি সমস্ত উদ্যম নিয়ে শিক্ষা সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা শিক্ষার জন্য কাজ আরম্ভ হবার তিন বছর পর বিদ্যাসাগর এই স্কুলগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি ও অবদানের কথা এভাবে প্রকাশ করেন :

> বাংলাদেশের মডেল-স্কুলগুলি প্রায় তিন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলের বেশ আশাপ্রদ উন্নতি হয়েছে। ছাত্ররা সব বাংলা পাঠ্যপুস্তক পাঠ করেছে। বাংলাভাষায় তাদের বেশ দখল দেখেছি। প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে তারা বেশ জ্ঞানলাভ করেছে। যখন এই কাজ আরম্ভ করা হয় তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে গ্রামের লোকেরা মডেল-স্কুলের মর্ম বুঝতে পারবে না। কিন্তু স্কুলের সাফল্য সেই সন্দেহ দূর করেছে। যেসব গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেইসব গ্রামের ও তার আশপাশের গ্রামবাসীরা স্কুলগুলিকে আশীর্বাদ বলে মনে করে, এবং তার জন্য তারা সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। স্কুলগুলির যে যথেষ্ট সমাদর হয়েছে, ছাত্রসংখ্যা দেখলে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২০৯)

Dhaka University Institutional Repository

মডেল স্কুল ও নর্মাল স্কুলের মাধ্যমে বাংলা শিক্ষার বিদ্যালয়কেন্দ্রিক প্রয়াসকে বিদ্যাসাগর কলকাতা শহরের সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেকালের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের এই ভাবনা ও প্রয়াস কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। ১৮৫৮ সালের সীপাহি বিদ্রোহের ফলে এইসব স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। তবু গ্রামাঞ্চলে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করে বিদ্যাসাগর এক ঐতিহাসিক প্রয়াসের সূত্রপাত করেছিলেন। কোনো-কোনো সমালোচক একে জনশিক্ষার উদ্যোগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেউ আবার জনশিক্ষার এই উদ্যোগ ব্যর্থ হবার কারণ সন্ধান করেছেন বিদ্যাসাগরের শ্রেণিচরিত্রে :

> মডেল স্কুলের সাফল্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নিজের রিপোর্ট থেকেই বোঝা যায়, সেকালেও বাঙলাদেশে জনশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ একেবারে ব্যর্থ হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার ছিলো না। সেই উদ্যোগের দ্বারা শতকরা একশো জনের অক্ষর পরিচয় অথবা শিক্ষা না হলেও জনশিক্ষা যে তার দ্বারা অপেক্ষাকৃত সম্প্রসারিত হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু ইংরেজ সরকার যে অর্থ শিক্ষাখাতে তখন ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিলো সে অর্থকে নিম্নশ্রেণীভুক্ত জনগণের শিক্ষার ব্যাপারে ব্যয় করতে দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সুস্পষ্টভাবেই সেই বিরোধিতা করেছিলেন। সেই বিরোধিতার মাধ্যমে তাঁর বাস্তবজ্ঞান অপেক্ষা তাঁর নিজস্ব শ্রেণী-চেতনাই যে অধিকতর প্রকটিত হয়েছিলো সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৯০ : ৪০-৪১)

মডেল স্কুল এবং নর্মাল স্কুলের জনশিক্ষা প্রসারে সম্ভাবনা সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিচারে এগুলো সফলতা লাভ করতে পারেনি। সেকালে জনশিক্ষা প্রসারের বাস্তবতা অনুধাবনের সময় পাননি বিদ্যাসাগর। হ্যালিডের অনুরোধে খুব দ্রুততার সাথে এসব কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। বিনয় ঘোষ এদিকে ইঙ্গিত করে যথার্থই বলেছেন : "প্রকৃত জনশিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যে তিনি এই মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তা মনে হয় না। কারণ গণতান্ত্রিক অর্থে জনশিক্ষার কথা তিনি চিন্তা করার অবকাশ পাননি। গ্রামাঞ্চলে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-কায়েস্থের সন্তানরা কিছু লেখাপড়া শিখুক, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তা ছাড়া, বৃহৎ বাংলাদেশে সামান্য কয়েকটি মডেল স্কুল যে বাস্তবিক কোনো শিক্ষার প্রসারের পথ উন্মুক্ত করতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য" (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২১০)। গবেষক-সমালোচকরা যা-ই বলুন, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তায় সর্বপ্রথম জনশিক্ষার যে ধারণা আভাসিত হয়েছিল, তা অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। তিনি যে আন্তরিকভাবে জনশিক্ষার বিস্তার চাননি একথা বলার কি কোনো অবকাশ আছে, যখন আমরা পাঠ করি তাঁর এই মনোভাব :

> বাঙলাদেশে যেখানে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে সেখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে, বাঙলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র! ... জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—এই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাঙলা স্কুল স্থাপন করতে হবে, এইসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও

Dhaka University Institutional Repository

> শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করতে পারে এমন একদল কর্মী সৃষ্টি করতে হবে—তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তি—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরনের দরকারী লোক গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য—আমার সংকল্প। এর জন্য আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হবে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা কলেজের পাঠ শেষ করে এই ধরনের লোক হয়ে উঠবে—এমন আশা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। (উদ্ধৃত : গোপাল হালদার, ১৯৯৪ : ৩৪৮)

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ছোটলাট ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডের কাছে প্রেরিত মডেল স্কুল বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। ১৮৫৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি হ্যালিডের কাছে প্রেরিত বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনায় আন্তরিকতার অভাব কিংবা শ্রেণিচরিত্রের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় না। একশ' ছিষট্টি বছর আগে জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর উনিশ অনুচ্ছেদবিশিষ্ট এই পরিকল্পনা পেশ করেন :

১. বাংলাশিক্ষার বিস্তার ও সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। তা না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না।

২. কেবল লিখন-পঠন ও গণনা বা সরল অঙ্ক কষার মধ্যে বাংলাশিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যতদূর সম্ভব বাংলাভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে, এবং তার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

৩. প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে এই বইগুলি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তকরূপে গ্রহণযোগ্য :

 (ক) শিশুশিক্ষা-(পাঁচভাগ)। প্রথম তিনভাগে আছে—বর্ণপরিচয়, বানান ও পঠনশিক্ষা। চতুর্থভাগ—জ্ঞানোদয় বিষয়ে একখানি ছোট বই। পঞ্চমভাগ— চেম্বার্স এডুকেশনাল কোর্স-এর অন্তর্গত নীতিপাঠ পুস্তকের ভাবানুবাদ।

 (খ) পশ্বাবলী অর্থাৎ জীবজন্তুর প্রাকৃতিক বিবরণ।

 (গ) বাংলার ইতিহাস—মার্শম্যানের বইয়ের ভাবানুবাদ।

 (ঘ) চারুপাঠ, অথবা প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে পাঠশালা।

 (ঙ) জীবনচরিত— চেম্বার্স বায়োগ্রাফির অন্তর্গত কোপার্নিকস, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শেল, লিনিয়স, ডুবাল, উইলিয়ম জোন্স, টমাস জেঙ্কিন্স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর ভাবানুবাদ।

৪. পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা ও নীতিবিজ্ঞানের বইও লেখা হয়েছে। ভূগোল, রাজনীতি, শারীরবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জীবনচরিত এখনও রচনা করতে হবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম ও ইংলন্ডের ইতিহাস হলেই চলবে।

৫. একজন শিক্ষক হলে চলবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত দু'জন করে শিক্ষক দরকার। স্কুলগুলিতে সম্ভব হলে তিনটি থেকে পাঁচটি করে শ্রেণী থাকবে। কাজেই একজন শিক্ষক দ্বারা শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ চলবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৬. গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে পণ্ডিতদের বেতন কমপক্ষে তিরিশ, পঁচিশ অথবা কুড়ি টাকা হওয়া দরকার। আগেকার বইগুলি লেখা হলে যখন স্কুলের পাঠ্য হবে তখন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মাসিক অন্তত পঞ্চাশ টাকা বেতনে একজন করে হেডপণ্ডিত নিযুক্ত করতে হবে।

৭. কর্মস্থানেই শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে, অন্য কোনো স্থান থেকে বেতন আনতে হলে চলবে না।

৮. হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর—এই চারটি জেলা বর্তমানে আমাদের কাজের জন্য নির্বাচন করে নিতে হবে। উপস্থিত পঁচিশটি বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত বলে মনে হয়। চারটি জেলার মধ্যে, প্রয়োজন অনুসারে, এই বিদ্যালয়গুলি ভাগ করে দিতে হবে। নগর ও গ্রাম যেখানেই হোক, এই বিদ্যালয় যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে, দেখতে হবে তার কাছাকাছি যেন কোনো ইংরেজি স্কুল বা কলেজ না থাকে। ইংরেজি স্কুল ও কলেজের আশেপাশে বাংলাশিক্ষা যোগ্য সমাদর পাবে বলে মনে হয় না।

৯. বিদ্যালয়গুলি যদি সযত্নে তত্ত্বাবধান করা যায় এবং কৃতী ছাত্রদের যদি নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া যায়, তা হলে বাংলাশিক্ষার সাফল্য সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। কেবল বিদ্যার জন্যই বিদ্যা অর্জন করার মতো মনোভাব সাধারণ দেশবাসীর এখনও হয়নি। এইজন্য ছোটলাট হার্ডিঞ্জের প্রস্তাব (চাকরি), যা এতদিন চাপা ছিল, বিশেষভাবে কাজে লাগানো দরকার।

১০. বিদ্যালয় তত্ত্বাবধানের এই উপায়গুলি বিশেষ কার্যকর এবং অল্প ব্যয়সাধ্য হবে বলে মনে হয়।

১১. যাতায়াতের ব্যয় সমেত মাসিক ১৫০্ টাকা বেতনে দু'জন বাঙালী পরিদর্শক রাখা প্রয়োজন। একজন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য, আর একজন নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য। তাঁদের কাজ হবে ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা, স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং প্রয়োজনমতো শিক্ষাপ্রণালী সংস্কার করা।

১২. সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন। তার জন্য তাঁকে কোনো আলাদা পারিশ্রমিক দিতে হবে না। কেবল যাতায়াতের খরচ দিলেই চলবে। এর জন্য বছরে তিরিশ টাকার বেশি খরচ হবে বলে মনে হয় না। বছরে তিনি অন্তত একবার করে স্কুলগুলি পরিদর্শন করবেন এবং কর্তৃপক্ষকে একটি রিপোর্ট দেবেন। কর্তৃপক্ষের উপরেই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকবে।

১৩. গ্রন্থরচনা, পুস্তক ও শিক্ষক-নির্বাচনের ভার থাকবে প্রধান পরিদর্শকের উপর।

১৪. সংস্কৃত কলেজ সাধারণ-শিক্ষার কেন্দ্র হয়েও বাংলা-শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য নর্মাল স্কুলরূপেও কাজ করবে।

১৫. এইভাবে শিক্ষকদের শিক্ষাদান, শিক্ষক-নির্বাচন, পাঠ্যবই রচনা ও গ্রহণ এবং সাধারণ পরিদর্শনের ভার যদি একজন যোগ্য ব্যক্তির উপর দেওয়া হয়, তা হলে অনেক অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

১৬. প্রধান পরিদর্শকের একজন সহকারী, মাসিক অন্তত ১০০্ টাকা বেতনে নিযুক্ত করতে হবে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে তিনি শিক্ষক ট্রেনিং ও পাঠ্যবই রচনায় সাহায্য করবেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয় যখন স্কুল পরিদর্শনের কাজে বেরুবেন তখন তাঁর স্থানে তিনি অস্থায়ীভাবে কাজ করবেন।

১৭. বর্তমানে গুরুমহাশয়েরা এদেশের যে পাঠশালাগুলি চালাচ্ছেন সেগুলি কোনো কাজেরই নয়। যে-কাজে তাঁদের যোগ্যতা নেই, সেই কাজে তাঁদের নিযুক্ত করাতে পাঠশালাগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। পরিদর্শকের কাজ হবে এই সব পাঠশালা দেখাশুনা করা এবং শিক্ষণরীতি সম্বন্ধে তাঁদের উপদেশাদি নিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করা। আগে যে-সব পাঠ্যপুস্তকের কথা উল্লেখ করেছি, ক্রমে সেগুলিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য হবে। পাঠশালাগুলি যাতে আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গড়ে ওঠে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. এদেশের লোক বা বিদেশী মিশনারিদের স্থাপিত যে-সব ভাল স্কুল আছে, সেগুলিকেও সাহায্য করা ও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। কিভাবে তা করা যেতে পারে পরিদর্শকরা তা নিজেরা বিবেচনা করে ঠিক করবেন।

১৯. এইসব সরকারি স্কুলের আদর্শে শহরের ও গ্রামের অধিবাসীরা যাতে নিজেদের এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত হন, পরিদর্শকরা সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ১৯৯-২০১)

—উপর্যুক্ত পরিকল্পনা যে আন্তরিক বিশ্বাস নিয়েই বিদ্যাসাগর তৈরি করেছেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিদ্যাসাগরের সমগ্র প্রচেষ্টাকে কালের বিচারে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কলকাতা শহরের বাইরে দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি শিক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। সীপাহি বিদ্রোহের পরিস্থিতি সামাল দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনেক বেশি প্রাধান্য পেল, উপেক্ষিত হল বাংলার জনশিক্ষার প্রচেষ্টা। সীপাহিদের থাকার জন্য সংস্কৃত কলেজ দখলে বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ হন, শেষ পর্যন্ত দাখিল করলেন অধ্যক্ষ থেকে পদত্যাগ পত্র। ১৮৫৮ সারের ২৮শে সেপ্টেম্বর বাংলা সরকার বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং এর পাঁচদিন পর ৩রা নভেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। এসময় বিদ্যাসাগরের বয়স ৩৮ বছর, ভরা যৌবন—কিন্তু অতিরিক্ত কাজের চাপে তিনি বেশ অসুস্থ ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মডেল স্কুল পরিচালনায় যোগ্য সহায়তার অভাবে বিদ্যাসাগর নিস্পৃহ হয়ে পড়েন। সবকিছু মিলে যে পরিকল্পনা নিয়ে তিনি অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন, তা সফল হল না। তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা বলেও সমালোচককে অন্তিমে একথা বলতেই হয় : “পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শ্রেণীগত নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই শিক্ষা-সংস্কার প্রস্তাব ও প্রচেষ্টার মধ্যেই একদিকে তাঁর যথার্থ প্রগতিশীলতা এবং অন্যদিকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়” (বদরুদ্দীন উমর, ১৯৯০ : ৪৬)। অন্যদিকে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন : “... ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বাংলা মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, গ্রামাঞ্চলের সুদূর অভ্যন্তরে পর্যন্ত, বিদ্যাসাগর অন্তত শহর থেকে কিছু দূরে শিক্ষার বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই কৃতিত্বটুকু তাঁর কম নয়” (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২১০)। বিধবাবিবাহ প্রচলনকে বিদ্যাসাগর নিজের জীবনের ‘সর্বপ্রধান সৎকর্ম’ বলে মনে করতেন, কিন্তু শিক্ষাসংস্কারকে তিনি অভিহিত করেছেন নিজের জীবনের ‘প্রিয়তম উদ্দেশ্য’ বা ‘darling object’ বলে। তাই যা ‘প্রিয়তম উদ্দেশ্য’, সেখানে আন্তরিকতার অভাব ছিল এমন ভাবনার কোনো অবকাশ নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর কাল থেকে অগ্রবর্তী সময়ের মানুষ। তাঁর চিন্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সমাজমানস তখনো প্রস্তুত ছিল না। একথা তাঁর সমাজসংস্কার ভাবনার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য শিক্ষাসংস্কার ভাবনার ক্ষেত্রেও। তিনি যথার্থই বুঝেছিলেন জনশিক্ষা বা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সমাজ এখনও তৈরি হয়নি। কাজে আত্মনিয়োগ করার পরেই তাঁর উপলব্ধিতে এটা ধরা পড়ে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে মার্কসবাদী গবেষক গোপাল হালদার লিখেছেন ; “বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের মানুষ। উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের শ্রেণীগত দোষগুণের দ্বারা বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি কোথায় কতটা খর্বিত, সে-

Dhaka University Institutional Repository

কথা অবান্তর নয়। কিন্তু এই বিশেষ প্রসঙ্গে তা গৌণ। তিনি নিজে যা উল্লেখ করেছেন তা মোটামুটি যথেষ্ট—উনিশ শতকের ১৮৫৯-৬০ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়নি—ইংল্যান্ডেও না, যে ইংল্যান্ড ধনে-মানে তখন বুর্জোয়া সভ্যতার শীর্ষস্থানীয়। ভারতে বা বাঙলাদেশে ১৮৫৯-৬০ সালে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব তোলা তাই অবাস্তব—এখনো—১৯৭০-৭১ সালেও—স্বাধীন ভারতে যখন শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর। আর বিদ্যাসাগর কোনো অবাস্তব ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন না। শুধু বাস্তববাদী নন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রাক্‌টিকাল—কি শিক্ষায়, কি সমাজকর্মে, কি নীতিতে, কি কর্মপ্রণালীতে ; তেমন সম্ভাব্য কাজই তিনি বেছে নিতেন, নিজের কর্মপদ্ধতি ও প্রাক্‌টিক্যাল বুদ্ধি দ্বারা রূপায়িত করতেন। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ব্যাপারেও তাঁর সেই শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালীর বাস্তব কার্যোপযোগিতার পরীক্ষা হয়। শিক্ষাবিস্তারেও তিনি ছিলেন এরূপ প্রাক্‌টিক্যাল। দেশে শিক্ষা দ্রুত প্রসারিত করতে হলেও চাই বাঙলার মাধ্যমে প্রধান বিদ্যাসমূহ শিক্ষা ; শিক্ষার্থীর পথ সুগম করতে হলেও চাই বাঙলা ভাষায় বিদ্যার বিকিরণ, ইংরেজি ভাষা থেকে সেজন্য আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ ; সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে রচনাকৌশল অর্জন" (গোপাল হালদার, ১৯৯৪ : ৩৪৯)। কাল থেকে অগ্রবর্তী বিদ্যাসাগরকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্লেষণ এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে (বিদ্যাসাগর) শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে, তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে : বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল ; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক। ... যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি-স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহরথীগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন...। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৯৪ : ৩০২)

সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগরের অন্য একটা প্রচেষ্টার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। নিজের অর্থে তিনি একাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন গ্রামাঞ্চলে। কেবল মেয়েদের জন্য নয়, জন্মগ্রাম বীরসিংহে ছেলেদের জন্যও তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমজীবী মানুষ ও রাখালদের শিক্ষার কথাও ভেবেছেন তিনি—তাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন নৈশ বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী পল্লীসমূহের শ্রমজীবী, রাখাল ও কৃষক বালকগণের

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাশিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই বিদ্যালয়ের বালকেরা দিনের বেলায় ক্ষেত্রের কার্য করিয়া ও মাঠে গরু চরাইয়া সন্ধ্যার সময় বিদ্যালয়ে আসিয়া লেখাপড়া শিখিত" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০ : ৬৭)। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালক, বালিকা এবং নৈশ—এই তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীদের যাবতীয় ব্যয় বিদ্যাসাগর নিজে বহন করতেন। চণ্ডীচরণ লিখেছেন : "বালক, বালিকা এবং নৈশ এই তিন ধরনের স্কুলের জ্ঞান বিতরণের সকল দ্বারগুলিই অবৈতনিক। সকলেই সর্বত্র বিনা বেতনে ও বিনা ব্যয়ে বিদ্যা উপার্জন করিতে লাগিল। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের পুস্তক, কাগজ, কলম, শ্লেট, পেনসিল প্রভৃতিতে মাসে মাসে প্রায় ৩০০্ টাকার অধিক ব্যয় হইত। ...এতভিন্ন ওই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ সর্বসমেত ৩০০্/৪০০্ টাকা পড়িত। প্রথম প্রথম এই সমগ্র ব্যয় নিজেই বহন করিতেন" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০ : ৭২)।

বাংলাদেশের অনেক স্থানে বিদ্যাসাগর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন ও সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ে তিনি কখনও অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করেননি। নিজে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করলেও বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তিনি অকাতরে নিজের অর্থ ব্যয় করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি গ্রামে ১৮৫৯ সালের ১লা এপ্রিল একটি ইংরেজি ও সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যাসাগর। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার সমুদয় অর্থ তিনি নিজে বহন করেন। ১৮৬৯ সালে ঘাটালে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় এবং কেদারনাথ হালদার। স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তারা অর্থের অভাবে পড়েছেন, এমন তথ্য জানার পর বিদ্যাসাগর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিঠি লিখে তাদের জানান : "আপনাদিগের উদ্যোগে ঘাটালে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে উহার গৃহনির্মাণ সম্বন্ধে যে ৫০০্ টাকার অনটন আছে আমি স্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দিব সে-বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তজ্জন্য অন্য চেষ্টা দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই" (সুদিন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪ : ৩৮২)।

স্কুল-শিক্ষার্থীর জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-ভাবনার একটি উজ্জ্বল প্রান্ত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 'পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা' (primer write) বলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্যঙ্গ করলেও, এই পাঠ্যপুস্তক রচনাই বিদ্যাসাগরের জীবনের এক বিশিষ্ট কীর্তি। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্যবই রচনায় তিনি প্রথম উদ্যোগী হন। তবে তাঁর শিক্ষাচিন্তা কলেজের কয়েকজন ছাত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন বাংলায় গণশিক্ষার প্রথম প্রবর্তক, যিনি সাফল্যের সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে বাংলা শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সেজন্য রচনা করেছিলেন অনেক পাঠ্যগ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিত হয়েও বিদ্যাসাগর বাংলা শিশুপাঠ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং একাজকে তিনি ব্রত

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবেই গ্রহণ করেন। শিশুপাঠ্য রচনায় বিদ্যাসাগরকে একেবারে গোড়া থেকে কাজ আরম্ভ করতে হয়েছিল, এবং একমাত্র নিজের উদ্ভাবনী শক্তির উপর নির্ভর করে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১ : ৬০)। বস্তুত, বাংলাতে সে-সময়ে বর্ণমালার কোনো বই ছিল না। তাই তাঁকে একেবারে প্রথম থেকেই আরম্ভ করতে হয়েছে। প্রথম প্রয়াস হলেও, বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনায় তাঁর সিদ্ধি বিস্ময়কর এবং ঐতিহাসিক।

পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিদ্যাসাগরে প্রথম প্রয়াস বেতাল *পঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭)। এ বই বাংলা শিক্ষার জন্য নয়, বরং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজ-ছাত্রদের পঠন-পাঠনের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন এ বই তাঁর অভিপ্রেত রচনা নয়। এরপর তিনি রচনা করেন *বোধোদয়* (১৮৫১)। এ সময়েই বিদ্যাসাগরের চিন্তায় শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদর্শ ক্রমণ রূপ পেতে আরম্ভ করে। শিক্ষার পথ সুগম করতে হলে কী কী করা প্রয়োজন, এসময় তিনি তা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন—কী জাতীয় জ্ঞান বা তথ্য ও বিষয়বস্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য প্রথম ও প্রধান জ্ঞাতব্য, এবং কী রূপে সে-জ্ঞান শিক্ষার্থীর বয়স, বুদ্ধি, ভাষাবোধ ও শিক্ষামানের কথা বিবেচনা করে পরিবেশন করা প্রয়োজন (গোপাল হালদার, ১৯৯৪ : ৩৫০)। এ উদ্দেশ্যে তিনি পরিকল্পনামাফিক ধারাবাহিক কাজে অগ্রসর হন। এটাই ছিল যেন ঐতিহাসিক বিধিলিপি যে, স্কুলের ছোট ছেয়েমেয়েদের লিপিরহস্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বিদ্যাসাগরই বাংলা ভাষার প্রথম বর্ণপরিচয়ের বই প্রণয়ন করবেন। ১৮৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হল বাংলা ভাষার প্রথম শিশুপাঠ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত *বর্ণপরিচয়*। গ্রন্থটি দুই ভাগে বিরচিত। এর প্রথম ভাগে আছে বাংলা বর্ণমালা এবং স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তরূপ। দ্বিতীয় ভাগে আছে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে যেসব যৌগিক বর্ণ হয় তাদের রূপ ও ব্যবহার। প্রাথমিক এই শিশুপাঠ্যটি অর্জন করেছিল বিপুল জনপ্রিয়তা এবং উত্তরকালে রঙিন বর্ণশোভিত চিত্তাকর্ষক অনেক শিশুপাঠ্যের মধ্যেও *বর্ণপরিচয়* আজও তার অপরাজেয় জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। বিদ্যাসাগর যেভাবে বর্ণের ক্রম সাজিয়েছেন, সামান্য পরিবর্তন সত্ত্বেও তা-ই এখনও অনুসৃত হচ্ছে। বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে (১৮৫৫-১৮৭৫) *বর্ণপরিচয়*-এর ষাটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এ তথ্য সমকালে গ্রন্থটির অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তাকেই নির্দেশ করে। আজ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের *বর্ণপরিচয়*-এর কত লক্ষ কপি যে মুদ্রিত হয়েছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই।

প্রাথমিক ধাপ অতিক্রমের পর দ্বিতীয় ধাপের শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যাসাগর রচনা করেন *কথামালা* (১৮৫৬)। এটি নীতিমূলক গল্প-সংকলন। শিক্ষার্থীর চেতনায় নীতিবোধ সঞ্চারই এ গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। শিক্ষা সংসদের প্রধান উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙ-এর অনুরোধে ঈসপের কিছু গল্প বাংলায় অনুবাদ করে বিদ্যাসাগর প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করেন *কথামালা*। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় গ্রন্থটি রচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভাষ্য : "রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীসদেশে ঈসপ্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি, কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্পের রচনা করিয়া, আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্প ইঙ্গরেজি প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, এবং য়ুরোপে সর্ব্বপ্রদেশেই, অদ্যাপি, আদরপূর্ব্বক, পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর ; পাঠ করিলে, বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে, এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়। এই নিমিত্ত, শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উইলিয়ম গর্ডন ইয়ঙ্ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে, আমি ঐ সকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্ত, এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে, সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর বোধ হইবেক না ; এজন্য, ৬৮টি মাত্র আপাততঃ, অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ১২৭৬)। তৃতীয় ধাপের শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যবই হিসেবে বিদ্যাসাগর রচনা করেছেন *চরিতাবলী* (১৮৫৬)। এই গ্রন্থে সাধারণ দরিদ্র ঘরের সন্তান হয়েও যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এমন কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। *চরিতাবলী* সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ভাষ্য থেকে গ্রন্থটির মূল চারিত্র্য অনুধাবন করা যাবে : "সংক্ষেপে, সরল ভাষায়, কতকগুলি মহানুভবের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালকদিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সমগ্র বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে, এরূপ অনেক বিষয়, মধ্যে মধ্যে নিবেশিত হইত যে, সে সমুদয় এতদ্দেশীয় অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনায়াসে বোধগম্য হইত না, এবং ব্যাখ্যা করিয়া বালকদিগের বোধগম্য করিয়া দেওয়া, শিক্ষক মহাশয়দিগের পক্ষেও, নিতান্ত সহজ হইত না" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ১৩২৬)। চতুর্থ ধাপের জন্য বিদ্যাসাগর নির্বাচন করেন ১৮৫১ সালে প্রকাশিত তাঁর *বোধোদয়* গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে ঐহিক পদার্থসমূহের আবশ্যিক জ্ঞান, নানা ধরনের পদার্থ, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সামাজিক নানা বিষয়, ভূ-প্রকৃতি—ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। নিছক গল্প নয়, বিদ্যাসাগর এখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল ; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি ; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে, অগত্যা, যে যে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছ, পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে, পুস্তকের শেষে সেই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪খ : ১৪১৯)

বিদ্যাসাগরের *বাঙ্গালার ইতিহাস*-২য় ভাগ (১৮৪৮) এবং *জীবনচরিত* (১৮৪৯) গ্রন্থদ্বয় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত হলেও দোষাবহ ভাষার কারণে তেমন জনপ্রিয় হতে পারেনি। তবে বিষয়ের দিক থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রাথমিক পাঠধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। প্রাথমিক পর্বের শেষ পর্যায়ে পরিণতবুদ্ধি ও রসবোধের দাবিকে স্বীকার করে শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যাসাগর রচনা করলেন *আখ্যানমঞ্জরী* (১৮৬৩) । তিন ভাগে বিন্যস্ত *আখ্যানমঞ্জরী* নীতিমূলক ঘটনাপ্রধান গল্প-সংকলন। ভাষার উপর প্রাথমিক তথা চলনসই দক্ষতা জন্মাবার পরে শেষ ধাপের শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যাসাগর রচনা করেন অসাধারণ দুটি বই—*শকুন্তলা* (১৮৫৪) ও *সীতার বনবাস* (১৮৬০)। স্বচ্ছন্দ রসাস্বাদনের জন্য ছাত্রপাঠ্য হিসেবে তিনি রচনা করেন এই দুটি গ্রন্থ। *শকুন্তলা*-র ভাষা রোমান্টিক, পক্ষান্তরে *সীতার বনবাস*-এর ভাষা ক্লাসিকতা-সমৃদ্ধ। পাঠ্যবই হিসেবে বিদ্যাসাগরের সর্বশেষ রচনা *ভ্রান্তিবিলাস* (১৮৬৯)। উইলিয়ম শেক্সপীয়রের *Comedy of Errors* নাটক অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। এই গ্রন্থের ভাষা কৌতুকরসাশ্রিত। সরস কৌতুকাবহ ভাষার কারণে বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থটি লাভ করে কালজয়ী জনপ্রিয়তা।

বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা অনুসারে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা যাতে শিক্ষার্থীদের মাঝে সৃষ্টি হয়, তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল তা-ই। সেজন্য শ্রেণি ও বয়সটাকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, পরিকল্পনা মাফিক এইসব পাঠ্যবই অনুশীলন করলে এ দেশের বালক-বালিকারা বাংলা ভাষা প্রত্যাশিত মাত্রায় আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে।

৩. নারীশিক্ষাচিন্তা

উনিশ শতকে বাঙালি নারীর শিক্ষা নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের অন্যতম। নারীর শিক্ষা বিষয়ে এসময়ে যেসব ব্যক্তি চিন্তা করেছেন, তার বিস্তৃত পরিচয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত হবে নারীশিক্ষা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের চিন্তার পরিচয়। বাঙালি নারীর আত্মবিকাশের পথে সামাজিক বিধি-নিষেধ এবং সনাতন কিছু প্রথাকে বিদ্যাসাগর মূল প্রতিবন্ধক হিসেবে শনাক্ত করেছেন। বাঙালি সমাজে নারীর অগ্রগতি ও আত্মবিকাশের প্রতিবন্ধকাতসমূহ ক্রমশ দৃঢ়মূল হয়েছে—কেননা শতাব্দী পরম্পরায় উপেক্ষিত হয়েছে নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গটি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নারীর শিক্ষাকে সামাজিকভাবে স্বীকার করাই হয়নি। এখানেই বিদ্যাসাগরের প্রধান মনোযোগ নিপতিত হল। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, নারীর শিক্ষার অভাবই তার সামূহিক দুরবস্থা ও লাঞ্ছনার মূল কারণ। নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে বিদ্যাসাগরের প্রিয়বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাসভবনে বসে, এবং কখনো মনদমোহনের শ্বশুরবাড়ি বহিরগাছির বাড়িতে দুই বন্ধু নারীশিক্ষা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার সূত্র ধরেই মদনমোহন রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত রচনা “স্ত্রীশিক্ষা”। এই প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে মদনমোহন যে

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলোচনা করে অনেক ভাবনা নিয়েছেন, তা মদনমোহন নিজেই স্বীকার করেছেন (*সর্ব্বশুভঙ্করী*, ১৭৭২ শকাব্দ)। মদনমোহন জানিয়েছেন যে, বাঙালি নারীর শিক্ষার প্রসঙ্গটি এক পর্যায়ে বিদ্যাসাগরের সার্বক্ষণিক চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। কীভাবে নারীর শিক্ষার সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া যায়, তা নিয়ে দুই বন্ধু বহিরগাছির মদনমোহনের শ্বশুরবাড়িতে বহু বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করেছেন। নদীয়া জেলার বহিরগাছি গ্রামে সেই বিখ্যাত বাড়িটি এখনও বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের স্মৃতিকে ধারণ করে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। (নির্মল দাশ, ২০১৪ : ১১৭)

বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিরোধ এবং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা—প্রধানত এই তিনটি সংস্কারকাজকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারী-উন্নয়নে সামাজিক কর্মে ব্রতী হন। এই তিনটি ক্ষেত্রেই নারীকে উদ্বুদ্ধ ও অধিকার-সচেতন করে তোলার উপায় হিসেবে বিদ্যাসাগর শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেন। তিনি মনে করতেন নারীশিক্ষা বৃদ্ধি পেলেই এইসব সামাজিক কুপ্রথা ক্রমে দূর হবে। বিদ্যাসাগরের পূর্বে উনিশ শতকের প্রথম দিককার সমাজসংস্কারকদের কেউ নারীশিক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিলেন, এমন তথ্য জানা যায় না। রামমোহন রায়সহ দু'একজন লেখক মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার অনুকূলে বিচ্ছিন্ন কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন মাত্র (প্রীতিকুমার মিত্র, ১৯৯৩ : ২৯০)। এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থেই ছিলেন পথিকৃৎ।

বহুবিবাহ আর বাল্যবিবাহের ফলে শুধু অকালবৈধব্য আর যৌন নির্যাতনের ঘটনাই ঘটতো তা নয়, ঐসব প্রথা বিদ্যালয়ে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষা নেওয়ার পক্ষেও প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামমোহনের প্রবল প্রচেষ্টায় প্রবর্তিত হয়েছিল সতীদাহপ্রথা নিরোধ আইন। কিন্তু বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পর্দার নামে নারীদের চার দেয়ালে বন্দি করে রাখা, লেখাপড়া শিখলে নারীদের সামূহিক অকল্যাণ, শিক্ষিকার অভাব কিংবা ঔপনিবেশিক সরকারের নারীশিক্ষার ব্যাপারে অনীহা—এই সবকিছুর বিরুদ্ধে অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল একটি অর্থবহ নারীশিক্ষা কার্যক্রম। চিন্তাবিদ হিসেবে এখানেই বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকা। বিধবাবিবাহের পক্ষে এবং বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহের বিপক্ষে বই লিখে তিনি প্রকারান্তরে নারী শিক্ষার অপরিহার্যতাকেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। লেখাপড়া না শিখলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা নিজেদের দুরবস্থা ও লাঞ্ছনা অনুধাবন করতে পারবেন না। শাস্ত্রে যে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে কিছু বলেনি, কিংবা বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহকে স্বীকৃতি দেয়নি—শাস্ত্র দ্বারাই সে-কথা তিনি যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নারী যদি পড়ালেখা না জানে, তাহলে তো ওই শাস্ত্রবচন বুঝতে পারবে না। এজন্যই বিদ্যাসাগর জোরেশোরে নারীশিক্ষার কথা বলেছেন, গ্রহণ করেছেন এ-সংক্রান্ত নানা উদ্যোগ। তিনি চেয়েছেন, শিক্ষার মাধ্যমে নারী নিজেই বুঝুক-জানুক তার দুরবস্থার প্রান্তসমূহ, গ্রহণ করুক দুরবস্থা অতিক্রমের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা। উচ্চশিক্ষায় কোনো নারী সাফল্য লাভ করলেই বিদ্যাসাগর যে তাকে পুরস্কৃত করতেন, অভিনন্দন জানাতেন—এ তথ্য তাঁর ওই চিন্তাকেই অব্যর্থভাবে সমর্থন করে।

জার্মানির বিখ্যাত দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের (১৮৮৯-১৯৭৬) মতো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বিশ্বাস করতেন নারীর মধ্যে আছে অফুরন্ত সম্ভাবনা এবং সীমাহীন অস্তিত্ববাসনা। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে তার এই সম্ভাবনা এবং অস্তিত্ববাসনা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। তিনি মনে করেন, যথাযথ শিক্ষা পেলে পুরুষের মতো নারীও প্রগতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। ব্যক্তি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করে সে-সমাজের আইন-কানুন বিধি-নিষেধের প্রতি সচরাচর তাকে আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়। এটা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার ফল নয়—অনেকটা তার অদৃষ্ট (Martin Heidegger, 1964 : 160)। হাইডেগার বলেন—ব্যক্তির স্বাধীনতা তার ওইরূপ অদৃষ্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যক্তিকে এই অদৃষ্ট অতিক্রম করে স্বাধীনতা ও মুক্তির পথে নিয়ে যায় (আমিনুল ইসলাম, ১৯৮৯ : ৩৪০-৪১)। মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য হাইডেগার যেখানে সামাজিক প্রথা ও ব্যক্তির স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলেছেন (শরীফা খাতুন : ১৯৯৯ : ১৪৪), হাইডেগারের চেয়ে প্রায় ৭০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেও বাংলার সমাজকাঠামোয় অবস্থান করে প্রথাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নারীমুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন বিদ্যাসাগর। এই স্বপ্নকে সত্য করে তোলার জন্য নারীকে তার নিজস্ব অস্তিত্ব অনুসন্ধানের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করেন, প্রকৃত শিক্ষা পেলেই নারীর চেতনায় জাগ্রত হতে পারে মুক্তি ও অস্তিত্ববাসনা। বিদ্যাসাগরের এই ভাবনার সঙ্গে উত্তরকালীন র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী চিন্তাবিদদের (Radical Feminist) নারীশিক্ষাগত ভাবনার মধ্যে সহজ-সাদৃশ্য আবিষ্কার করা সম্ভব।

বিধবাবিবাহ আইন প্রচলনের জন্য উদ্যোগী হলে বিদ্যাসাগর নানামাত্রিক বাধার মুখে পড়েন। বিদ্যাসাগরকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা করে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজ, এমন-কি চেষ্টা করে তাঁর প্রাণনাশেরও। কেবল পুরুষ নয়, শিক্ষার অভাবে অনেক নারীও বিধবাবিবাহ সমর্থন করেননি, এমন-কি এ দলে অল্প-বয়সী বিধবা নারীও ছিলেন। বিদ্যাসাগর মনে করেন, শিক্ষার অভাবেই এমনটা ঘটেছে। বন্ধু মদনমোহনের কাছে এ বিষয়ে তিনি বারবার বলেছেন। ১৮৫৮ সালের ২রা মার্চ হুগলি জেলার উদয়রাজপুর গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী সভায় বিদ্যাসাগরের বক্তব্য *সর্ব্বশুভঙ্করী* পত্রিকায় (৭ই মার্চ, ১৮৫৮) ছাপা হয় এভাবে : "তোমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হইবেক। পড়ালেখা না শিখিলে নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবেক না। তখন অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবেক। তোমাদের মধ্যে শক্তি ও সম্ভাবনা আছে, অফুরন্ত সেই শক্তি ও সম্ভাবনাকে পড়ালেখা শিক্ষা করিয়া আবিষ্কার করিতে হইবেক। সমাজ চাইবে তোমরা স্কুলে না আইস, কেননা তারা চায় তোমরা ঘরে থাক। আমি বলিব, তোমরা স্কুলে আইস, পড়ালেখা শিখিয়া নিজেদের পায়ে দাঁড়াও" (*সর্ব্বশুভঙ্করী*, ০৭.০৩.১৮৫৮)।

পুরুষের মতো নারীরাও যখন সামাজিক কুপ্রথা সমর্থন করতেন, বিদ্যাসাগর তখন খুব কষ্ট পেতেন। তিনি বুঝতে পারতেন, শিক্ষার অভাবেই এমনটা ঘটছে। শিক্ষা নেই বলে নারী বুঝতে পারছে না তার অসহায়

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা, তার দুরবস্থা। কুয়োর ব্যাঙ যেমন কুয়োতেই থাকতে ভালোবাসে, সমুদ্রে তার ভয়—বাঙালি নারীও তেমনি চার দেয়ালে বন্দি থাকতেই ভালোবাসে, মুক্তিতে তার ভয়। বিদ্যাসাগর মনে করতেন, শিক্ষা ছাড়া নারীর এই সামাজিক মনস্তত্ত্ব ভাঙা সম্ভব নয়। নারীবাদী তাত্ত্বিক Betty Friedan (১৯২১-২০০৬) নারীমুক্তির জন্য যেমন এই নারী-মনস্তত্ত্ব ভাঙার কথা বলেছেন (Betty Friedan, 1963 : 78), তেমনি বিদ্যাসাগরও চেয়েছেন ভেঙে যাক বাঙালি নারীর সামাজিক-মনস্তত্ত্ব। কিন্তু যথাযথ শিক্ষা নেই বলে নারীরা সে-পথে এগিয়ে আসছে না। বিদ্যাসাগর তাই এমন সমাজে নারীর যেন জন্ম না হয়—এরূপ বেদনাসঞ্জাত বাক্য উচ্চারণ করেছেন তাঁর *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব-দ্বিতীয় পুস্তক* গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন :

> তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় ; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না : যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না ; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার, ১৯৯৪খ : ৮৩৯)

নারীশিক্ষাকে বিদ্যাসাগর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন। উত্তরকালীন বিখ্যাত শিক্ষাতাত্ত্বিক মাদাম মারিয়া মন্তেসরীর (১৮৭০-১৯৫২) মতো বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তায়ও দার্শনিক তত্ত্বের তেমন স্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বরং বাস্তব সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেই বিবেচনা করেছেন নারীর শিক্ষালাভের প্রসঙ্গটি। মন্তেসরী মনে করতেন স্বাভাবিক জীবনবিকাশের জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা শিশুকে দেওয়া হয়, তা-ই হল শিক্ষা (সুশীল রায়, ২০০৩ : ৬৬১)। বিদ্যাসাগরও আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন নারীর স্বাভাবিক জীবনবিকাশ। নারী-শিক্ষার্থীকে তার জন্মগত ক্ষমতা অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সহায়তা করাই বিদ্যাসাগরের কাছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাতাত্ত্বিকদের মতে বংশানুক্রমিকতা এবং তার সহজাত শক্তিটুকুকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হবেন শিক্ষক, এবং যথাযোগ্য পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি করে সুন্দর ও সামর্থ্যবান মানুষ সৃষ্টি করাই শিক্ষাদর্শনের মূল কথা (সুধীরকুমার নন্দী, ১৯৮৫ : ১৩৫-৩৬)। পূর্বগামী মানুষ হলেও বিদ্যাসাগরের চেতনায় আধুনিক শিক্ষাতাত্ত্বিকদের এসব ভাবনার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য সমালোচকের এই অভিমত : “নারীজাতির তৎকালীন সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান যে সমাজ রূপান্তরের অনুকূল নয়, বরং প্রতিকূল, তা বোধ করি তিনি [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। সমাজ রূপান্তরের গরজেই

তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন যে অপরিহার্য তা তিনি অনুধাবন করেন। মাতা, স্ত্রী, কন্যা হিসাবে প্রতিটি পরিবারে নারীর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে নারীকে যোগ্যতর করার জন্য শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষিতা নারী তার স্বভাবগত স্নেহ ও ভালোবাসার দ্বারা পুরুষের নানাবিধ কর্মকে কলুষমুক্ত করে স্বার্থবোধ থেকে নিঃস্বার্থপরতায় উন্নীত করে। পরোক্ষভাবে সমাজ জীবনকে স্বার্থপরতা, স্বার্থবুদ্ধি থেকে নিঃস্বার্থ সামাজিক অস্তিত্ববোধে উদ্দীপিত করে। এ দিক থেকেই, বোধ করি, বিদ্যাসাগর নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন” (প্রদীপ রায়, ১৯৮৬ : ১৪০-৪১)।

নারীশিক্ষাচিন্তায় বিদ্যাসাগর ধ্রুববাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। ধ্রুববাদী দার্শনিকেরা সমাজবিকাশে নারীর অবদানকে অকপটে স্বীকার করেছেন। এ কারণেই নারীশিক্ষার উপর তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২), জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬), অগাস্ট কোঁতে (১৭৯৮-১৮৫৭), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) প্রমুখ হিতবাদী দার্শনিকের বিভিন্ন গ্রন্থের বিপুল সমাবেশ ছিল। গবেষক উল্লেখ করেছেন উল্লিখিত লেখক ও তাঁদের রচনা সম্পর্কে অকৃত্রিম আগ্রহ না থাকলে তাঁদের গ্রন্থ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকার কথা নয় (মো. মতিউর রহমান, ২০০০ : ৫৭৩)। অনুমান করা যায়, এসব হিতবাদী দার্শনিক বিদ্যাসাগরের চিন্তায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। নারীর সামূহিক কল্যাণ প্রত্যাশা করেছেন বিদ্যাসাগর। এ উদ্দেশ্যেই, হিতবাদী দার্শনিকদের মতো, বিদ্যাসাগরও নারীশিক্ষার কথা বলেছেন, নারীর কল্যাণের জন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, গ্রহণ করেছেন নানা উদ্যোগ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উত্তরকালীন শিক্ষা-দার্শনিক জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে এক অপরিহার্য প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। জীবনধারণের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের যেমন প্রয়োজন, সমাজজীবনের জন্য শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা একই রকম। ডিউর ভাষায় : “What nutrition and reproduction are to physiological life, education is to social life. (John Dewey, 1916 : 68)। উনিশ শতকে বাংলায়, বিশেষত কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের হাওয়া আলোড়ন তুলেছিল। নবজাগরণের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মানবতাবাদী চিন্তার পাশাপাশি নারীব্যক্তিত্বকে স্বীকার করাও ছিল অন্যতম দিক। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকী বাঙালি নবজাগরণের মানসসন্তান। তাই স্বভাবতই তাঁর চেতনায় মানবতাবাদী ভাবনার পাশাপাশি নারীব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রসঙ্গটি দেখা দিয়েছিল। কেননা তিনি বুঝেছিলেন, নারীর সামগ্রিক বিকাশ ব্যতীত সমাজের বিকাশ তথা নবজাগরণ পূর্ণতা লাভ করবে না। ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন চার্লস উডের সঙ্গে নর্মাল স্কুল বিষয়ে আলোচনার সময় বিদ্যাসাগর নারীর শিক্ষালাভের এই প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সঙ্গে

বলেছিলেন (William Adam, 1955 : 89)। সমাজবিকাশের সঙ্গে নারীশিক্ষার এই বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট করা বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার এক বিশিষ্ট দিক। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় সমালোচকের এই অভিমত :

> Vidyasagar's works for the upliftment of women−their self-sufficiency, prosperity and empowerment along with his untiring efforts for Nari-Shiksha remaim unique. Keeping this view firmly in the centre, he said, "Taking social and naional cause to be above all is the Dharma of a conscious and true citizen. (Rabindra Kumar, 2017)

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর বাঙালি নারীকে দেশের অতীত ইতিহাস জানাতে চেয়েছেন। তিনি শিক্ষার্থীর চেতনায় এইকথা সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন—অতীত না জানলে বর্তমানকে সম্যক অনুধাবন করা যাবে না। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর পূর্ণাঙ্গভাবেই নারীকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নারী বিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন : "The sole purpose of these schools was to make women self-sufficient and empowered. Along with this, special focus was laid on spreading values among girls. They were taught about India's past glory and about the underlying tenets of Indian Culture. They were expected to defend this and Indian nationalism. Ishwar Chandra Vidyasagar was of the firm opinion, "It does not matter how great one has become ; he must remember (the glory of) his past." (Rabindra Kumar, 2017)। নারীশিক্ষাকে বিদ্যাসাগর সমাজ-উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবেই বিবেচনা করতেন। শিক্ষার অভাবেই যে নারী সামাজিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে—একথা তিনি নারী-শিক্ষার্থীদের কাছে প্রায়শই বলতেন। শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন যে পরস্পর সম্পর্কিত (Amartya Sen, 1999 : 11), একশ' পঁচাত্তর বছর আগেও সে-কথা অব্যর্থভাবে বুঝেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নারীর মুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে শিক্ষাকেই তিনি প্রথম শনাক্ত করেছেন। অনেকটা আধুনিক জেন্ডারচেতনায় বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন নারীশিক্ষা নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করে, নারীকে দাঁড় করায় আপন মৃত্তিকার উপর—পুরুষের চোখ দিয়ে নয়, সে তার নিজের চোখ দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখতে পায়। বিদ্যাসাগর যে তাঁর সময়ের অগ্রবর্তী মানুষ ছিলেন, তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনার এই বৈশিষ্ট্য সেকথাই যেন প্রমাণ করে। সমাজ-উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেভাবে বুঝেছেন, তা সমালোচক তুলে ধরেছেন এভাবে :

> Women, due to lack of education were in the grip of social malpractices. Therefore, they were deprived of their human rights and were, in fact, totally unaware of the purpose of life. Education, in the words of Ishwar Chandra Vidyasagar himself... is the priceless treasure of life. Just it's arrival not only

ascertains welfare at individual level, but paves the way for large scale development of the society. (Rabindra Kumar, 2017)

১৮৭০-এর দিকে বাংলার ভদ্রলোকদের মধ্যে নারীশিক্ষা বিষয়ে দুটো বিপরীতধর্মী মত ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। এঁদের মধ্যে একটা অংশ, যাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ভারী, নারীর শিক্ষাকে অভিজাত গৃহিণীর গৃহস্থালি কর্মের প্রস্তুতি ও সন্তান লালন-পালনের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন হিসেবেই বিবেচনা করতেন। কিন্তু অপর অংশ, যাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই উনিশ শতকের আলোকিত মানুষ, মনে করতেন নারী শিক্ষিত হবে পুরুষদের সমান স্তরে এবং সমতার ভিত্তিতে (David Kopf, 1979 : 34)। লেখাই বাহুল্য যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন এই দ্বিতীয় ধারার চিন্তাবিদ। একুশ শতকের জেন্ডারচেতনার কথা উনিশ শতকে কল্পনা করা যায় না, তবু একথা বলা যায় যে, বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাবনায় জেন্ডারচেতনার প্রাথমিক ধারণা উঁকি দিয়েছিল। শিক্ষাকে তিনি গৃহস্থালি কাজে নারীর পারদর্শিতা কিংবা সন্তান প্রতিপালনে দক্ষতার সূচক হিসেবে বিবেচনা করেননি, বরং নারীশিক্ষাকে তিনি গ্রহণ করেছেন নারীর সামূহিক অগ্রগতির অপরিহার্য উৎস হিসেবে। বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় কেবল শিক্ষিত হলেই নারী পুরুষের পাশাপাশি মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার দাবি উত্থাপন করতে সমর্থ হবে (Usha Chakrabarty, 1973 : 87)। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর চেতনায় বিদ্যাসাগর এই বোধের আলো জ্বেলে দিতে চেয়েছিলেন।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজে 'বিকৃত বিবাহ পদ্ধতি'কে প্রধানত দায়ি করেছেন বিদ্যাসাগর। বিকৃত বিবাহপদ্ধতি বলতে তিনি মূলত বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহকেই বুঝিয়েছেন। পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, নারীশিক্ষার প্রশ্নে সামাজিক সমস্যার উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। এক্ষেত্রে বাল্যবিবাহকে তিনি দেখেছেন প্রধান অন্তরায় হিসেবে। নারীশিক্ষা প্রত্যাশিত মাত্রায় বিস্তৃত না হওয়ার কারণগুলো বিদ্যাসাগর বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। গবেষক লিখেছেন : "তিনি [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] তাঁর বাস্তব উপলব্ধি থেকে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, কেবল বিদ্যালয় স্থাপন করে কিংবা নারী শিক্ষার পক্ষ নিয়ে লেখনী ধরলেই কাজ হবে না, এক্ষেত্রে প্রয়োজন হল নারীশিক্ষা বিস্তারের উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। তাঁর মতে এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন হল নারী শিক্ষা প্রসারের প্রধান প্রতিবন্ধক বিকৃত বিবাহ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংস্কার করা। বিকৃত বিবাহ পদ্ধতি বলতে তিনি মূলত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহকে বুঝিয়েছেন। বাল্যবিবাহের সঙ্গে নারীশিক্ষার সম্পর্কের বিষয়ে তিনি তাঁর নিবন্ধে [*বাল্যবিবাহের দোষ*] আনুপূর্বিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন" (আব্দুল মালেক, ২০১২ : ১০৬)। জীববিজ্ঞানীদের তত্ত্ব উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন যে, বাল্যবিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন এবং তাদের সন্তান কীভাবে শারীরিক-মানসিকভাবে পঙ্গুত্বের শিকার হয়। বাল্যবিবাহের ফলে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে একটা ভীরু প্রজন্ম, যারা শারীরিক-মানসিক ও আর্থিকভাবে পঙ্গু। পঙ্গুত্বপ্রবণ সমাজে নারীশিক্ষার প্রচলন ও বিস্তার কিছুতেই

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবপর নয়। উদারনৈতিক আধুনিক নারীবাদীদের মতো নারীশিক্ষা বিস্তারে তাই তিনি সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন। আধুনিক জেন্ডারচেতনায় বিদ্যাসাগর বলেছেন :

> ...যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, বর্তমান বিবাহনিয়মই অস্মদ্দেশের সর্বনাশের মূল কারণ।... কন্যাদিগের পিতা-মাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয় বিবাহনিয়মের বাধা হইয়া শিক্ষার উপক্রমেই কন্যাদিগেকে পাত্রসাৎ না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবী সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতা-মাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা স্ত্রীজাতির শিক্ষাদান বিষয়ে যেরূপ উদ্যোগ করিবেন, তদ্রূপ বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদকরণেও যত্নশীল হউন, নচেৎ কদাচ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৬৮০, ৬৮৩)

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত *বাল্যবিবাহের দোষ* পুস্তিকায় প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা-সংক্রান্ত এই ভাবনা উত্তরকালেও লক্ষ্য করা যায়। নারীদের জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠায় নীতিগতভাবে তিনি একমত হলেও, এই স্কুলের সফলতা বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটলে নারীশিক্ষা-সংক্রান্ত কোনো উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত সফল হবে না বলে তিনি মনে করতেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর বিলুপ্তির অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে তাঁর উপলব্ধিতে সহায়ক হয়েছে। নারীদের জন্য নর্মাল স্কুল এবং সে-স্কুলে কারা শিক্ষয়িত্রী হতে পারেন—এসব বিষয়ে বাংলার ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে বিদ্যাসাগরের কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি স্পষ্টভাবে তাই জানিয়ে দেন : "আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবে দেখেছি এবং অনুসন্ধানও করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার পূর্বের মত পরিবর্তনের কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, আমাদের দেশের হিন্দুসমাজের গ্রহণযোগ্য একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী তৈরি করবার জন্য মিস কার্পেন্টার যে পথ অবলম্বন করতে চান, তা কাজে পরিণত করা কঠিন। আমাদের সমাজের যে বর্তমান অবস্থা এবং দেশবাসীর যে মনোভাব তাতে এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে আমি যত ভেবেছি, তত এই ধারণাই আমার দৃঢ় হয়েছে। যে কাজ বা পরিকল্পনা বাস্তবে সফল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তা আমি কোনোমতেই সরকারকে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতে পারি না" (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২৩২)। ১৮৬৭ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে লেখা বিদ্যাসাগরের এই অভিমত উনিশ বছর আগে লেখা *বাল্যবিবাহের দোষ* রচনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সনাতন গোঁড়ামি দূর না হলে নারীশিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষয়িত্রী পাওয়া সম্ভব হবে না বলেই তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে উইলিয়ম গ্রে-র কাছে পাঠানো তাঁর চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ প্রণিধানযোগ্য :

> এদেশের ভদ্রপরিবারের হিন্দুরা যখন অবরোধপ্রথার গোঁড়ামির জন্য দশ-এগার বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই গৃহের বাইরে যেতে দেয় না, তখন তারা যে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করতে

Dhaka University Institutional Repository

> সম্মতি দেবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। বাকি থাকে অসহায় অনাথা বিধবারা, এবং তাদেরই একাজে পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষকতার কাজে তারা কতদূর উপযুক্ত হবে আপাতত সে-প্রশ্ন বাদ দিয়েও আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে বিধবারা যদি সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগ দেয়, তাহলে লোকের কাছে তারা অবিশ্বাসের পাত্রী হয়ে উঠবে। তা যদি হয় তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।
>
> মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী যে কতটা আবশ্যক ও অভিপ্রেত তা আমি বিশেষভাবে জানি, এবং সে-কথা আপনাকে নতুন ধরে জানানো বাহুল্য মনে করি। দেশবাসীর দৃঢ়মূল সামাজিক কুসংস্কার যদি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে সকলের আগে আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করতাম এবং একে কাজে পরিণত করার জন্য যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু যে-কাজে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই তা আমি নিজে যেমন সমর্থন করি না, তেমনি সরকারকেও তা করতে পরামর্শ দিতে পারি না। (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২৩২)

নারী শিক্ষার্থীরা নারী-শিক্ষকের কাছে শিক্ষা পেলেই প্রভূত উপকার হবে—একথা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু সংস্কারের অন্যান্য প্রান্তের মতো রক্ষণশীল সমাজের বিরোধী আচরণে নারী-শিক্ষক পেতে বিদ্যাসাগরের আশা অপূর্ণই থেকে যায়। তিনি লিখেছেন :"...স্ত্রীলোক শিক্ষার্থী স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করবেন, ...কিন্তু সমাজজীবন সম্বন্ধে আমার স্বদেশবাসীদের কতগুলি ভ্রান্ত ধারণা এ বিষয়ে অনতিক্রমণীয় বাধা স্বরূপ" (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১ : ৪৩)। তাঁর পরামর্শ না মেনে ১৮৬৯ সালে সরকারি অর্থ সাহায্য এবং প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের সহযোগিতায় স্থাপিত হয় ফিমেল নর্মাল স্কুল (শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়)। সামাজিক প্রস্তুতির অভাবের কথা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। মাত্র তিন বছর পর ১৮৭২ সালে শিক্ষার্থীর অভাবে নর্মাল স্কুলটি উঠে গেলে বিদ্যাসাগরের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় (প্রীতিকুমার মিত্র, ১৯৯৩ : ২৯১)।

নারীশিক্ষার জন্য নারীর স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টিপাত করেছেন বিদ্যাসাগর। *বাল্যবিবাহের দোষ* শীর্ষক পুস্তিকায় বাল্যকালে বিয়ে হবার কারণে নারীর স্বাস্থ্যগত নানা সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। এসব সমস্যা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। বাল্যবিবাহের ফলে নারী-পুরুষ উভয়েই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে মন যায়, নিজের নিজের জীবন তারা গঠন করতে পারে না। শিক্ষার অভাবে তাদের মেধা, শক্তি, সম্ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ হয় না। বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য, তাহাও বাল্যপরিণয় প্রযুক্ত ক্ষয় পায়। ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪ক : ৬৭৯-৮০)। এইভাবে নারীর সামূহিক

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর নানাভাবে চেষ্টা করেছেন এবং এর প্রধান উপায় হিসেবে নারীশিক্ষার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর কলকাতার সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের এক স্মরণসভায় সে-কথাই যেন ব্যক্ত হয়েছে। ১৮৯১ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপ্রধান কবি মানকুমারী বসু বলেন, "আমাদের দেশের গৌরব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগে আমাদের দেশে যে স্থান শূন্য হইয়াছে তাহা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার গুণের কথা আমাদের দেশে, আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই অবগত আছেন—উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে অনেকে হয়ত সাক্ষাৎভাবে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ঋষিতুল্য চরিত্র, অলোকসামান্য মনীষা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার অশ্রুতপূর্ব পরদুঃখকাতরতা, তাঁহার আশ্চর্য্য দানশীলতা, তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার নির্ভীকতা—আর কত গুণের কথা বলিব? একাধারে এত গুণের সমবায় বর্ত্তমান সময়ে আর দেখা যায় না। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসমাজ—সমগ্র ভারতবর্ষ এক প্রকারে নয়—বহু প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত। সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট ঋণী, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে সাহায্য করিয়া, বালবিধবাদিগের পুনঃসংস্কার বিধি প্রণয়ন করিয়া, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কদাচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়া তিনি ভারতরমণীকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সর্ব্বপ্রধান হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী হৃদয়বান্ সুহৃদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।" (সনৎকুমার গুপ্ত ও অন্যান্য, ১৯৯৮ : ৩৯)

উনিশ শতকের বাংলাদেশে যখন নারীশিক্ষা ছিল প্রায়-নিষিদ্ধ, সেকালে নারীশিক্ষার পক্ষে বিদ্যাসাগরের চিন্তার প্রাগ্রসরতা একুশ শতকের মানুষকেও বিস্মিত না করে পারে না। নারীশিক্ষা চিন্তায় গোটা এশিয়াতেই তিনি ছিলেন পথিকৃৎদের অন্যতম। উনিশ শতকে বসে বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা বিষয়ে যে প্রাগ্রসর ভাবনা ভেবেছেন, একুশ শতকের নারীবাদী তাত্ত্বিকদের ভাবনার সঙ্গেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ নারীশিক্ষা ভাবনায় বিদ্যাসাগর অব্যাহতভাবে প্রাসঙ্গিক ও আধুনিক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর এই নারীশিক্ষা ভাবনা রীতিমতো বিস্ময়কর। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর চিত্তলোক থেকে তিনি সরাতে চেয়েছেন অন্ধকার আর কুসংস্কার। প্রকৃত প্রস্তাবেই তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনা আধুনিক, প্রাগ্রসর এবং সমকালস্পর্শী।

৪. নারীশিক্ষা কর্মোদ্যোগ

বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবল চিন্তাই করেননি, সেই চিন্তাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য নানা উদ্যোগও গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন একজন কর্মবীর—সারাজীবনই তিনি কাজের মধ্যে থেকেছেন, কাজ করাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। লেখাই বাহুল্য যে, তাঁর কাজের

সিংহভাগই ছিল নারীর কল্যাণমূলক। নারীর শিক্ষার সঙ্গে তিনি যেসব কাজে জড়িত ছিলেন এবং যে-সব উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেছেন, আজকের দিনে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। রক্ষণশীল সমাজের বাধা, আর্থিক সংকট, নারী-শিক্ষকের অভাব, ঔপনিবেশিক সরকারের অসহযোগিতা—এসব বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে বিদ্যাসাগরকে নারীশিক্ষার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছে। একক হাতে তিনি যে কাজ করেছেন, জগদ্দল একটি সমাজে বাস করেও নারীশিক্ষার জন্য তিনি যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, বর্তমান অংশে তা উপস্থাপনের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

জনশিক্ষা সম্প্রসারণ ও নারীশিক্ষা প্রসার ছিল বিদ্যাসাগরের আজীবনের স্বপ্ন। যখন যেখানেই এ ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, বিদ্যাসাগর সদর্থক চিন্তা নিয়ে সেখানে সহায়কের ভূমিকায় হাজির হয়েছেন। ১৮৪৬ সালে ২৬ বছর বয়স থেকেই নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের কর্মোদ্যোগ শুরু হয়। এই বছর বাঙালির উদ্যোগে বারাসতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বারাসত-নিবাসী কালীকৃষ্ণ মিত্র উদ্যোগ গ্রহণ করলেও বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ও পরামর্শক। বিদ্যাসাগর বারাসত বালিকা বিদ্যালয়ে মাঝে-মধ্যে যেতেন এবং ছাত্রীদের পড়ালেখায় উৎসাহ দিতেন। স্কুলের কোনো ছাত্রী পড়ালেখায় ভালো করলে তিনি তাকে নানা উপহার দিতেন। এই বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা-সূত্রে কালীকৃষ্ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। বিদ্যাসাগরের উইল থেকেও জানা যায় কালীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর গভীর অনুরাগের কথা। বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে কালীকৃষ্ণ মিত্র রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ও সনাতনপন্থী হিন্দু নেতাদের তোপের মুখে পড়েন। তখন প্রবল সাহস নিয়ে বিদ্যাসাগর কালীকৃষ্ণের পাশে এসে দাঁড়ান। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচ কালীকৃষ্ণ একাই বহন করতেন। এর ফলে উত্তরকালে তিনি দারুণ অর্থকষ্টে নিপতিত হন। স্কুল পরিচালনার জন্য বিদ্যাসাগর তখন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। এমন কি, বন্ধুকে সহায়তার জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর উইলের সপ্তম ধারায়—"বারাসত-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মিত্র—কালীকৃষ্ণ মরিয়া গেলে তাহার বণিতা উমেশমোহিনী দাসী—১০্ দশ টাকা" হারে মাসোহারা পাবেন বলে উল্লেখ করে যান। (সফিউদ্দিন আহমদ, ২০০৮ : ১৭১)

বিদ্যাসাগর বাঙালি নারী-সত্তার সঙ্গে নিজেকে যেন একীভূত করে তুলেছিলেন। নারীর কল্যাণই ছিল তাঁর চিন্তার কেন্দ্রীয় ভিত্তি। ইংরেজ সরকার সহবাস-সম্মতি (live-together act) আইন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অভিমত জানতে চাইলে, তিনি ফরাসডাঙ্গা থেকে কলকাতায় এসে পাঁচ-ছয়দিনের ব্যাপক পরিশ্রমে বহু তথ্য ও নানা শাস্ত্রের আলোচনা করে এই আইনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছিল যুগান্তকারী এবং নারীজাতির পক্ষে কল্যাণকর। মানবধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গ্লানিময় জীবন থেকে নারীজাতিকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। নারীজাতিকে অবদমিত করে রাখার বহু শতব্দীব্যাপী পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভার তিনি

Dhaka University Institutional Repository

যেন একাই বহন করতে চেয়েছিলেন (শঙ্খমালা বসাক, ১৯৯৮ : ১১)। তাই সহবাস আইনের পরিবর্তে ইংরেজ সরকারকে তিনি নারীশিক্ষার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন (*বামাবোধিনী পত্রিকা*, ১২৯৮)। বিদ্যাসাগরের এই সিদ্ধান্ত ও অনুরোধ নিঃসন্দেহে বিপ্লবাত্মক এবং সাহসী।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। বড়লাটের কাউন্সিলের আইন-সদস্য ও শিক্ষা পরিষদের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৯ সালের ৭ই মে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা বাড়িতে (তখনকার ৫৬ নম্বর, বর্তমানে ৭১ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিট) সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালিকাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে স্কুলটি একাধিক নামে পরিচিত ছিল। কখনো এর নাম হয় ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল, কখনো হিন্দু ফিমেল স্কুল, কখনো-বা নেটিভ ফিমেল স্কুল। ১৮৫১ সালে বেথুনের মৃত্যুর পরে স্কুলটির নাম হয় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়, যা বর্তমানে বেথুন গার্লস কলেজ নামেই সুপরিচিত। ১৮৭৯ সালে যখন বেথুন বালিকা বিদ্যালয় কলেজে উন্নীত হয়, তখন সেটাই ছিল এশিয়ার প্রথম গার্লস কলেজ। ১৮৫০ সালের ৬ই নভেম্বর হেদুয়া পুকুরের পশ্চিম দিকে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বেথুনের পূর্ব-পরিচয় ছিল। বেথুন বিদ্যাসাগরের জ্ঞানস্পৃহা ও কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ ছিলেন। তাই তিনি ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সংশ্লিষ্টতা প্রত্যাশা করলেন। নিজের স্কুলের জন্য তিনি বিদ্যাসাগরকেই সম্পাদক হবার উপযুক্ত বিবেচনা করলেন। বেথুনের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিদ্যাসাগর ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের সম্পাদক হতে সম্মত হলেন। তবে তিনি জানিয়ে দিলেন, যেহেতু তিনি তখন সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন তাই তিনি এই দায়িত্বপালনের জন্য কোনো অর্থ নেবেন না, অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে কাজ করবেন। ১৮৫০ সালের ২২শে ডিসেম্বর ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে বিদ্যাসাগর কাজে যোগ দেন। সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব পালন করে অপরাহ্নে স্কুলে এসে সবকিছু তিনি দেখভাল করতেন। এসময় কখনো কখনো রাত্রি অবধি তিনি সংস্কৃত কলেজের যাবতীয় কাজ তত্ত্বাবধান করতেন—তাঁর বিশ্রাম বলে কিছু ছিল না। মনে হত, এতদিন পরে বিদ্যাসাগর তাঁর পছন্দমতো একটা কাজ পেয়েছেন। নারীর শিক্ষা তাঁর আজীবনের স্বপ্ন—ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল থেকেই যেন তার যাত্রা শুরু হল। উত্তরকালে তিনি যেসব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তার প্রাথমিক ধারণা ও কর্মকৌশল তিনি এখান থেকেই পেয়ে গেলেন।

বেথুনের যোগ্য সাহচর্যে বিদ্যাসাগর অতি নিরবে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের জন্য কাজ করতেন। বিদ্যাসাগরের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে ভর্তি হয়। বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা—ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে

Dhaka University Institutional Repository

ভর্তি করানো হয়। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ একারণে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিদ্যাসাগর দমে যাবার পাত্র নন। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কন্যাদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবার জন্য তিনি দিনরাত পরিশ্রম করেন। শেষ পর্যন্ত ২১ জন ছাত্রী নিয়ে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল যাত্রা শুরু করে। ১৮৪৯ সালের ১০ই মে স্কুলের প্রথম ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ক্লাসে ২১ জন ছাত্রীর মধ্যে ১১ জন উপস্থিত হয়—যার মধ্যে ভুবনমালা ও কুন্দমালা ও ছিল (নির্মল দাশ, ২০১৪ : ২০৫)। ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের প্রথম দিনের ক্লাস সম্পর্কে *The Calcutta Star* পত্রিকায় লেখা হয় : "Twenty one pupils were present and the little hindoo ladies being arranged on benches, Mrs. Ridsdale and Madan Mohan Tarakalankar duly enrolled their names and of four others whose fathers attended and explained sufficiently the cause of their absence." (Sunanda Ghosh, 2006 : 56)। *The Calcutta Star* পত্রিকা ২১ জন শিক্ষার্থীর উপস্থিতির কথা বললেও সেদিন প্রকৃতপক্ষে ১১ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল, ভর্তি হয়েছিল ২১ জন (লীনা সেন, ২০১৪ : ২০১)।

বেথুন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রথম থেকেই রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের বিরোধিতার মুখে পড়ে। স্কুলে যাতে মেয়েদের না পাঠানো হয়, সেজন্য তারা উঠে-পড়ে লেগে যায়। বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগতভাবে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের বোঝানোর পাশাপাশি তিনি একটি অভিনব কৌশল গ্রহণ করেন। মেয়েদেরও যে শিক্ষার সুযোগ ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে দেওয়া উচিত সে-কথাটা তাঁর স্বদেশবাসীকে মনে করিয়ে দেবার চিন্তা তাঁর মাথায় এলো। ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের ছাত্রীদের ঘোড়ার গাড়িতে করে গৃহ থেকে স্কুলে আনা হত এবং স্কুল থেকে গৃহে পৌঁছিয়ে দেওয়া হত। যে ঘোড়ার গাড়িতে করে মেয়েদের স্কুলে আনা হত, তার গায়ে দু'পাশে তিনি *মনুসংহিতা* থেকে সংকলিত একটি শ্লোক লিখে দিলেন—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" (বঙ্গার্থ : কন্যাকেও একইভাবে পালন করতে হবে এবং অত্যন্ত যত্নসহকারে শিক্ষা দিতে হবে।)। রক্ষণশীল সমাজ যেখানে শাস্ত্রের কথা তুলে নারীশিক্ষার বিরোধিতা করেছে, বিদ্যাসাগর সেখানে শাস্ত্র থেকেই নারীশিক্ষা-বিষয়ক শ্লোক উদ্ধৃত করে সেদিন কলকাতা-সমাজকে চমকে দিয়েছিলেন। মহানির্বাণতন্ত্রের এই শ্লোক গাড়ির উভয় পাশে খোদিত ছিল, যা সেদিন কলকাতার রাস্তায় নারীশিক্ষার বিজ্ঞাপন হিসেবে কাজ করেছে।

ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সরকারের কাছ থেকে কোনো অর্থসাহায্য গ্রহণ করেননি—তিনি নিজেই স্কুলের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। বেথুনের মৃত্যুর পর তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী ১৮৫১ সালের অক্টোবর মাস থেকে ভারত হতে বিদায় গ্রহণের সময় (১৮৫৬ সালের মার্চ মাস) পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয় বেথুনের মতো স্বয়ং বহন করে গেছেন

(রাধরমণ মিত্র, ১৯৯৪ : ৩৪২)। লর্ড ডালহৌসীর ভারত ত্যাগের পর বাংলা সরকার স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব ও আর্থিক ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে বেথুন গার্লস স্কুল সরকারি স্কুল হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এসময় বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে বেথুন স্কুলকে সিসিলি বীডনের তত্ত্বাবধানে রাখলেন। ১৮৫৬ সালের ১২ই আগস্ট সিসিলি বীডন বেথুন গার্লস স্কুল পরিচালনার জন্য বাংলা সরকারের কাছে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব পাঠান। পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে সিসিলি বীডন, সম্পাদক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আর সদস্য হিসেবে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষের নাম বাংলা সরকারের কাছে প্রস্তাবিত হয়। বাংলা সরকার সিসিলি বীডনের এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এভাবে ১৮৫৬ সালের আগস্ট মাস থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বেথুন গার্লস স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে আরম্ভ করেন।

ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের সম্পাদক হিসেবে বেথুন সৃজনী-প্রতিভা, দায়িত্ববান, উদ্যোগী এবং বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়ার মতো এমন একজনকে চেয়েছিলেন, যে প্রত্যাশার সবটাই পূরণ করেছেন বিদ্যাসাগর। বেথুনের জীবিতকালে যেমন, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরেও বিদ্যাসাগর বেথুন গার্লস স্কুলের জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। স্কুল পরিচালনার জন্য যাবতীয় খুঁটিনাটি দিকে তিনি সতর্ক নজর রাখতেন। বেথুন স্কুল পরিচালনা বিদ্যাসাগরের কাছে ছিল অনেকটা ব্রত পালনের মতো। তিনি চেয়েছেন বেথুন স্কুল দিন-দিন উন্নত হোক, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক নারীশিক্ষার আলো। তাই বেথুন গার্লস স্কুল সম্পর্কে যখনই কোনো বাধা বা সমস্যা এসেছে, বিচক্ষণতা আর সাহসিকতা দিয়ে তা মোকাবিলা করেছেন তিনি। ভারতবর্ষে বালিকা বিদ্যালয়গুলো কেমন চলছে তা সরজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য ১৮৬৭ সালে মেরি কার্পেন্টার নামের এক ইংরেজ নারী এদেশে আসেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই পর্যবেক্ষণ শেষে বছরের শেষদিকে তিনি কলকাতা আসেন। সরকারি মহলে মেরি কার্পেন্টারের ছিল ব্যাপক প্রভাব। কলকাতায় এসে সরকারি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় মেরি কার্পেন্টার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হন। বেথুন গার্লস স্কুলে মেরি কার্পেন্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এরপর এঁরা দু'জনে বাংলায় নারীশিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় মিলিত হতেন। একসঙ্গে তাঁরা মেয়েদের স্কুল পরিদর্শনে যেতেন। ইতঃপূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে তাঁরা যখন কলকাতায় ফিরছিলেন, তখন বিদ্যাসাগরের ঘোড়ার গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং তিনি গুরুতর আহত হন। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় মেরি কার্পেন্টার লক্ষ্য করলেন স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক পুরুষ। সামান্য যে'কজন নারী-শিক্ষক আছেন তাঁদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। মেরি কার্পেন্টারের মনে হল নারীশিক্ষার মান উন্নত করতে হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর জরুরি প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বেথুন গার্লস স্কুলে শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার বিষয়ে সরকারের বিবেচনার্থে জন্য একটি পরিলেখ প্রেরণ করেন তিনি। বাংলার

তৎকালীন ছোটলাট উইলিয়ম গ্রে প্রস্তাবটি বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দেন মতামত জানাবার জন্য। উইলিয়ম গ্রে বিদ্যাসাগরের কাছে চিঠিতে এমন কথাও জানিয়েছিলেন যে, বেথুন গার্লস স্কুলটিকে একটি শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা যেতে পারে, কারণ স্কুলটির জন্য সরকার যে পরিমাণ অর্থ খরচ করেন, সেই অনুপাতে ফললাভ হচ্ছে না (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১ : ৪২)।

উইলিয়ম গ্রের চিঠির উত্তরে বিদ্যাসাগর যে অভিমত প্রেরণ করেন বাংলায় নারীশিক্ষার ইতিহাসে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বেথুন গার্লস স্কুলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন কিংবা স্কুলটি বন্ধ করে সেখানে শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার তীব্র বিরোধিতা করেন বিদ্যাসাগর। চিঠিতে তিনি লেখেন, বেথুন গার্লস স্কুল সম্পর্কে অভিমত দেওয়ার ক্ষমতা আমি রাখি বলেই মেরি কার্পেন্টার বা আপনার প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি আমি। তিনি একথাও জানান যে, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন যে উদ্দেশ্যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন কার্পেন্টার বা আপনার প্রস্তাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেদিন যদি বিদ্যাসাগর বিচক্ষণতা দিয়ে এই স্কুলটিকে রূপান্তরের ঘোর বিরোধিতা না করতেন, তাহলে নারীশিক্ষার জন্য এশিয়ার একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানের অকাল মৃত্যু হত। উইলিয়াম গ্রের কাছে চিঠিতে বিদ্যাসাগর যা লিখেছিলেন, গবেষক তার সারবস্তু তুলে ধরেছেন এভাবে : "শিক্ষয়িত্রীদের জন্যে একটি ট্রেনিং স্কুল থাকা উচিত, মেরি কার্পেন্টারের এই অভিমত নীতিগতভাবে ঠিক, কিন্তু বাস্তবতার দিক্ দিয়ে অকেজো। এর কারণ হল, অল্পসংখ্যক সহায়-সম্বলহীন বিধবা ভিন্ন এই প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক পাওয়া যাবে না, যেহেতু জনমত স্ত্রীলোকদের এই উপজীবিকা অবলম্বনের বিরোধী।... আপনাকে এই আশ্বাস দেওয়া বাহুল্য যে, স্ত্রীলোক শিক্ষার্থী স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করবেন, এটাই যে আবশ্যক এবং বাঞ্ছনীয় তা আমি পরিপূর্ণভাবেই উপলব্ধি করি, কিন্তু সমাজ জীবন সম্বন্ধে আমার স্বদেশবাসীদের কতগুলি ভ্রান্ত ধারণা এ বিষয়ে অনতিক্রমণীয় বাধা স্বরূপ। তা যদি না হত, আমি সকলের আগে এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতাম, এবং সর্বান্তঃকরণে তাকে তার লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করে দেবার কাজে সহযোগিতা করতাম" (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১ : ৪২-৪৩)।

বেথুন গার্লস স্কুলটি তুলে দেবার প্রস্তাবের বিরোধিতা বিদ্যাসাগর করেছেন প্রধানত দুটি কারণে। প্রথম যুক্তিটি হল স্কটল্যান্ডবাসী ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বাঙালি নারীর দুরবস্থা দেখে তাদের শিক্ষার জন্য কলকাতায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতো একজন নারী-কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির নামে স্কুলটি তুলে দেওয়া যথার্থ নয়। বরং তাঁর স্মৃতি-রক্ষার্থেই স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দ্বিতীয় যুক্তিটি ছিল, এই স্কুলটির জন্য নারীশিক্ষা বিস্তার লাভ করেছে, সাধিত হচ্ছে মহোপকার। পার্শ্ববর্তী বা নিকটবর্তী সমধর্মী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে বেথুন গার্লস স্কুল আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছে। তাই স্কুলটি উঠে গেলে অন্যান্য স্কুলে তার

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব পড়বে এবং তা নারীশিক্ষার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে। বিদ্যাসাগরের চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধরণীয় :

> এর [বেথুন গার্লস স্কুল] সম্পূর্ণ অবলুপ্তি আমি অনুমোদন করতে পারি না। যে পরহিতব্রতী মহাপুরুষের নাম এই প্রতিষ্ঠানটি ধারণ করছে তিনি ভারতবর্ষে নারীদের মধ্যে জ্ঞানালোক বিতরণের কাজে যে পরিশ্রম করে গিয়েছেন তার স্মারক হিসাবেও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার উপর এর দাবী আছে, এই কথাই আমি বলব। তার পরের কথা হল, রাজধানীর একেবারে ভিতরে একটি সুসংগঠিত নারী শিক্ষায়তন অন্তর্দেশীয় অন্য সমধর্মী শিক্ষায়তনগুলির আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকবে, এটাও অত্যন্তই বাঞ্ছনীয় (উদ্ধৃত : হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১ : ৪৩-৪৪)।

—উপর্যুক্ত দ্বিবিধ অভিমত থেকে অনুধাবন করা যায় বিদ্যাসাগরের বিচক্ষণতা। মেরি কার্পেন্টারের প্রস্তাব অনুসারে বেথুন গার্লস স্কুলে নারী-শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা কিংবা উইলিয়াম গ্রে স্কুলটি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলাদেশে নারীশিক্ষার সম্ভাবনা ভয়ংকর দুর্বিপাকের মুখে পড়ত। একথা মেরি কার্পেন্টার কিংবা উইলিয়াম গ্রের বোঝার কথা নয়, কিন্তু সেদিন ঠিকই বুঝেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের অসম্মতির কারণেই মেরি কার্পেন্টারের প্রস্তাব গৃহীত হল না, রক্ষা পেল বেথুন গার্লস স্কুল। কিন্তু অসামান্য প্রভাব বিস্তারের কারণে মেরি কার্পেন্টারের প্রস্তাবের একটা বিকল্প পথ খুঁজে বের করল বাংলা সরকার। বাংলার বালিকা বিদ্যালয়সমূহে নারী-শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের দায়িত্ব যাতে শিক্ষয়িত্রীরা নিতে পারেন, সে-উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলা সরকার। ১৮৬৯ সালে মেরি কার্পেন্টারের প্রস্তাবের আলোকে মেয়েদের জন্য একটি নর্মাল স্কুল (শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ স্কুল) খোলা হল কলকাতায়। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ স্কুল বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অনুমানই সত্য বলে প্রমাণিত হল—জনসাধারণের দিক্ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত ১৮৭২ সালে বাংলা সরকার নর্মাল স্কুলটিকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। দেশের লোকেরা এখনো এমন একটি স্কুল খোলার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়, তাই উদ্যোগটি ব্যর্থ হল—একথাই অনেক আগে উইলিয়ম গ্রের কাছে জানিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এই পূর্বাভাস বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টিকেই অব্যর্থভাবে প্রমাণ করে।

১৮৫৪ সালে ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাংলাদেশের লেফ্টেনান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষানবিশ থাকার সময় হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের খুব কাছে এসেছিলেন। সেই সূত্রে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা নেওয়ার মনস্থির করলেন। কারণ হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের গুণাবলি, চরিত্রবল এবং কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ ছিলেন। বাংলাদেশের স্কুলসমূহে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রয়োগ করে শিক্ষাব্যবস্থা উন্নতির জন্য হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের সহযোগিতা প্রত্যাশা করলেন। হ্যালিডের প্রস্তাবানুসারে বিদ্যাসাগর সহযোগিতা করতে সানন্দে সম্মত হলেন। হ্যালিডের কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়ে বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

সরকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণ বাংলার স্কুলসমূহের স্পেশাল ইন্‌স্পেক্টর বা বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকেই তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এ কাজ পালন করতেন। দুটি দায়িত্ব পালনের জন্য বিদ্যাসাগর তখন মোট ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা বেতন পেতেন। নদীয়া, হুগলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুর—এই চার জেলার স্কুলসমূহ পরিদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিদ্যাসাগরকে। দায়িত্ব পেয়েই বিদ্যাসাগর বিপুল উৎসাহে কাজ করতে আরম্ভ করেন। কাজ করার জন্য তিনি নিজস্ব একটা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রত্যেক জেলায় একটি করে আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন বিদ্যাসাগর। আদর্শ স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল, এইসব স্কুলে শিক্ষার উন্নত মানকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়ে অন্য স্কুলসমূহ তা কাজে লাগাবে, এবং এসব স্কুলে প্রাগ্রসর ও সাম্প্রতিক বিষয়সমূহ যেভাবে পড়ানো হয়, অন্য স্কুলগুলোতেও তা অবলম্বিত হবে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন, ভালো শিক্ষক না পাওয়া গেলে আদর্শ স্কুল পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই পরিকল্পনার পরিপূরক হিসেবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ তাঁকে নিতে হল। এই স্কুলের নাম দেওয়া হল নর্মাল স্কুল। পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করার ফলে ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে প্রতি জেলায় একটি করে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানসম্পন্ন শিক্ষক পাবার জন্য নদীয়া, হুগলি,বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় একটি করে নর্মাল স্কুলও খোলা হল। এই স্কুলসমূহ পরিকল্পনা অনুসারে সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন বলে এবার একইভাবে নারীশিক্ষার দিকে মনোযোগ দিলেন বিদ্যাসাগর। মেয়েদের জন্য স্থাপিত মডেল স্কুলের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবার বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

১৮৫৪ সালের ১৯শে জুলাই ইংল্যান্ডের বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট চার্লস উড ভারতীয়দের শিক্ষাসংক্রান্ত ডেসপ্যাচ এদেশে পাঠান। ওই ডেসপ্যাচে ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ কাজেও ছোটলাট হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের সহায়তা চাইলেন। ইতোমধ্যে আদর্শ স্কুল ও নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যাসাগর অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাই মেয়েদের শিক্ষার জন্য তাঁর স্বপ্নের স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যাসাগর হ্যালিডের সহায়তা প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। দু'জনের পরামর্শে স্থির হল যে, সরকার সেইসব গ্রামীণ বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় সম্পূর্ণ বহন করবেন, যেগুলোর স্কুলভবন গ্রামবাসীরা নিজেদের ব্যয়ে নির্মাণ করে দেবেন। কালবিলম্ব না করে বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে নেমে পড়লেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র চারটি জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন তিনি। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ছোট মেয়েদের পর্যন্ত বুঝাতে আরম্ভ করলেন স্কুল খুললে তাদের কী উপকার হবে। বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল মেয়েরা তাদের অভিভাবকদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য (শিবরতন মিত্র, ১৯১৭ : ৯৪)। সংস্কৃত কলেজের

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এসব কাজ তদারকির জন্য বিদ্যাসাগরকে তখন অতি ব্যস্ত সময় অতিক্রম করতে হয়েছে।

১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাস—এই সাত মাস সময়ে নদীয়া-হুগলি-বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যাসাগর মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যেসব এলাকায় বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়গুলো স্থাপন করেন সে-স্থানগুলো তখন ছিল অনেকটা দুর্গম। চার জেলায় স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে হুগলি জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুর জেলায় ৩টি এবং নদীয়া জেলায় ছিল একটি। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর জেলাভিত্তিক তালিকা, স্কুলগুলোর নাম, গ্রাম, প্রতিষ্ঠাকাল এবং মাসিক খরচ নিচে উপস্থাপিত হল (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ৭০-৭২) :

হুগলি জেলা

স্কুলের নাম	প্রতিষ্ঠা কাল	মাসিক খরচ
পোটবা বালিকা বিদ্যালয়	২৪শে নভেম্বর, ১৮৫৭	২৯.০০ টাকা
পোটবা		
দাসপুর বালিকা বিদ্যালয়	২৬ শে নভেম্বর, ১৮৫৭	২০.০০ "
দাসপুর		
বঁইচি বালিকা বিদ্যালয়	১লা ডিসেম্বর, ১৮৫৭	৩২.০০ "
বঁইচি		
দিগশুই বালিকা বিদ্যালয়	৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭	৩২.০০ "
দিগশুই		
তালাণ্ডু বালিকা বিদ্যালয়	৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭	২০.০০ "
তালাণ্ডু		

হাতিনা বালিকা বিদ্যালয় হাতিনা	১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭	২০.০০ "
হয়েরা বালিকা বিদ্যালয় হয়েরা	১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭	২০.০০ "
ন'পাড়া বালিকা বিদ্যালয় ন'পাড়া	৩০শে জানুয়ারি, ১৮৫৮	১৬.০০ "
উদয়রাজপুর বালিকা বিদ্যালয় উদয়রাজপুর	২রা মার্চ, ১৮৫৮	২৫.০০ "
রামজীবনপুর বালিকা বিদ্যালয় রামজীবনপুর	১৬ই মার্চ, ১৮৫৮	২৫.০০ "
আকাবপুর বালিকা বিদ্যালয় আকাবপুর	২৮শে জানুয়ারি, ১৮৫৮	২৫.০০ "
শিয়াখালা বালিকা বিদ্যালয় শিয়াখালা	১লা এপ্রিল, ১৮৫৮	২০.০০ "
মাহেশ বালিকা বিদ্যালয় মাহেশ	১লা এপ্রিল, ১৮৫৮	২৫.০০ "
বীরসিংহ বালিকা বিদ্যালয় বীরসিংহ	১লা এপ্রিল, ১৮৫৮	২০.০০ "
গোয়ালমারা বালিকা বিদ্যালয় গোয়ালমারা	৪ঠা এপ্রিল, ১৮৫৮	২৫.০০ "

চণ্ডীপুর বালিকা বিদ্যালয়	৫ই এপ্রিল, ১৮৫৮	২৫.০০ "
চণ্ডীপুর		
দেপুর বালিকা বিদ্যালয়	১লা মে, ১৮৫৮	২৫.০০ "
দেপুর		
রাউজাপুর বালিকা বিদ্যালয়	১লা মে, ১৮৫৮	২৫.০০ "
রাউজাপুর		
মলয়পুর বালিকা বিদ্যালয়	১২ই মে, ১৮৫৮	২৫.০০ "
মলয়পুর		
বিষ্ণুদাসপুর বালিকা বিদ্যালয়	১৫ই মে, ১৮৫৮	২০.০০ "
বিষ্ণুদাসপুর		
বর্ধমান জেলা		
রানাপাড়া বালিকা বিদ্যালয়	১লা ডিসেম্বর, ১৮৫৭	২০.০০ "
রানাপাড়া		
জামুই বালিকা বিদ্যালয়	২৫শে জানুয়ারি, ১৮৫৮	৩০.০০ "
জামুই		
শ্রীকৃষ্ণপুর বালিকা বিদ্যালয়	২৬শে জানুয়ারি, ১৮৫৮	২৫.০০ "
শ্রীকৃষ্ণপুর		
রাজারামপুর বালিকা বিদ্যালয়	২৬শে জানুয়ারি, ১৮৫৮	২৫.০০ "
রাজারামপুর		
জ্যোৎ-শ্রীরামপুর বালিকা বিদ্যালয়	২৭শে জানুয়ারি, ১৮৫৮	২৫.০০ "

জ্যোৎ-শ্রীরামপুর		
দাঁইহাট বালিকা বিদ্যালয়	১লা মার্চ, ১৮৫৮	২০.০০ "
দাঁইহাট		
কাশীপুর বালিকা বিদ্যালয়	১লা মার্চ, ১৮৫৮	২১.০০ "
কাশীপুর		
সানুই বালিকা বিদ্যালয়	১৫ই এপ্রিল, ১৮৫৮	২৫.০০ "
সানুই		
রসুলপুর বালিকা বিদ্যালয়	২৬শে এপ্রিল, ১৮৫৮	৩১.০০ "
রসুলপুর		
বণ্ডীর বালিকা বিদ্যালয়	২৭শে এপ্রিল, ১৮৫৮	২০.০০ "
বণ্ডীর		
বেলগাছি বালিকা বিদ্যালয়	১লা মে, ১৮৫৮	২০.০০ "
বেলগাছি		

মেদিনীপুর জেলা

ভাঙ্গাবদ্ধ বালিকা বিদ্যালয়	১লা জানুয়ারি, ১৮৫৮	৩০.০০ "
ভাঙ্গাবদ্ধ		
বদনগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়	১০ই মে, ১৮৫৮	৩১.০০ "
বদনগঞ্জ		

শান্তিপুর বালিকা বিদ্যালয়	১৫ই মে, ১৮৫৮	২০.০০ "
শান্তিপুর		
নদীয়া জেলা		
নদীয়া বালিকা বিদ্যালয় নদীয়া	১লা মে, ১৮৫৮	২৮.০০ "

—উপর্যুক্ত ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য মাসে মোট ৮৪৫.০০ টাকা খরচ হত। ১৮৫৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত স্কুলের শিক্ষকগণের বেতন বাবদ মোট খরচ হয় ৩৪৩৯.৫০ টাকা। সরকারের আশ্বাসের ভিত্তিতে এই সমুদয় টাকা বিদ্যাসাগর নিজে বহন করেছেন। সরকারি সাহায্য মঞ্জুর না-হওয়া পর্যন্ত স্কুলগুলো যাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারে সেজন্য বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তাদের এই টাকা ধার দেন।

নিজের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর অর্থসংকট দূর করার জন্য বিদ্যাসাগর বাংলার ছোটলাট উইলিয়ম গ্রের কাছে আবেদন করেন। আবেদনপত্রে এই স্কুলগুলোর জন্য সরকারি অর্থসাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও বিদ্যাসাগর তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন। বিদ্যাসাগরের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উইলিয়াম গ্রে বিষয়টি জানিয়ে ভারত সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠান। রিপোর্টে উইলিয়ম গ্রে উল্লেখ করেন, ১৮৫৬ সালের ১লা অক্টোবরের পত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জানায় যে, বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে। এই স্কুলগুলোতে ছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো বেতন নেওয়া হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পূর্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া ছাড়াও নারীশিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে উইলিয়ম গ্রে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি খরচে ভবন নির্মাণ এবং কুড়ি জন ছাত্রী ভর্তি হলেই স্কুল পরিচালনার যাবতীয় খরচ কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮৫৮ সালের ৭ই মে তারিখে লেখা এক পত্রে ভারত সরকার বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে সরকারি সাহায্যের নিয়মের ব্যতিক্রম করতে অস্বীকার করেন। ভারত সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, উপযুক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থ-সহায়তা পাওয়া না গেলে এই ধরনের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়াই ভালো। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত বিদ্যাসাগরকে বেশ সমস্যায় ফেলে দেয়। স্কুলগুলো আরম্ভ হওয়া থেকে জুন মাস পর্যন্ত শিক্ষকবৃন্দ কোনো বেতন পাননি। এসময় তিনি নিজস্ব তহবিল থেকে শিক্ষকবৃন্দের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কোনো কোনো স্কুলের আনুষঙ্গিক কিছু খরচও নির্বাহ করেন বিদ্যাসাগর।

Dhaka University Institutional Repository

নব-প্রতিষ্ঠিত স্বপ্নের বিদ্যালয়গুলোর সম্ভাব্য পরিণাম ভেবে বিদ্যাসাগর খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্কুলগুলো তুলে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ১৮৫৮ সালের ২৪শে জুন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে একটি চিঠি লেখেন বিদ্যাসাগর। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন :"হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া এবং মেদিনীপুর জেলায় অনেকগুলি গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। বিশ্বাস ছিল, সরকার হইতে মঞ্জুরী পাওয়া যাইবে। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল গৃহ তৈয়ারি করাইয়া দিলে সরকার খরচ-পত্র চালাইবেন। ভারত সরকার কিন্তু ওই শর্তে সাহায্য করিতে নারাজ, কাজেই স্কুলগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষকগণ গোড়া হইতে মাহিনা পান নাই, তাঁহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া দরকার। আশা করি সরকার এই ব্যয় মঞ্জুর করিবেন" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৫ : ৭০)। বিদ্যাসাগরের এই চিঠি পেয়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বাংলা সরকারের কাছে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন :

> পণ্ডিতের [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] পত্রের সহিত সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ; কেননা, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে এই কর্মচারীর স্বেচ্ছাকৃত এবং অনাড়ম্বর পরিশ্রমের কথা সরকারের না জানাই সম্ভব। দূরবর্তী স্থানের অন্যবিধ কর্তব্যের গুরুভার যাঁহার উপর ন্যস্ত, কর্তৃত্বের বিশেষ উচ্চপদেও যিনি অবস্থিত নন, এমন এক ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীতও গ্রামসমূহে যদি এতটা করিয়া থাকিতে পারেন, সরকারের অনুমোদন ও সাহায্য পাইলে সেই দিকে কতটাই না তিনি করিতে পারিতেন? আর যদি আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইহাতে সেই কর্মচারীর অপমান ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে কি নিরুৎসাহের ভাবই না আসিয়া পড়িবে? (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৫ : ৭১)

ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের এই পত্র পেয়ে ছোটলাট উইলিয়ম গ্রে ভারত সরকারের কাছে একটি চিঠি লেখেন। ১৮৫৮ সালের ২২শে জুলাই তারিখে লেখা সেই চিঠিতে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের চিঠির সূত্র ধরে বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর ব্যয় পরিশোধের আবেদন বিবেচনার জন্য ভারত সরকারকে পুনরায় অনুরোধ করেন ছোটলাট উইলিয়ম গ্রে। ১৮৫৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর ভারত সরকার তাদের সিদ্ধান্ত উইলিয়ম গ্রে-কে একটি পরিপত্রের মাধ্যমে জানান। পরিপত্রে উল্লেখ করা হয় :

> দেখা যাইতেছে, পণ্ডিত [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই এ কাজ করিয়াছেন, এবং এ কাজ করিতে উচ্চতম কর্মচারীদের উৎসাহ ও সম্মতিও তিনি পাইয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া, এই বিদ্যালয়গুলিতে যে ৩৪৩৯.৫০ টাকা প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছে সেই টাকার দায় হইতে সপারিষদ বড়োলাট তাঁহাকে মুক্ত করিতেছেন। সরকার এ টাকা দিবেন, ইহাই তাঁহার আদেশ।
>
> পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলির, অথবা সেগুলির পরিবর্তে প্রস্তাবিত সরকারি বিদ্যালয়গুলির ব্যয় নির্বাহার্থ কোন স্থায়ী অর্থসাহায্য করিতে কাউন্সিলের সভাপতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। সমস্ত চিঠিপত্র বিবেচনার্থে সেক্রেটারী অফ স্টেটের নিকট প্রেরিত হইবে। হুগলী, বর্ধমান ও ২৪ পরগনায় বালিকা

Dhaka University Institutional Repository

> বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনধিক এক হাজার টাকার সাহায্যের জন্যও ইহাতে অনুরোধ থাকিবে। সেই টাকার কিয়দংশ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির সাহায্যার্থ এবং কিয়দংশ সরকার-সমর্থিত কতকগুলি মডেল স্কুলের জন্য ব্যয় করা হইবে। (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৫ : ৭২)

সময়ের এই পর্বে ভারতবর্ষে সীপাহি বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার সিপাহি বিদ্রোহ দমনের জন্যই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সরকার চরম আর্থিক সংকটে পড়লে বালিকা বিদ্যালয়গুলোর জন্য অর্থ সাহায্য করতে সরকার অসম্মতি জ্ঞাপন করে। তবে ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে তাঁরা ভাববেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন (জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪ : ৭৫)। সিপাহি বিদ্রোহের কারণে পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে সরকারি প্রতিশ্রুতির উপর বিদ্যাসাগর আর ভরসা রাখতে পারছিলেন না। ইতোমধ্যে ১৮৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর সরকারি চাকুরি থেকে বিদ্যাসাগর স্বেচ্ছাবসরে যান—পদত্যাগ করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে। বালিকা বিদ্যালয়গুলোর প্রতিষ্ঠা নিয়ে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সঙ্গে তীব্র বিরোধের কারণেই চাকুরি থেকে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন বলে মনে করা হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন এইকথা : "...বিতর্ক দু'জনের [বিদ্যাসাগর ও ইয়ং] সম্পর্কটাকে এত বেশি তিক্ত করে দিল যে, বিদ্যাসাগর তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করতে লাগলেন। ঊর্ধ্বতন কর্মচারী হিসাবে ইয়ং-এর স্থানটি ছিল সুবিধাজনক এবং তিনি যা করতে লাগলেন তাতে মনের তৃপ্তি হয় এমনভাবে নিজের কাজগুলি করে যাওয়া বিদ্যাসাগরের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। স্বভাবতই কাজে তাঁর আর উৎসাহ রইল না, এবং তিনি পদত্যাগ করবেন স্থির করলেন। তাঁর পদত্যাগপত্রে পদত্যাগের এমন কতকগুলি কারণের উল্লেখ ছিল, যাতে দুর্ভাগ্যবশত স্বয়ং লেফ্টেনান্ট গভর্নরের সঙ্গেও তাঁকে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতে হয়। এই ব্যাপারেও এই আশ্চর্য মানুষটির মনের ভিতরকার সদ্‌গুণগুলি খুব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল। দেশের প্রশাসনের একেবারে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিটিকে খুশি করবার জন্যেও তিনি নিজের নীতিবোধ থেকে উদ্ভূত মতবাদ ছাড়তে রাজী হলেন না" (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৪ : ৩২৫-২৬)। নিজের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর প্রতি ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে বিরোধের জেরই তাঁকে পদত্যাগের দিকে ঠেলে দেয়। বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতি অবহেলা কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রসঙ্গত তাঁর পদত্যাগপত্রটি একবার স্মরণ করা যেতে পারে। গর্ডন ইয়ং, ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন—এই ঠিকানায় পাঠানো ১৮৫৮ সালের ৫ই আগস্টে লেখা পদত্যাগপত্রে বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেন :

> এই সরকারি চাকরি সংক্রান্ত আমার সব কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে আমাকে নিরন্তর যে মানসিক শ্রম করতে হয় তা আমার স্বাস্থ্যকে এত বেশি ভেঙে দিয়েছে যে আমাকে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশের অনারেবল লেফ্টেনান্ট গভর্নরের কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে হচ্ছে। ... ছোট ছোট যে সমস্ত কারণে আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে, আমার পদোন্নতির সব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার

Dhaka University Institutional Repository

> পরিসমাপ্তি, এবং বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে আমার মনের প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সমর্থনের অভাব, যে-সমর্থন শিক্ষাবিভাগের প্রতিটি বিবেকী কর্মচারীর থাকা উচিত। (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৪ : ৩২৬)

সরাসরি না বললেও, বালিকা বিদ্যালয়সমূহ নিয়ে গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে বিরোধের জের ধরেই যে বিদ্যাসাগর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন, তা সহজেই অনুমেয়। অবশেষে নানা বাদানুবাদের পর ১৮৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর বিদ্যাসাগর তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অব্যাহতি নেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগের ফলে বিদ্যাসাগরের মাসিক আয় ৫০০.০০ টাকা কমে গেল। অন্যদিকে সরকারি অর্থ-সাহায্য না পাবার কারণে নিজের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর তখন বেহাল দশা। এমন পরিস্থিতিতেও হতাশ হলেন না বিদ্যাসাগর। বালিকা বিদ্যালয়গুলোর কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য 'নারীশিক্ষা ভাণ্ডার' নামে তিনি একটি তহবিল খুললেন এবং বিত্তবানদের সহায়তা প্রদানের জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁর আহ্বানে অনেকেই সাড়া দিলেন। তৎকালীন ছোটলাট সিসিলি বীডন বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাণ্ডারে প্রতি মাসে ব্যক্তিগতভাবে ৫৫.০০ টাকা করে দিতেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারি বার্টল ফ্রিয়ার, মিসেস ক্যানিং, উইলিয়ম গ্রে প্রমুখ বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাণ্ডারে নিয়মিত অর্থসাহায্য করতেন। এভাবে শুভাকাঙ্ক্ষীদের বদান্যতায় নারীশিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখতে সক্ষম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার কারণে বিদ্যাসাগরের সামনে এখন অফুরন্ত সময়। এসময় তিনি মনোনিবেশ করলেন গ্রন্থ রচনায় আর স্ব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে। নিয়ম করে পর্যায়ক্রমে তিনি প্রতিটি স্কুল পরিদর্শনে যেতেন। কখনো কখনো তিন/চার দিন একেকটি স্কুলে থেকে যেতেন। এসময় স্কুলের হিসাব, ছাত্রীদের পড়ালেখায় অগ্রগতি, শিক্ষকদের পাঠদান কৌশল, শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ—এসব বিষয় তিনি তত্ত্বাবধান করতেন। শিক্ষক-শিক্ষায়িত্রীরা কীভাবে ক্লাসে পাঠদান করেন তিনি তা সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করতেন। কখনো তিনি নিজে ক্লাস নিতেন, কখনো-বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের পাঠদান কৌশল শিক্ষা দিতেন। স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে তিনি গল্প করতেন, নানা উপহার দিতেন, পড়ালেখায় উৎসাহ দিতেন। ছাত্রীদের কোনো প্রকার শাস্তি যাতে না দেওয়া হয়—একথা তিনি শিক্ষকদের বার বার বলতেন। বিদ্যাসাগরের স্নেহ-ভালোবাসায় উৎসাহী হত ছাত্রীরা—পড়ালেখায় তারা হয়ে উঠত অধিক আগ্রহী (শিবরতন মিত্র, ১৯১৭ : ৭৬)। বিদ্যাসাগরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বালিকা বিদ্যালয়সমূহ এসময় নতুন উদ্যমে পঠন-পাঠনে মনোনিবেশ করে।

ইতঃপূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, ভারতবর্ষে নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে মিস মেরি কার্পেন্টার নামের এক ইংরেজ নারী ১৮৬৬ সালে কলকাতায় আসেন। কলকাতা পৌঁছে নারীশিক্ষার উদ্যোক্তা হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাসাগরের নাম তিনি জানতে পারেন। তৎকালীন ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন মি. অ্যাটকিনসনের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মেরি কার্পেন্টারের সাক্ষাৎ হয়। এরপর বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে নিয়ে মেরি কার্পেন্টার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে বালিকা বিদ্যালয়গুলো সচল রাখা এবং পঠন-পাঠন উন্নয়ন বিষয়ে মেরি কার্পেন্টারকে সদুপদেশ দেওয়া বিদ্যাসাগরের জন্য সহজ হল। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান মেরি কার্পেন্টার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মি. উড্রো, মি. অ্যাটকিনসন প্রমুখ। পরিদর্শন শেষে কলকাতায় ফেরবার পথে বালিতে বিদ্যাসাগরের গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে তিনি গুরুতর আঘাত পান—এই তথ্য ইতঃপূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় এইকথা যে, বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা প্রসারে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তার আলোকে অভিন্ন বিষয়ে মেরি কার্পেন্টারকে তিনি পরামর্শ দিতে পেরেছেন। কিন্তু বেথুন স্কুলে শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল খোলা নিয়ে মেরি কার্পেন্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতবিরোধ ঘটে। ফলে তিনি মেরি কার্পেন্টারের সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে আর যেতেন না বিদ্যাসাগর। বেথুন গার্লস স্কুলে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু সরকারি উচ্চ-মহলে প্রভূত প্রভাব থাকার কারণে সরকার বিদ্যাসাগরের মত অগ্রাহ্য করে মেরি কার্পেন্টারের প্রস্তাবানুযায়ী বেথুন স্কুলের মধ্যেই নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন মি. অ্যাটকিনসন বেথুন গার্লস স্কুল পরিচালনার জন্য এতকাল কর্মরত স্কুল কমিটি ভেঙে দিলেন এবং স্কুল পরিচালনার ভার স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মি. উড্রোর উপর ন্যস্ত করলেন। স্কুলের জন্য নতুন একটা কমিটি হল—নাম দেওয়া হল পরামর্শ সভা। মি. অ্যাটকিনসন ভূতপূর্ব পরিচালনা কমিটির সদস্যদের কাছে জানতে চান পরামর্শ সভার সদস্য হিসেবে তাঁরা কাজ করতে সম্মত আছেন কিনা? যদি সম্মত থাকেন তাহলে তাঁদের পরামর্শ সভায় রাখা হবে। ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে অ্যাটকিনসনের প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে বেথুন গার্লস স্কুলের পরিচালনা কমিটি থেকে ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। বেথুন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়কে বিদ্যাসাগর মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন। সেই স্কুলটির কোনো ধরনের ক্ষতি তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। তাই স্কুলের মধ্যে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন তিনি। স্কুল পরিচালনা কমিটি থেকে পদত্যাগের ফলে বেথুন গার্লস স্কুলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কেবল প্রাথমিক শিক্ষা নয়, নারীর উচ্চশিক্ষার বিষয়েও বিদ্যাসাগর গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নারীরা পরীক্ষা দিতে পারবে কি না, এ নিয়ে যখন বাদানুবাদ শুরু হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীর উচ্চশিক্ষার পক্ষে তাঁর দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এনট্রান্স থেকে স্নাতক—সকল পর্যায়ে নারীরা যাতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে বিদ্যাসাগর তার পক্ষে অভিমত প্রদান করেন। নারীদের উচ্চশিক্ষার বিষয়টিকে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) প্রতিষ্ঠার একুশ বছর পর ১৮৭৮ সালে সিনেটের এক সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪) নামের দুই ভগ্নি এই সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হলেন। ১৮৮৩ সালের বি.এ. পরীক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁরা উত্তীর্ণ হন। উল্লেখ্য, ব্রিটেনের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন কোনো নারী-শিক্ষার্থী স্নাতক উপাধি অর্জন করেনি, তখন বিদ্যাসাগরের একান্ত প্রয়াসে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাধি অর্জন করেন (সনৎকুমার সাহা, ২০১১ :)। পরের বছর চন্দ্রমুখী বসু এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। বিদ্যাসাগরের কাছে এই তথ্য বিশেষ আনন্দের উৎস হয়ে দেখা দিল। আপন অন্তরের আনন্দ তিনি জ্ঞাপন করলেন চন্দ্রমুখী বসুকে ক্যাসেলের একখণ্ড চিত্রশোভিত *শেক্সপীয়র রচনাবলি* উপহার দিয়ে। বিদ্যাসাগর নিজে স্বাক্ষর করে এবং স্বহস্তে যা লিখে চন্দ্রমুখীকে উপহারটি দিয়েছিলেন তার বঙ্গানুবাদ এই (হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১ : ৪৫) :

শ্রীমতী কুমারী চন্দ্রমুখী বসু
প্রথম বাঙালী মহিলা
যিনি মাস্টার অব আর্টস ডিগ্রি পেয়েছেন
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের,

তাঁর একজন আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী
ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা সকাশাৎ।

এ ছাড়া চন্দ্রমুখী বসুকে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়ে অভিনন্দনও জ্ঞাপন করেন। ওই চিঠিতে তিনি লেখেন :

শ্রীহরি
শরণম্

বৎসে চন্দ্রমুখি—

সেদিন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হইয়া সুখে কাল হরণ কর, এবং স্বজনবর্গের আনন্দদায়িনী ও সজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও, এই আমার আন্তরিক অভিলাষ ও ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এই সমভিব্যাহারে যৎকিঞ্চিৎ উপহার (Shakespeare’s Works) প্রেরিত হইতেছে। পরিগৃহীত হইলে নিরতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইব। কিমধিকমতি ১০ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল

Dhaka University Institutional Repository

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

(বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ৪৫০-৪৫১)

একথা ব্যক্ত হয়েছে যে, নিজের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য বিদ্যাসাগর নিজের বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। তবে যে-কোনো বালিকা বিদ্যালয় সচল রাখার জন্য বিদ্যাসাগর অর্থসাহায্য করতেন। ১৮৭৭ সালের ১০ই জুন কলকাতার *সাধারণী* পত্রিকায় বর্ধমানের কাশিয়াডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে এমন তথ্য প্রকাশিত হয় : "বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্মরণ করিয়া দিতেছি তাঁহার অতি যত্নের ধনের অন্তিম কাল উপস্থিত। অর্থাভাবে দিন দিন মলিন ভাব ধারণ করিতেছে। বালিকাগণের প্রতি একবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত করুন" (সুদিন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪ : ৩৮১)। পত্রিকায় এই সংবাদ দেখেই বিদ্যাসাগর কাশিয়াডাঙ্গা ছুটে যান এবং বালিকা বিদ্যালয়ের সব দেনা স্বেচ্ছায় পরিশোধ করে। স্বগ্রাম বীরসিংহের বালিকা বিদ্যালয়ের সব দায়ভারও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। অনুজ শম্ভুচন্দ্রের কাছে লেখা এক চিঠি থেকে এ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনোভাব জানা যায় : "জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল এই চারিমাসের বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা অর্দ্ধ বেতন পাইবেন। মে মাস হইতে সম্পূর্ণ বেতন দিব। উদয়রাজপুরে ১লা মে হইতে পুনরায় বালিকা বিদ্যালয় বসাইবে। বালিকা বিদ্যালয়ের পূর্ব্বোক্ত হিসাবে টাকা বৈশাখের ১০ নাগাদ পাঠাইব।" (সফিউদ্দিন আহমদ, ২০০৮ : ১১২)

বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ নারী-উন্নয়নমূলক অনেক কাজে বিদ্যাসাগর স্বেচ্ছায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার কারণে এসময় বিদ্যাসাগরের নির্ধারিত কোনো আয় ছিল না। ফলে বালিকা বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য ঋণ করে তাঁকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে। তাঁর এই ঋণের কথা বন্ধুমহলের অনেকেই জানতেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরকে না জানিয়ে বন্ধুরা বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, খোলা হয় তাঁর জন্য অর্থ-সহায়তা তহবিল। কলকাতার *Well Wisher* পত্রিকায় মুদ্রিত হল এই বিজ্ঞাপন : "Let us severally and jointly exert all we can to collect subscriptions from all quarters to which we have access, and place adequate funds in the hands of Vidyasagara, who cannot refuse to accept this trust, however, troublesome it may appear to be." (উদ্ধৃত : সুদিন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪ : ৩৮৪)। *National Paper*-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্রও তাঁর পত্রিকায় একই রকম আবেদন জানালেন। *Education Gazette* পত্রিকার সম্পাদক প্যারীচরণ সরকার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন সংস্কার কাজে বিদ্যাসাগরের পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণের কথা প্রকাশ করেন। প্যারীচরণের আবেদন পাঠ করে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করার জন্য তাঁর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তহবিলে টাকা জমা দিতে থাকলেন। বিদ্যাসাগর এর কিছুই

Dhaka University Institutional Repository

জানতেন না, তিনি তখন কলকাতার বাইরে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করে চলেছেন। কলকাতায় ফিরে আসার পর সবকিছু জেনে বিদ্যাসাগর ক্ষুণ্ন হলেন, তাঁর আত্মসম্মানে প্রবল আঘাত লাগল। ঋণমুক্ত হবার জন্য অন্যের কাছে সাহায্যের ঝুলি হাতে দাঁড়াতে তিনি রাজি নন। *Hindu Patriot* পত্রিকায় চিঠি লিখে তিনি জানিয়ে দিলেন এই অভিমত :

> I had not and have not the remotest idea of appealing to the public, I would not have felt it necessary to remonstrate against the agitation. But the national object for which I am labouring has been so much mixed up with me personally that I must protest against the move under notice and request those gentlemen who have initiated it to desist in their efforts. (সুদিন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪ : ৩৮৪)

— *Well Wisher* পত্রিকা বিদ্যাসাগরের এই প্রখর আত্মসম্মানবোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অর্থ সংগ্রহ অভিযান বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু *Education Gazette* সম্পাদক প্যারীচরণ সরকারকে বিনয়ী বিদ্যাসাগর লিখলেন এক চিঠি, যার অংশবিশেষ ছিল এরকম :" হে বন্ধুগণ! তোমরা আমায় রক্ষা কর, আমি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিব না। যিনি যাহা আমার উদ্দেশ্যে প্যারীচরণ বাবুর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি তাহা অবিলম্বে ফেরৎ লইবেন। আমার ঋণ আমিই পরিশোধ করিব" (সুদিন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৪ : ৩৮৪)। নারীশিক্ষা বিস্তার এবং নারী-কল্যাণের সকল কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই মানসিক তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নারীশিক্ষা বিস্তার যে বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান ব্রত, তা বোঝা যায় অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও মৃত্যুর এক বছর আগে ১৮৯০ সালে জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে মায়ের নামে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করতেন। মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত এই বালিকা বিদ্যালয়ই ছিল বিদ্যাসাগরের সর্বশেষ নারীশিক্ষা কর্মোদ্যোগ। নিজের উইলে বীরসিংহ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের জন্য মাসিক ১০০.০০ টাকা দেওয়ার বিধান রেখে দেন বিদ্যাসাগর (সফিউদ্দিন আহমদ, ২০০৮ : ১৭২)। কেবল বাঙালি নারী নয়, আদিবাসী নারীদের জন্যও তিনি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবন তিনি সাঁওতাল পরগনার কার্মাটারে অতিবাহিত করেন। এসময় সাঁওতাল বালক-বালিকাদের জন্য তিনি একটি পাঠশালা খোলেন। এই পাঠশালায় তিনি একাই শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা করাতেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার কথা ভেবেছেন, নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য নানামুখী কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। একক প্রচেষ্টায় স্বপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলো ছিল বিদ্যাসাগরের স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান।

তথ্যনির্দেশ

১. বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার মূল পাঠ পরিশিষ্ট-৪এ দ্রষ্টব্য।

২. জেমস আর ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টের মূল পাঠ পরিশিষ্ট-৫এ দ্রষ্টব্য।

৩. বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের পূর্ণপাঠ পরিশিষ্ট-৬এ দ্রষ্টব্য।

৪. শিক্ষা সংসদের রিপোর্ট পরিশিষ্ট-৭এ উদ্ধৃত।

অষ্টম অধ্যায়

নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও উদ্যোগের সামাজিক তাৎপর্য ও প্রভাব

আজ থেকে প্রায় একশ' পঁচাত্তর বছর পূর্বে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ আরম্ভ হয়। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে অনেক চিন্তা করেছেন, স্থাপন করেছেন অনেক প্রতিষ্ঠান, গ্রহণ করেছেন নানামাত্রিক উদ্যোগ। নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিদ্যাসাগর সর্বদা দেখেছেন বাঙালি নারীর স্বার্থ—বাঙালি নারীর উন্নতিকেই ভেবেছেন নিজের উন্নতি বলে। একশ' পঁচাত্তর বছর পূর্বে নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ যখন নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, বাঙালি সমাজে সেদিন ছিল তা অনেকটা বিপ্লবাত্মক। সন্দেহ নেই, দীর্ঘ এই সময়-পরিসর পেরিয়ে বাঙালি সমাজ নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। তবু ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ আজকের দিনেও অনেকাংশে প্রাসঙ্গিক—সময়ের এত ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁর চিন্তা প্রাসঙ্গিকতা কিংবা উপযোগিতা হারায়নি। বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর কাল থেকে অগ্রবর্তী সময়ের মানুষ—অলোকসামান্য দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন দেখতে পেতেন ভবিষ্যৎকে—তাই বুঝি তাঁর নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ এখনো আছে অব্যাহতভাবে প্রাসঙ্গিক।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি সমাজের খুব কম ব্যক্তিই নারীশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এবং হাতে-গোনা আর কয়েকজন মানুষের অক্লান্ত সাধনায় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে। গোটা বিশ শতকে নারীশিক্ষা ক্রমশই সামাজিক স্বীকৃতি পাচ্ছিল। তবে নারীশিক্ষার বিরোধী সামাজিক বাস্তবতাও একইসঙ্গে ছিল ক্রিয়াশীল। গবেষক জানাচ্ছেন এইকথা : "স্ত্রীশিক্ষাও একটু একটু করে বিস্তারলাভ করেছিল। স্ত্রীশিক্ষার বাস্তব অসুবিধাগুলি সবই ছিল, এ সম্বন্ধে রক্ষণশীলদের সমস্ত বিশ্বাসও অটুট ছিল—কিন্তু, কোন বাড়িতে মেয়েকে লেখাপড়া করাতে হলে অত্যন্ত গোপনে করাতে হবে বা মেয়ের পক্ষে লেখাপড়া করাটা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ, এই ধারণাটা বাঙালির (অন্ততপক্ষে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালির) মন থেকে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল" (সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, ১৯৯৫ : ৫৫)। নারী শিক্ষালাভ করলে পুরুষের সমকক্ষ হবে, সংসারে অশান্তি নেমে আসবে—উনিশ শতকে রক্ষণশীল সমাজের এই মনোভাব বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকেও বহমান আছে। এক্ষেত্রেই ছিল বিদ্যাসাগরের যুদ্ধ। প্রকৃত শিক্ষা দিলে নারীর চেতনায় নেতিবাদী মনোভাব সৃষ্টি হয় না বলে তিনি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি সেদিন যা শুরু করেছেন, একটু একটু করে আজ সে-ধারণা সম্প্রসারিত হয়েছে, পেয়েছে সামাজিক স্বীকৃতি।

শারীরিক ও প্রবৃত্তিগত পার্থক্যের কারণে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শিক্ষার কথা উনিশ শতকে ব্যাপকভাবে বলা হত। কিন্তু প্রথম থেকেই এই ধারণার ঘোর বিরোধী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা মূলত নারী-পুরুষের প্রচল সামাজিক বৈষম্যেরই প্রতিফলন মাত্র। নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নধর্মী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উনিশ শতকে শুরু করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আজ একুশ শতকে সে-ধারণা সর্বাংশে বাতিল হয়ে গেছে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগর সেদিন একাকী যেকথা বলেছিলেন, আজ তা বাস্তব সত্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। সামান্য কিছু ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাদ দিলে একথা আজ বলা যায়—বাংলা ভূখণ্ডে কারিক্যুলাম বা পাঠক্রমে এখন আর নারী-শিক্ষার্থী আর পুরুষ-শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কোনো বিধান নেই। বাংলাদেশে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বেও এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা যেত এমন তথ্য—সম্মিলিত মেধা-তালিকা এবং মেয়েদের মেধা-তালিকা। একই কারিক্যুলাম, একই সিলেবাস, একই প্রশ্নপত্র, অভিন্ন পরীক্ষা—অথচ পরীক্ষার ফল প্রকাশ দু'ভাবে। নারীশিক্ষা যে তখনো মূলস্রোতে পৌঁছাতে পারেনি—এ তথ্য হয়তো তারই পরিচায়ক। বর্তমানে এ ব্যবস্থার দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আর পরীক্ষার ফল প্রকাশে ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে কোনো বিভাজন করা হয় না। এই বিষয়টাই এদেশে প্রথম ভেবেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। স্মরণ রাখতে হবে বিষয়টা বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন আজ থেকে একশ পঁচাত্তর বছর পূর্বে। বিদ্যাসাগরের এই প্রাগ্রসর চিন্তা বাংলায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চার করেছে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব।

উনিশ শতকের অবরুদ্ধ প্রচল সমাজে খুব কম মানুষই ধর্ম-নিরপেক্ষ নারীশিক্ষার কথা ভাবতে পেরেছেন। প্রচলিত ধর্মমত নয়—বরং ব্যবহারিক বিধি এবং সদাচার সম্বন্ধীয় নিয়ম-কানুনকেই এখানে ধর্ম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সমাজের ধারণা ছিল—শিক্ষা লাভ করলে মেয়েরা ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে—সংশ্রবহীন হয়ে পড়বে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে। বিনয়, সুশীলতা, লজ্জা, দয়া, পতিভক্তি এবং গৃহস্থালি কাজে যত্নশীলতা—এইগুলোই বাঙালি নারীর গুণ বা ধর্ম—এমনই ছিল সামাজিক বিশ্বাস। শতাব্দী পরম্পরায় রক্ষণশীল সমাজ বলেছে যে শিক্ষালাভ করলে নারীর এই গুণ বা ধর্ম অন্তর্হিত হয়। শিক্ষার আলোক থেকে নারীকে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে রক্ষণশীল পুরুষগোষ্ঠী প্রচার করেছে বিস্ময়-জাগানিয়া তত্ত্ব :"...স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা কখনই এক হতে পারে না। কারণ, পুরুষের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায় তত ক্ষতি নেই, যতটা আছে মেয়েদের বেলায়। কারণ মেয়েদের ও ছেলেদের সামাজিক দায়িত্ব পৃথক। পুরুষের তুলনায় মেয়েদের ওপরই সংসার ও পারিবারিক নীতি রক্ষার দায়িত্ব —বিশ্বনিয়ন্তা রমণীজাতির উপরে এই গুরুভার [পরিবার রক্ষা করা]

Dhaka University Institutional Repository

অর্পণ করিয়া তাহাদের জীবন ধন্য করিয়াছেন” (সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, ২০১০ : ৬২)। নারীশিক্ষা সম্পর্কে সনাতন এই সামাজিক মিথ ভেঙে দেন বিদ্যাসাগর। তিনি জোরের সাথেই ধর্ম-নিরপেক্ষ নারীশিক্ষার কথা বলেছেন। বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকে এসে শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বজনীনতাকেই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়, যেমন বিবেচনা করেছিলেন উনিশ শতকের জগদ্দল পরিবেশে বাস-কারা অনুপম এক মানবতাবাদী দার্শনিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতাকেই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়, যা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর করেছিলেন উনিশ শতকে। এখনও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার বিরোধী শক্তি নারীশিক্ষাকে গর্হিত কাজ বলে মনে করে। কোনো-কোনো তাত্ত্বিক এমন কথাও বলেন যে, নারীদের নির্দিষ্ট একটা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করলেই চলে। পুরুষের মতো সবকিছু তাদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই। কখনো-কখনো ধর্মীয় ফতোয়া দিয়েও নারীদের শিক্ষা থেকে দূরে রাখা হয়। এমনও দেখা যায়, কোনো নারী শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হলে তাকে পারিবারিক-সামাজিকভাবে নিগৃহীত হতে হয়, কখনো তাকে প্রহৃত হতে হয়, কখনো-বা তার জীবনই হয়ে ওঠে বিপন্ন। উনিশ শতকে এই প্রবণতা যে আরো ভয়াবহ ছিল, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। বিদ্যাসাগর এই প্রবণতার বিরুদ্ধেই সামাজিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—এখানেই তাঁর প্রাগ্রসরতা। একুশ শতকের বিশ্বজনীন শিক্ষাদর্শনের মৌল প্রবণতার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলেও বিদ্যাসাগরকে একজন আধুনিক শিক্ষাচিন্তক হিসেবে অনায়াসে আবিষ্কার করা যায়।

যেহেতু নারীশিক্ষার ধারণা এসেছে পশ্চিম পৃথিবী থেকে, তাই উনিশ শতকে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ এলেই পশ্চিমী সভ্যতাকে দায়ী করা হতো। নারীশিক্ষার বিরোধীরা পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করে প্রচল সনাতন শিক্ষার কথা বলতেন। এখানেও বিদ্যাসাগর ছিলেন ব্যতিক্রম। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের জন্য তিনি ইংরেজি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। প্রথমে ঐচ্ছিক, পরবর্তী সময়ে ইংরেজি বিষয়কে তিনি আবশ্যিক করেন। তিনি নিজেও ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য শিক্ষকের কাছে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমে তিনি ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্যের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেন। স্বপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোতেও বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা আয়ত্তের জন্য ছাত্রীদের তিনি বলতেন এবং সেভাবে পাঠক্রম তৈরি করতেন। সংস্কৃত কলেজে দু'জন ইংরেজির অধ্যাপকের পরিবর্তে চারজন অধ্যাপক নিয়োগের জন্য ঊর্ধ্বতন মহলে প্রস্তাব পাঠান বিদ্যাসাগর। স্কুলের পাঠক্রমে তিনি পাশ্চাত্য-দর্শন অন্তর্ভুক্ত করেন—*চরিতাবলী* গ্রন্থে পাশ্চাত্য লেখক-গবেষক-দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন এবং সে-বই পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করেন। একুশ শতকের শিক্ষাচিন্তকদের মতো বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন সমন্বয়বাদী দার্শনিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় অঞ্চলের একটি সমন্বিত শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত করতে চেয়েছেন বাংলাদেশের নারী-শিক্ষার্থীদের। বিদ্যাসাগর

বুঝেছিলেন ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন ব্যতীত সামাজিকভাবে বাঙালি উন্নতি করতে পারবে না। তাঁর নারীশিক্ষামূলক পাঠক্রমে এই সমন্বয়ধর্মী চিন্তার প্রতিফলন লক্ষণীয়। একুশ শতকের এই সময়খণ্ডেও আমরা লক্ষ করছি নারীশিক্ষা তথা সামগ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয়ধর্মিতার উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিশ্বায়নের কারণে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক অনেক দ্রুত ও সহজ হয়েছে—সমন্বয় এখন অতি সাধারণ এক বৈশিষ্ট্য। অথচ পৌনে দু'শ বছর পূর্বে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। এইভাবে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রাগ্রসর শিক্ষাচিন্তা দিয়ে উত্তরকালীন শিক্ষাচিন্তকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন—শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জ্ঞান সমন্বয়ের আহ্বান জানিয়েছেন।

নারীশিক্ষা ব্যতিরেকে সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কোনক্রমেই সম্ভব নয়—বিদ্যাসাগরের এই ভাবনা বর্তমান সময়ের জন্যও সমান প্রাসঙ্গিক। তিনি যখন নারীশিক্ষার কথা বলেছেন, তখন নারী-শিক্ষার্থীকে স্কুলে আনার জন্য অভিভাবকদের নানাভাবে বুঝাতে হত, রক্ষণশীলদের বিরোধিতাকে মোকাবিলা করার জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করতে হত। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দশ বছর পরে ১৯০১ সাল গোটা বাংলায় মাত্র তিপ্পান্নটি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এইসব স্কুলে সর্বমোট এগারোশ' সত্তরজন ছাত্রী পড়ালেখা করত (সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, ১৯৯৫ : ৫১)। এই প্রবণতার এখন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন লক্ষ লক্ষ বাঙালি নারী স্কুলে যাচ্ছে, কোনো কোনো সময়ে দেখা যায় বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ছেলেদের চেয়ে মেয়ে পরীক্ষার্থী বেশি—প্রায়শই দেখা যায় মেধা-তালিকা এবং পাসের হারেও ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভালো করেছে। কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিকে এমন কথাও বলতে হয়—নারী-পুরুষের সমতা বিধানের জন্য আগামী পরীক্ষায় ছেলেদের আরও ভালো ফল করতে হবে। নারীরা ব্যাপক হারে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে বলে রাষ্ট্র পরিচালনাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে, সিদ্ধান্তগ্রহণে ভূমিকা রাখছেন নারী এবং এভাবেই বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও উদ্যোগ বর্তমান কাল পর্যন্তও প্রাসঙ্গিক থেকে তাঁর প্রাগ্রসর শিক্ষাচিন্তার শতাব্দী-উত্তীর্ণ সার্থকতা ঘোষণা করছে।

সমাজ-প্রগতির সঙ্গে নারীশিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতি যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সে-কথা বিদ্যাসাগর আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, নারীশিক্ষা ব্যতীত বাঙালি সমাজের কুসংস্কার দু'-চার শতাব্দীতেও উৎপাটন করা সম্ভব না-ও হতে পারে (বিনয় ঘোষ, ২০১১ : ২৩৮)। সমাজের শিক্ষিত পুরুষদের মনেও নারীশিক্ষা সম্বন্ধে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-সন্দেহ তিনি দেখেছেন—তাতে ব্যথিত হলেও, কখনো তিনি বিচলিত হননি। তিনি বিশ্বাস করতেন সামাজিক এই কুপ্রথা ও অপভাবনা একদিন দূর হবে। বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখা

যায়, এখনো নারীশিক্ষা নিয়ে মানুষের মাঝে বিরাজমান আছে দ্বিধা-সংশয়-সন্দেহ। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে বিদ্যাসাগর ও তাঁর উত্তর-সাধকদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় নেতিবাচক এই সামাজিক প্রবণতার মাত্রা অনেকটা কমেছে, পরিবর্তন ঘটেছে সামাজিক মানসিকতার। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এখন নারীশিক্ষার পক্ষে নেওয়া হচ্ছে অনেক বাস্তবধর্মী উদ্যোগ—এ উদ্যোগের জন্য বরাদ্দ করাও হচ্ছে অনেক অর্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর নারীশিক্ষা চিন্তা তথা শিক্ষাচিন্তা ও কর্মোদ্যোগ দ্বারা গতানুগতিক শিক্ষিত মানুষ সৃষ্টি করতে চাননি, তিনি চেয়েছেন প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি করতে। তাঁর গভীর আশা ছিল শিক্ষা যথাযথভাবে বিস্তার লাভ করলে বাঙালি একদিন কুসংস্কারমুক্ত হয়ে আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হয়ে উঠবে। সুদীর্ঘ পৌনে দু'শ বছরে তাঁর ধারণা যে বহুলাংশে সফল হয়েছে, তা স্বীকার করতেই হবে। সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করে আধুনিক ও উন্নত সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন বিদ্যাসাগরের মতো উনিশ শতকে আর কোনো বাঙালি চিন্তক ভাবেননি। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা ছিল প্রগতিশীল, বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানমনস্ক। বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও পদ্ধতি ছিল বাস্তবভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হঠকারী কোনো চিন্তার অনুগামী নয়। বাংলাদেশে জনশিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগর যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতেও ধরা পড়ে তাঁর বাস্তবভিত্তিক মনোবৃত্তি (practical mentality) ও সৃজনশীল চিন্তার (creative thought) ছাপ। বর্তমানে যে সর্বজনীন সাক্ষরতার কথা বলা হয়, বলা হয় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে সুপ্ত ছিল তার ভবিষ্যবিস্তারী বীজ। জনশিক্ষার জন্য তিনি নারীশিক্ষাকে প্রাথমিক ও শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি ভেবেছেন—নারী শিক্ষিত হলেই তার সন্তান শিক্ষিত হবে এবং প্রসারিত হবে জনশিক্ষা। জনশিক্ষা বিস্তার বা নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগরের সব উদ্যোগই ছিল 'মডেল পরিকল্পনা'। এই মডেলকে ভিত্তি করে একদিন সমগ্র বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তার লাভ করবে—এটাই ছিল বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন। বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা তথা শিক্ষাচিন্তার উত্তরপ্রভাবের কথা বলতে গিয়ে গবেষক যা বলেছেন এখানে তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> বস্তুত বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক ধারা সৃষ্টি করাই ছিল বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। এক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাটা ছিল একটা 'মডেল পরিকল্পনা'। এই মডেলকে ভিত্তি করে একদিন গোটা বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ধারা বিস্তার লাভ করবে এটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি যে একটা সুষ্ঠু ও সুস্থ প্রাতিষ্ঠানিক ধারার রূপরেখা প্রণয়ন করে গিয়েছিলেন, তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল বাঙালি সমাজে চোখ বুলালে পরিদৃষ্ট হয়। (আব্দুল মালেক, ২০১২ : ৯২)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পাঠ্য-বিষয়কে সহজ ও সাবলীলভাবে শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা। এ উদ্দেশ্যে তিনি সহজ-সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। ভাবতে বিস্ময় লাগে, সহজ-সাবলীল ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ রচনার ভাবনা বিদ্যাসাগরের

Dhaka University Institutional Repository

মাথায় এসেছে সেই কত আগে ! সে-সময় পাঠ্যগ্রন্থের ধারণাই ছিল না বাঙালি সমাজে। বরং যারা শিশুশিক্ষা বা পাঠ্যবই রচনা করতেন, তাদের ব্যঙ্গ করা হত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) পর্যন্ত শিশুশিক্ষা ও পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন বলে বিদ্যাসাগরকে ব্যঙ্গ করেছেন। বিদ্যাসাগরের রচনাকে বঙ্কিমচন্দ্র 'translation' এবং 'compilation of very good primers' বলে অভিহিত করেছেন ; কখনো-বা এমন মন্তব্য করেছেন :"He [Ishwarchandra Vidyasagar] is only a primer-writer....we deny that either translating or primer-making evinces a high order of genius." (উদ্ধৃত : সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, ১৯৭৬ : ৩০৩)। শিশুপাঠ্য রচনার জন্য আলোকিত মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রই যখন এমন লেখেন, তখন অন্যদের কথা সহজেই অনুমান করা যায়। এখানেই বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক অবদান। আজকের দিনে শিশুপাঠ্য এবং পাঠ্যবই রচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়—এক্ষেত্রে দেশে-দেশে পরিচালিত হচ্ছে নানামাত্রিক গবেষণা। অথচ বিদ্যাসাগর বিষয়টি ভেবেছেন উনিশ শতকে—রচনা করেছেন একাধিক শিশুপাঠ্য, প্রকাশ করেছেন একের-পর-এক পাঠ্যবই। সেসব বই রচনায় বিদ্যাসাগর অভাবনীয় পরিশ্রম করেছেন, করেছেন নানামাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এখন সরকারি উদ্যোগে স্বনামখ্যাত গবেষকদের দিয়ে লেখানো হয় পাঠ্যবই—সে-জন্য থাকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক মঞ্জুরী। বহু গবেষকের মিলিত সাধনায়, দেশি-বিদেশি গবেষক ও শিক্ষাবিদদের পরামর্শে এখন তৈরি হয় পাঠক্রম বা কারিক্যুলাম আর সে-কারিক্যুলামের আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যবই। ভাবতে বিস্ময় লাগে—এই গোটা কাজটিই বিদ্যাসাগর করেছেন একক হাতে। বিরুদ্ধ এবং বৈরী সমাজ-প্রতিবেশে বসে তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য কারিক্যুলাম তৈরি করেছেন, সে-কারিক্যুলামের আলোকে স্কুলপাঠ্য বই লিখেছেন, নারীদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল খুলেছেন—নারীমুক্তির জন্য বই লিখেছেন এবং নিজের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোর আর্থিক দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। একজন মানুষ এতসব কাজ কী করে করলেন, তা আজ ভাবনারও অতীত। বিস্ময় আরও, তাঁর অনেক ভাবনা এবং পাঠ্যবই এখনো প্রাসঙ্গিক এবং সমান জনপ্রিয়।

শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। যে-জ্ঞান আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করে, যে-জ্ঞান শিক্ষার্থীকে বাস্তবনিষ্ঠ হতে প্রেরণা দেয়—বিদ্যাসাগর সেইরূপ জ্ঞানসৃষ্টির স্বপ্ন দেখতেন—স্বপ্ন দেখতেন এমন একটি জ্ঞানঋদ্ধ সমাজের। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিদ্যাসাগরের—তাঁর এই মনোভাব বোঝার মতো মানুষ তখন উপনিবেশিত বাংলায় ছিল একান্তই দুর্লভ। ফলে একাই তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, উত্তরকালীন সমাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সামূহিক চিন্তার যে বিপুল প্রভাব পড়ার কথা, তা হয়ে ওঠেনি। সমকালে যেমন, উত্তরকালেও তাঁকে যথার্থভাবে বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠেনি বাঙালি জাতির। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তিও তাঁর কর্মপরিকল্পনায় নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে ;

লক্ষ্য অর্জনে তিনি যেন সফল না হন, এমন ধরনের কাজ করেছে। শিক্ষা ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর যে মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, অধিকাংশ বাঙালিই তা বুঝে উঠতে পারেননি, যারা বুঝতে পেরেছেন তারাও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াননি। বিদ্যাসাগর-গবেষক Asok Sen প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :"We have the example of a lonely soul like Vidyasagar, whose bold programmes of education and social reforms, fearless struggle against the irrational and the inhuman, and endless compassion for the poor and the distressed were largely frustrated by the absence of any wider social force to work for the relevant goals." (Asok Sen, 2016 : 5)। গবেষকের এই ব্যাখ্যার পরেও বলতে হয়, বিদ্যাসাগরের সংস্কারভাবনা ও শিক্ষাচিন্তার উত্তরপ্রভাব যথেষ্টই পরিলক্ষিত হয়, যা ইতঃপূর্বে বিশ্লেষিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাবনার একটা উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তাঁর শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা। পৌনে দু'শ বছর আগে বিদ্যাসাগর শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আজ তা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত এক পদ্ধতি। শিক্ষকতার পেশায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার অতীত। পৃথিবীজুড়ে এখন শিক্ষক প্রশিক্ষণের কত আয়োজন। প্রশিক্ষিত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানে শিশু-মনস্তত্ত্ব অনুধাবনে শিক্ষককে নানাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা প্রয়োগ করে পাওয়া যায় ইতিবাচক ফল। উনিশ শতকে বাংলাদেশে এই ধারণা ছিল না—সমাজপতিরা তখন শিক্ষক প্রশিক্ষণের কথা কল্পনাও করতে পারেননি। অথচ বিদ্যাসাগর কত আগে নারী-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কথা ভেবেছেন, স্থাপন করেছেন শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল। নারী-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা রক্ষণশীল সমাজ সুনজরে দেখেনি। এ উদ্যোগের জন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক ব্যঙ্গও সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনো কিছুতেই দমে যাননি—নিজস্ব ধারণা অনুসারেই পরিচালনা করেছেন নর্মাল স্কুল। কেবল নারীশিক্ষা নয়, সামগ্রিক শিক্ষার জন্যই বিদ্যাসাগরের এই উদ্যোগ ছিল সর্বাংশেই আধুনিক ও প্রাগ্রসর। বিদ্যাসাগরের এই চিন্তা ও উদ্যোগের উত্তরপ্রভাব সীমাহীন ও গভীরভাবে দূরসঞ্চারী। বিদ্যাসাগরের শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণের ভাবনা ভিন্ন একটি কারণেও তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু বাংলা অঞ্চলে নয়, সারা পৃথিবীতেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে নারী-শিক্ষকের দক্ষতা পুরুষ-শিক্ষকের তুলনায় বেশি বলে স্বীকৃত। কত আগে বিদ্যাসাগর এই কথাটি বলেছিলেন, তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। গবেষক লিখেছেন : "...Vidyasagar evolved the foundations of the two systems, viz. Circle System [model school] with its spread effect and Normal School System with its training effect, which later became the main agencies for the advance of primary education in this part of the country." (Asok Sen, 2016 : 31)। প্রাথমিক শিক্ষা তথা নারীশিক্ষা চিন্তায় বিদ্যাসাগরের

নর্মাল স্কুল ধারণা উত্তরকালে ব্যাপক প্রভাব সঞ্চার করেছে—একথা স্বীকার করতেই হবে। দেশীয় শিক্ষায় অযথা অর্থ ব্যয়েরও বিরুদ্ধাচরণ করেছেন বিদ্যাসাগর। লেফটেন্যান্ট গভর্নর হ্যালিডের কাছে লেখা এক চিঠিতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :"...that the present system upon which the department of Vernacular Education was conducted was a mere waste of money." (Subal Chandra Mitra, 1975 : 34)।

বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি নারীশিক্ষাকে কেবল নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তাঁর কালে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নারীদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা কল্পনাও করা যেত না। কলকাতা শহরেই মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠায় সামাজিক বাধার কথা ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রবল বিরোধিতার কথা। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই সামাজিক প্রবণতার বিপরীত স্রোতের মানুষ। কলকাতা শহরে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি গ্রামাঞ্চলেও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেছেন। হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলার একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রামের মানুষদের বুঝিয়ে, নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে তিনি এসব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বালিকা বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনার জন্য যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এগুলো বিদ্যাসাগর নিজের অর্থ দিয়েই সচল রেখেছিলেন।

বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থেই চেয়েছিলেন বাংলায় নারীশিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করুক। নারীশিক্ষাকে তিনি জাতীয় শিক্ষার অংশ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। নারী শিক্ষিত হলেই শিক্ষিত হবে গোটা জাতি—এই-ই ছিল বিদ্যাসাগরের আন্তরিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি দুর্গম গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে স্থাপন করেছেন বালিকা বিদ্যালয়। পৌনে দু'শ বছর পূর্বে বিদ্যাসাগরের এই চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস একুশ শতকের চোখ দিয়ে মূল্যায়ন করতে গেলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। একালে সারা পৃথিবীতেই নারীশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সব রাষ্ট্রই এখন স্বীকার করে নিয়েছে। ক্ষমতায়নের জন্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য, স্বাধীন নির্বাচনের জন্য নারীশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সেই শিক্ষাকে কেবল শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাই কেবল শহর নয়, গ্রামাঞ্চলেও নারীশিক্ষা বিস্তৃত করার নানামাত্রিক প্রয়াস গৃহীত হয়েছে পৃথিবীর দেশে দেশে। বিশ-একুশ শতকের এই প্রবণতা উনিশ শতকেই দেখা দিয়েছিল বিদ্যাসাগরের চেতনায়। নারীশিক্ষার আলো তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও। তবে

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন গ্রামাঞ্চলকেই। প্রায় সব দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাস করে গ্রামে। বাংলাদেশের জন্য একথা আরও গভীরভাবে সত্য। পৌনে দু'শ বছর পূর্বে বিদ্যাসাগরের এই ভাবনা যে কত প্রাগ্রসর ছিল, তা আজ সহজেই অনুমেয়। এখন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, দুর্গম এলাকায়, আদি নৃগোষ্ঠীর মানুষদের অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। অনেক গ্রামে এখন মেয়েদের জন্য মহাবিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের গ্রামেও আছে বালিকা বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত স্মরণ করবো, জীবনের শেষ পর্বে বিদ্যাসাগর যখন কার্মাটারের সাঁওতাল পরগনায় জীবন অতিবাহিত করেছেন, তখন সেখানে সাঁওতাল মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য তিনি খুলেছিলেন একটি পাঠশালা। এই পাঠশালায় তিনি দরিদ্র কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন সাঁওতাল বালিকাদের জীবনমুখী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রামাঞ্চলকে নির্বাচন করে সেদিন বিদ্যাসাগর যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তার সামাজিক গুরুত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত।

কোনো প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা বা অন্য কোনো বিষয়ে কোনো নারী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করলে বিদ্যাসাগর তাকে নানাভাবে উৎসাহিত করতেন। যারা পরীক্ষায় ভালো ফল করত, বিদ্যাসাগর তাদের পড়ালেখায় আরো উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপহার দিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চন্দ্রমুখী বসু নারী-শিক্ষার্থী হিসেবে প্রথম এম. এ. উপাধি অর্জন করলে বিদ্যাসাগর তাকে চিঠি দিয়ে ও উপহার পাঠিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই মহানুভবতা নারীশিক্ষাকে সহায়তা করেছে। উত্তরকালে তাঁর এই প্রবণতা অনেক শিক্ষাচিন্তকই গ্রহণ করেছেন। এভাবে বিবেচনা করলেও বিদ্যাসাগরের এই মানস-প্রবণতার সামাজিক তাৎপর্যকে গুরুত্ববহ হিসেবে শনাক্ত করা যায়।

বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বসংস্কারমুক্ত এবং আধুনিক। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি নারী-পুরুষ, বাঙালি-আদি নৃগোষ্ঠী, হিন্দু-মুসলমান—কোনো ধরনের বিভাজনকেই মান্য করেননি। তাঁর নারীশিক্ষা ধারণা দ্বারা অনেক সমাজচিন্তকই উত্তরকালে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। নারীশিক্ষার জন্য তাঁর দৃঢ়তা, অনমনীয়তা এবং মুক্তচিন্তা উত্তরকালে অনেককেই নারীশিক্ষা তথা নারী-স্বাধীনতা চিন্তায় ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) নাম উল্লেখ করা যায়। রোকেয়ার চিন্তা ও কাজের মধ্যে বিদ্যাসাগরকে আবিষ্কার করা সম্ভব। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য সমালোচকের এই অভিমত :

> নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর মুসলমান সমাজে দেখি, সাগরী-চেতনার অনুসারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে—সেই দৃঢ়তা, সেই সাহসী অনমনীয়তা, শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, সম্প্রদায়-নির্বিশেষে

> নারীস্বাধিকারের প্রবর্তনায়। স্মরণ করতে হয়, শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁর সাহসী রচনাবলির কথা, যা উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল শিক্ষিত সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও বিতর্ক সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে স্মতর্ব্য, রোকেয়ার 'ব্যাজ অফ স্লেফারি'-বিষয়ক অসাধারণ নিবন্ধটির কথা। আধুনিক চেতনা ও সেক্যুলার আদর্শের এই মহিয়সী নারীর সমগ্র জীবন নারীশিক্ষা বিস্তারে ও নারীস্বাধিকার অর্জনের লড়াইয়ে নিবেদিত। তাঁর মধ্যে দেখি অনমনীয় বিদ্যাসাগরকে। (আহমদ রফিক, ২০২০ : ১০)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের পরে অতিক্রান্ত হয়েছে একশ' তিরিশ বছর। ১৮৭০-এর পরে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ স্কুল বন্ধ হয়ে গেলেও, নারীশিক্ষার যে বীজটি তিনি রোপণ করেন, তা এ সময়ে আস্তে আস্তে অঙ্কুরিত হয়েছে– মেলেছে শাখা-প্রশাখা। তবু এখনো বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন অনেকাংশে অধরাই রয়ে গেছে। নানা কারণেই অধরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ও সংস্কারচেতনা, যা গবেষক তুলে ধরেছেন এভাবে :

> ...things were not what they appeared to Vidyasagar in his perspective of humanism and national order. Here Vidyasagar was entangled in a causality which he could not fully clarify, but whose effects destroyed his ideals. The fact of the British empire troubled intellectual upbringing in nineteenth-century Bengal. Reason for the unproductive few was mixed up with unreason for the productive multitude. This was so not merely because the toiling peasantry and workmen suffered ; their deprivation has borne the cross of many other enlightenments in history. In this case, they suffered not for nothing. Reason was thereby denuded of its social significance. Vidyasagar entered this world of anomalies, while believing he entered a world of potential reason. He thus found himself wandering on a deceptive road, where reason was reduced to mimicry. Vidyasagar boldly endealvoured to improve the fruits of enlightenment, but without fully comprehending or being able to remove the primal sources of their mangling. All his milestones had been elusive. (Asok Sen, 2016 : 165)

—গবেষকের এই উক্তিকে মনে রেখে বলতে হয়, যেমন বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর ছিলেন কালগঙ্গা। বহমান কালগঙ্গা সমুদ্রমুখী—শিক্ষা তথা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও উদ্যোগ বহমান কালগঙ্গার মতোই প্রবহমান (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬৩)। প্রসঙ্গত স্মরণ করব গোপাল হালদারের এই অভিমত : "...ইতিহাসের যে পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে বিদ্যাসাগর বাঙালী সমাজে উদিত হন– সেই পরিণতি পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে ওঠাও নিয়ম—সেই 'বহমান কালগঙ্গা'র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগ

Dhaka University Institutional Repository

মনে-প্রাণে-কর্মে অচ্ছেদ্য। তাই, কাল যতই এগিয়ে যাক বিদ্যাসাগরকে ছাড়িয়ে যাবে না। বিদ্যাসাগর থাকবেন আমাদের সঙ্গেই সহযাত্রী ও অভিযাত্রী। ...বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন শিক্ষাগুরু হবার জন্য। —তৎকালীন সমস্ত সাফল্য-ব্যর্থতার পরেও আজ দেখতে পাই—তিনি আধুনিক জাতীয় শিক্ষার যুগেও শিক্ষাগুরু। জাতীয় শিক্ষার যে ধারা তিনি বাধামুক্ত করতে চেয়েছিলেন, আমরা দেখেছি, তা তখন সুসম্ভব হয়নি—এখনও হয়েছে বলা যায় না, —কিন্তু তা এখনও বাতিল হবার মতো নয়" (গোপাল হালদার, ১৯৯৪ : ৩৫১)। বিদ্যাসাগরের নানামুখী চিন্তা, তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনা এবং এ-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড বাঙালি সমাজে যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল, আমাদের সমাজে তার প্রভাব চিরপ্রবহমান। ইতিহাসের ধূসর জগৎ অতিক্রম করে বিদ্যাসাগর সবসময় সাম্প্রতিক হয়ে আছেন। একথা তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনা ও কর্মপ্রয়াস সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য বিদ্যাসাগরের অব্যাহত এই সাম্প্রতিকতা সম্পর্কে গবেষকের নিম্নোক্ত উক্তি :

> যাঁরা ইতিহাস নির্মাণ করেন এবং এক সময় ইতিহাস হয়ে আমাদের থেকে দূরত্বে চলে যান, তাদের মধ্যে প্রধানত দু-ধরনের লোক থাকেন। এক, যাঁদের কথা আমরা ইতিহাস বইয়ে পড়ি, কিন্তু যাঁরা ওই বইয়ের পাতাতেই সমাধিস্থ থাকেন। তাঁদের অনেকের নাম ও বিবরণ আমাদের পাঠ্য মাত্র, মুখস্থ করার এবং (পরীক্ষার পরে, বহুলাংশে) ভুলে যাওয়ার বিষয়। ...আবার কিছু নাম নাছোড়বান্দার মতো আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। মানুষের শিশুর জীবন, বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন যেহেতু একটা 'হয়ে-ওঠা'র সরণিতে ফেলে দেওয়া হয়, এবং সবাইকে একটা শিক্ষাগত, আর্থনীতিক এবং সামাজিক সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়, সেহেতু সেই সিঁড়ির শেষে অনেকগুলি প্রতিকৃতি ঝোলানো থাকে মানবশিশুর দেখার জন্য। ইংরেজি ভাষায় আজকাল যাকে 'রোল মডেল' বলা হয় তাঁদের প্রতিকৃতি। বাঙালি শিশুর জন্য বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি তার একেবারে কেন্দ্রে থাকে।' (পবিত্র সরকার, ২০২০ : ১১)

একথা সমাজ ও শিক্ষাসচেতন সকলেই স্বীকার করবেন যে, নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের সামাজিক তাৎপর্য ও উত্তরপ্রভাব অপরিসীম। সমাজবাস্তবতার নিরিখেই বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার চিন্তা করেছেন এবং সে-চিন্তাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য গ্রহণ করেছেন নানামাত্রিক উদ্যোগ। বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও উদ্যোগসমূহ সময়ের সুদীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও এখনও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। প্রায় পৌনে দু'শ বছর পূর্বে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর গ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন কর্মপ্রয়াস। একুশ শতকের এই প্রাগ্রসর সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস সময়ের চেয়েও অনেক অগ্রবর্তী ছিল বলে বিবেচিত হবে। বিদ্যাসাগর-উত্তর কালে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যুগোপযোগী

Dhaka University Institutional Repository

নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে, গ্রহণ করা হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য অনেক পরিকল্পনা। বিদ্যাসাগর পৌনে দু'শ বছর পূর্বেই নারীশিক্ষার জন্য যে সব চিন্তা করেছেন এবং কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করেছেন, বর্তমানের প্রয়াসসমূহে বিদ্যাসাগরের সেই চিন্তার প্রভাব যে আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। সে-বিবেচনায় নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের সামাজিক তাৎপর্য ও প্রভাব অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

আধুনিক জেন্ডার ধারণার নিরিখে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মের মূল্যায়ন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। মানুষের কল্যাণ আর মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম ও লালিত হওয়া, সংস্কৃত কলেজে একযুগ পাঠগ্রহণ ও দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবেই সর্বসংস্কারমুক্ত মুক্তিচিত্তদ্রোহী একজন আধুনিক মানুষ। তাঁর চিত্তে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল মনুষ্যত্ববোধ। প্রসঙ্গত স্মরণে আসে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত : 'বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ—যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি-জীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন...। তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০২ : ৭৬৭)। বিদ্যাসাগরের চেতনায় প্রোথিত ছিল অজেয় মনুষ্যত্বের দ্বিবিধ লক্ষণ—দুর্জয় সাহস আর বীরত্বের পাশাপাশি এক অন্তহীন মানবিক করুণা, যা মানুষকে ভালোবাসারই অন্য নাম (পবিত্র সরকার, ২০২০ : ১৫)।

মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকেই বিদ্যাসাগর নারীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কেননা, বিদ্যাসাগর নারীকে কেবল নারী ভাবেননি, ভেবেছেন মানুষ। তাঁর কালে সমাজে এই ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, পুরুষের মতো নারীর শিক্ষালাভের প্রয়োজন নেই। প্রচলিত এই ধারণার বিরুদ্ধেই ছিল মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরের যুদ্ধ। আধুনিক নারীবাদীদের মতো, নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্যকে স্বীকার করেননি তিনি, বরং ভেবেছেন নারী ও পুরুষ সমান সমান। এবং এ কারণেই পুরুষের মতো নারীকেও তিনি শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। সেকালের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের এই চিন্তা ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। মনুষ্যত্ববোধে তিনি জাগ্রত ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সমাজের উজান স্রোতে গিয়ে নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়েছে নারীশিক্ষার জন্য নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ।

নারী-পুরুষের সমতার দৃষ্টিকোণে জগৎ ও জীবনকে বিবেচনা করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই সমতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই তিনি পুরুষের মতো নারীর শিক্ষার উপর বিশেষ নজর দিয়েছেন। সিমন দ্য বোভোয়ার উত্তরকালে যে বলেছেন—'One is not born, but rather becomes, a woman.' (Beauvoir, 1974 : 17), একথা যেন তাঁর পূর্বসূরী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মে আমরা লক্ষ করি। জন্ম-সূত্রে,

কিছু শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। সামাজিক পুরুষতন্ত্রই পুরুষসত্তা ও নারীসত্তার মাঝে সৃষ্টি করেছে বৈষম্যের দেয়াল। সামাজিক এই বৈষম্যের ধারণা যুগ-যুগ ধরে নারীকে পুরুষের অধস্তন করে রেখেছে, নারীকে বিবেচনা করা হয়েছে নিম্নস্তরের সত্তা হিসেবে। যেহেতু নারীরা হচ্ছে নিম্নস্তরের জীব, তাই তাদের শিক্ষার প্রয়োজন নেই—এমন সামাজিক ধারণার বিরুদ্ধেই যুদ্ধে নেমেছেন নারীবাদী তাত্ত্বিক ও সংগঠকেরা। *A Vindication of the Rights of Woman* গ্রন্থে Mary Wollstonecraft যে বলেছেন 'নারীকে অশিক্ষিত রেখে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ, মায়েরাই সন্তানের প্রথম শিক্ষক' (Mary Wollstonecraft, 1983 : 144), সে-কথাই যেন প্রতিভাত হয়েছে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মে। নারী ও পুরুষকে সমতার দৃষ্টিকোণে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন বলে পুরুষ-পৃথিবীতে অবস্থান করেও বিদ্যাসাগর নারীদের শিক্ষার জন্য চিন্তা করেছেন, কলম ধরেছেন, গ্রহণ করেছেন নানামাত্রিক উদ্যোগ। আমেরিকার নারীবাদী তাত্ত্বিক কেট মিলেটের মতো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বিশ্বাস করতেন, সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য নারী ও পুরুষের সমঅধিকারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মিলেট বলেছেন, এই সমঅধিকারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজের গভীরে প্রোথিত পরাক্রমশালী পুরুষতন্ত্রের শিকড় উৎপাটন করতে হবে (Kate Millet, 1978 : 62)। মিলেটের মতো সরাসরি না বললেও বিদ্যাসাগরও চেয়েছিলেন সমাজের পুরুষ-আধিপত্য দূর হোক, সমতার দর্শনে জেগে উঠুক সকলে—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। নারী ও পুরুষের সমতার এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি নারীকে শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। কেননা, তিনি মনে করতেন, যথাযথ শিক্ষা না পেলে নারীদের মধ্যেও প্রত্যাশিত সমতার ধারণা সৃষ্টি হবে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শিক্ষাবিদ-নারীবাদী চিন্তকদের অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

ক. ৮ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী

বাঙালি নারীর চেতনায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকারবোধ জাগ্রত করাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর অন্তর্গত সক্ষমতাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ভেবেছেন, লেখাপড়া জানা থাকলে নারী আত্মনির্ভর হতে পারবে—তার মধ্যে দেখা দেবে দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণতা। এটাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার মূল কথা (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২২শে জুন, ২০২১)।

খ. ৩ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী

সমাজের উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষের যৌথ অনুশীলন প্রয়োজন। কেউকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু এই ভাবনা এদেশে এখনো পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করেনি। তবে আমরা বিশ্বাস করি সংস্কৃতির হাজার রকমের জঞ্জাল থেকে বাঙালি নারী একদিন মুক্ত হবে। নারীর বেঁচে থাকা মানবিক ও রুচিশীল হবে। সে-ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর আমাদের সঙ্গে থাকবেন (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২রা এপ্রিল, ২০২১)।

Dhaka University Institutional Repository

> গ. ৯ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী
>
> নারীর সার্বিক মুক্তিই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাবনার মূল লক্ষ্য। বাঙালি নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ছিল একেবারে অচেতন। পারিবারিক-সামাজিক বাধা ও বিধানকে তারা অবলীলায় মান্য করে আসছিল। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর চেতনায় এ সূত্রেই বিদ্যাসাগর অভিঘাত তুলতে চেয়েছেন। নারীদের বিদ্যাসাগর অধিকার-সচেতন এবং আত্মমর্যাদাশীল মানুষ হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছেন (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১০ই জুলাই, ২০২১)।

ভারতের বিখ্যাত নারীবাদী তাত্ত্বিক কমলা ভাসিন (Kamala Bhasin) *What is a girl ? What is a boy* ? (1994) গ্রন্থে লিখেছেন—নারী ও পুরুষের বৈষম্যের কারণে কেবল নারীদের ক্ষতি হচ্ছে তা-ই নয়, পক্ষান্তরে ক্ষতি হচ্ছে পুরুষেরও এবং চূড়ান্ত অর্থে সমাজের। তিনি লিখেছেন—"Such gender differences do not harm only girls, they harm the entire family, community and country. Several rigid roles, qualities and responsibilities are imposed upon boys as well. They too are prisoners and victims of gender' (Kamala Bhasin, 1994 : 42)। নারীদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেও বিদ্যাসাগর নারী-পুরুষ সমতার দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন বলে পুরুষদেরও উদার এবং মুক্ত চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বিদ্যাসাগর মনে করতেন, সামাজিক লৈঙ্গিক পার্থক্য মূলত পুরুষতন্ত্রের সৃষ্টি। পুরুষ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে জেন্ডার বৈষম্য। সামাজিক লৈঙ্গিক পার্থক্য প্রকৃত অর্থে নারী-বিদ্বেষী—এ কারণে তা নারীর সক্ষমতাকে স্বীকার করতে চায় না। বরং চেষ্টা করে কিছুতেই যেন বিকশিত না হয় নারীর সক্ষমতা। নারীর সক্ষমতার বিরোধী বলেই সামাজিক পুরুষতন্ত্র নারী-পুরুষের জন্মগত প্রাকৃতিক অমিল বা পার্থক্যকেই বড় করে দেখে ও দেখায়—অবদমিত করে রাখে নারীর সক্ষমতার সম্ভাবনা। পুরুষতন্ত্রের এই চালাকি আর ভণ্ডামিটা যথার্থই ধরতে পেরেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এ কারণে নারী যাতে তার সক্ষমতার সম্ভাবনাটা বুঝতে পারে, সেজন্য তাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। নারীর চেতনায় সক্ষমতার এই ধারণা জাগরণের চেষ্টাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার কালোত্তীর্ণ বৈশিষ্ট্য, যা একালের নারীবাদী তাত্ত্বিকদের ধারণার সমার্থক হয়ে ওঠে। বস্তুত, বাঙালি নারীর চিত্তলোকে সক্ষমতার এই ধারণা সৃষ্টি বাঙালি সমাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে কারো ভাবনায় দেখা দেয়নি। কেউ কেউ হয়তো নারীশিক্ষার জন্য সামান্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু গভীরতর অর্থে সক্ষমতার বিষয়টি সেভাবে কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। এখানেই চিন্তানায়ক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কালোত্তীর্ণ সফলতা। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় নারীবাদী-সংগঠক ৪ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর এই অভিমত :

> মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি পদেই তাকে পরাধীনতার শেকল ভেঙে অগ্রসর হতে হয়। নারীও জন্মসূত্রে পূর্ণ মানব সন্তান। কিন্তু মানুষের সমাজেরই তৈরি প্রথা, নিয়ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আইন, ধর্ম ইত্যাদির নামে তাকে অর্ধমানব বা মেয়ে-মানুষ বানিয়ে ফেলা হয়। তখন নারীকে, নারীর সমর্থনকারী সমাজচিন্তক ও গোষ্ঠীকে সেই প্রথা, নিয়ম, ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালাতে হয়। ...নারীবাদ বলি বা জেন্ডারচেতনা বলি—এটাই হচ্ছে তার মূল কথা। এখন বিদ্যাসাগরের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে

> পাই। আমরা দেখি সেকালে বাঙালি নারী যখন নানা প্রথা ও নিয়মকানুনে পুরুষতন্ত্রের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে, বিদ্যাসাগর তখন সে-জাল থেকে নারীকে মুক্তি দেবার জন্য অনেক প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। যখন সমাজে কেউ জাগেনি, তখন জেগে উঠেছেন বিদ্যাসাগর। (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১১ই জুলাই, ২০২০)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মনে-প্রাণে বাঙালি নারীর মুক্তি কামনা করেছেন। তিনি চেয়েছেন পারিবারিক-সামাজিক বন্দি অবস্থা থেকে বাঙালি নারীরা মুক্ত হয়ে স্বাধীন মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠুক। তাঁর সমকালে সমাজপতিরা যেখানে মুক্তি নয়, বরং কীভাবে নারীকে গৃহবন্দি রাখতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণে ছিলেন তৎপর, সেখানে বিদ্যাসাগর একক প্রচেষ্টায় নারীমুক্তির জন্য গ্রহণ করেছেন বহুমাত্রিক উদ্যোগ। বিধবা নারীর দুর্ভোগের কথা কল্পনা করে তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছেন, বন্ধ করতে চেয়েছেন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে দৃঢ়হাতে কলম ধরেছেন—এ সবকিছুই মূলত তাঁর নারীমুক্তির ভাবনা থেকে উৎসারিত। নারীমুক্তির উপায় হিসেবেই তিনি নারীজাতিকে শিক্ষিত করার কথা ভেবেছেন এবং সে-উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করেছেন নানা উদ্যোগ। সেকালের সমূহ বাধার কারণে বিদ্যাসাগর তাঁর পরিকল্পনা মতো অনেক উদ্যোগই গ্রহণ করতে পারেননি। এক্ষেত্রে রক্ষণশীল সমাজের মতো ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রশাসনও বিদ্যাসাগরের উদ্যোগের পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে কোনোভাবেই তাঁর পরিকল্পনা থেকে বিরত করা যায়নি। নারীর সামূহিক মুক্তির জন্য তিনি এককভাবে একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, স্বপ্ন দেখেছেন শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে একদিন বাঙালি নারীরা মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

নারীমুক্তির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিমুখী উদ্যোগের পরিকল্পনা করেছিলেন। একদিকে তিনি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ নিরোধ এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য সামাজিক আন্দোলন করেছেন ; অন্যদিকে নারীজাতিকে জাগ্রত করার মানসে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রহণ করেছেন নানা উদ্যোগ। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদের অভিমত উল্লেখ করা যায় : 'নারীর মুক্তির জন্য বিদ্যাসাগর দুই ক্ষেত্রেই জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন, সমাজে প্রচলিত বিবাহপ্রথার পরিবর্তন ঘটলে নারীর মুক্তির পথ সুগম হবে। আবার নারীশিক্ষা বিস্তার লাভ করলে এই পথ সহজ হয়ে উঠবে। ... বিদ্যাসাগর সমাজ ও পরিবারে বন্দি নারীদের চেতনায় অধিকারবোধ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনার এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। নারীকে তিনি নারী হিসেবে নয়, পূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। নারীর শিক্ষালাভের বিষয়টা তিনি সে-ভাবেই কল্পনা করেছেন' (৬ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২০শে জুন, ২০২১)। শিক্ষা না থাকলে নারী যে আত্মনির্ভর হতে পারবে না, একথা বিদ্যাসাগর যথার্থই বুঝতে

পেরেছিলেন। পরিকল্পনার এই দ্বিমুখিতা বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বিধবার বিয়ে হলেই যে তার মুক্তি ঘটবে, তা নয়। বরং তিনি পুরুষতন্ত্রের নতুন শিকারে তিনি পরিণত হতে পারেন। তাই সম্ভাব্য দুর্গতির হাত থেকে নারীজাতিকে রক্ষা করার মানসে বিদ্যাসাগর তাদের গৃহস্থালি নয় বরং সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তিনি ভেবেছেন, শিক্ষা-প্রযুক্তি হাতে থাকলে শত বিপর্যয়ের মধ্যেও নারী খুঁজে নিতে পারবে তার আত্মনির্ভরতার পথ। পৌনে দু'শ বছর পূর্বে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গির এই সম্পূর্ণতা লক্ষ করলে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। বিদ্যাসাগরের পূর্বে ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায় এবং গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ এবং পাশ্চাত্যে মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট ছাড়া অন্য কোনো দার্শনিক কিংবা সমাজসংস্কারক নারীজাতির মুক্তির জন্য উদ্যোগী কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেননি। সে-বিবেচনায় বিদ্যাসাগরকে প্রাথমিক যুগেরই জেন্ডার-সচেতন একজন শিক্ষাতাত্ত্বিক হিসেবে অনায়াসে শনাক্ত করা যায়। এটাই ঐতিহাসিক সত্য যে, কুলীন ব্রাহ্মণ হিসেবে নারীর অবরুদ্ধতার পথে যাওয়া বিদ্যাসাগরের জন্য হতে পারত স্বাভাবিক এবং যুগোপযোগী আচরণ, কিন্তু সে-পথে না গিয়ে উল্টো নারীর মুক্তি ও আত্মনির্ভরতার পথ তিনি সন্ধান করলেন—নারী জাতির চেতনায় জাগ্রত করলেন নিজস্ব সম্ভাবনার ধারণা। বাঙালি নারীর মুক্তির ইতিহাসে এটাই বিদ্যাসাগরের অক্ষয় অবদান। শিক্ষাবিদ ১ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর মতে : "বিদ্যাসাগরের সমকালে নারীবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হয়নি। তবে নারীবাদী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যকে সহজেই মেলানো যায়। বিশেষত তাঁর অনেক ধারণার সঙ্গে একালের উদার নারীবাদীদের চিন্তার মিল আছে। বাংলায় তাঁর হাত ধরেই নারীমুক্তির কথা জোরে-শোরে বিকাশ লাভ করে। বাংলায় নারীমুক্তির ইতিহাসে এটাই বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক অবদান" (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৫ই নভেম্বর, ২০১৯)।

উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা বর্তমানের জেন্ডার-সচেতন সমাজচিন্তকদের একটা প্রধান প্রয়াস। উন্নয়নের মূল ধারায় নারী যতদিন সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত না হবে, ততদিন তার সামাজিক মর্যাদা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা পুরুষতান্ত্রিক পৃথিবী কখনো স্বীকার করবে না। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা তাই কীভাবে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতের সাথে সম্পৃক্ত করা যায়, সে-বিষয়ে বহুমাত্রিক চিন্তা করেছেন। একুশ শতকের নারীবাদীদের ভাবনায় এ বিষয়টিই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এ ক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর কাল থেকে অনেক অগ্রবর্তী সময়ের মানুষ। সামাজিক বাস্তবতার কারণে উন্নয়নের ধারায় নারীর সম্পৃক্ততার কথা সরাসরি বলতে পারেননি বিদ্যাসাগর, কিন্তু তাঁর নানা কর্ম ও চিন্তায় ওই উন্নয়নভাবনাই পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা দান, শিক্ষিকা-প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠা, কিংবা সাঁওতাল জনপদে আদিবাসী নারীদের জন্য বাস্তব প্রয়োজনভিত্তিক বিষয় পাঠদান—এসব প্রয়াসের মধ্যেই

বিদ্যাসাগরের নারী-উন্নয়ন ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। সমাজের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই নারীর উন্নয়ন ছাড়া প্রকৃত সামাজিক উন্নয়ন হতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় নারী-সংগঠকের এই মন্তব্য :

> ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন activist মানুষ। তিনি কেবল চিন্তাই করতেন না, সে-চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যথাযথ কাজও করতেন। নারীর উন্নয়নকে তিনি সমাজ-উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী—তাই উন্নয়নের পথে নারী পিছিয়ে থাকলে সমাজের উন্নয়ন কিছুতেই হতে পারে না। উন্নয়নের পথযাত্রায় নারীকে যথাযথ শিক্ষা নিয়ে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিদ্যাসাগর এবং সে-লক্ষ্যেই গ্রহণ করেছেন বহুবিধ উদ্যোগ। এসব উদ্যোগের মধ্যে সমাজসংস্কার এবং নারীশিক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় (৫ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৫ই জুলাই, ২০২১)।

এ কারণেই এ কালের জেন্ডার-সচেতন উন্নয়নতাত্ত্বিকেরা নারীশিক্ষার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জাতীয় উন্নয়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং আর্থ-সামাজিক অসমতা দূর করতে নারীশিক্ষার বিকল্প নেই। বস্তুত, নারীসমাজ মানবিক পুঁজির একটি বিপুল সম্ভাবনাময় উৎস (আতিউর রহমান, ২০০২ : ১১৯ ; B. Capra, 1966 : 4)। নারীর শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, সামাজিকভাবে বেড়ে যায় নারীর গুরুত্ব। আধুনিক উন্নয়নতাত্ত্বিক এবং জেন্ডার-বিশেষজ্ঞদের এই ধারণা বিদ্যাসাগরের কালে দেখা দেয়নি। অথচ কী বিপুল অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্যাসাগর শিক্ষার মাধ্যমে সেদিন উন্নয়নের মূল ধারায় আনতে চেয়েছেন বাঙালি নারীকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে শিক্ষা থেকে দূরে রেখে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে তাকে করা হয়েছে পরাধীন, শৃঙ্খলিত এবং অকর্মণ্য (শ্যামলী আকবর ও অন্যান্য, ১৯৯৮ : ১)। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বেই পুরুষ-পৃথিবীর এই ফাঁকিটা ধরতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই সচেতনভাবে শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে তিনি সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন উন্নয়নের মূল স্রোতের সঙ্গে। একুশ শতকের এই জেন্ডার-সচেতনতার যুগে বিদ্যাসাগরের এই প্রয়াসকে বৈপ্লবিক বলেই আখ্যায়িত করতে হয়। নারীবাদী সংগঠক ৪ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এ প্রসঙ্গে বলেন :

> একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের কাজে যুক্ত হয়েছে সিডও সনদ বাস্তবায়ন, বেইজিং, বেইজিং+১০, আজকের বিশ্ব ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া, বিশ্বায়নের ভালোমন্দ, জেন্ডার ইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভূমিকা, রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবারের দায়িত্বকে তাই আজ নতুন করে নারী আন্দোলনের কাজে দেখতে হবে। সন্দেহ নেই, এই দেখায় আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাঙালি সমাজে নারীমুক্তির পথিকৃৎ হিসেবে পাই। বিদ্যাসাগর, রোকেয়া, সুফিয়া কামাল প্রমুখের আন্দোলন ও চিন্তা আজকের নারীবাদী চিন্তা ও নারীশিক্ষার জন্য যে-সব প্রয়াস গৃহীত হচ্ছে সেক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১১ই জুলাই, ২০২০)।

শিক্ষায় নারীর অধিকার প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ছিল প্রবলভাবে অস্বীকৃত। কখনো সীমিত পরিমাণে ইতিবাচক প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও, যুগ-যুগ ধরেই নারীশিক্ষাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা হয়েছে, কখনো করা হয়েছে উপহাস। আধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিকরা মনে করেন উন্নতি, ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন—এসবের জন্য পুরুষের যেমন শিক্ষার দরকার, তেমনি শিক্ষার দরকার নারীরও। শিক্ষার মধ্যেই নিহিত সমাজের সামূহিক মুক্তি। একথা পুরুষের বেলায় যেমন সত্য, তেমনি সত্য নারীর ক্ষেত্রেও। একালে ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। নারীর ক্ষমতায়ন না ঘটলে তার অধিকার কখনো স্বীকৃত হবে না। বিদ্যাসাগর এই জায়গাটিতেই কাজ করেছেন। দু'ভাবে তিনি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। এ কালের মতো সেকালেও সমাজের মূল ক্ষমতাটা পুরুষদের হাতেই ছিল। তাই নারীকে ক্ষমতায়নের পথে নিতে হলে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে পুরুষদেরই। এজন্য নারীশিক্ষা প্রসারের কথা তিনি পুরুষদের কাছেই প্রথমে বলেছেন, বেথুন ফিমেল স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরুষদের বুঝিয়েছেন, পুরুষতান্ত্রিক শাস্ত্রীয় যুক্তিকে শাস্ত্র দিয়েই খণ্ডন করে নারীশিক্ষার জন্য পুরুষদের আপন চিন্তার সহযোগী করতে চেয়েছেন। এই প্রয়াস ছিল বিদ্যাসাগরের চিন্তার অতলস্পর্শী প্রাগ্রসরতা। নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কেবল ভারতীয় সমাজপতিদের নয়, ঔপনিবেশিক প্রশাসনকেও নিজের মত সমর্থন করার পথে তিনি নিয়ে এসেছেন। হুগলি-বর্ধমান-মেদিনীপুর-নদীয়া—এই চার জেলায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রশাসনের সমর্থন আদায় করেছিলেন বিদ্যাসাগর। অন্যদিকে, নারীদেরও তিনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে মেয়েদের তিনি বুঝাতেন, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি হবার আহ্বান জানাতেন, শিক্ষার প্রতি তাদের করে তুলতেন আগ্রহী। এ কাজে তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল নারীর ক্ষমতায়ন। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন নারীমুক্তির জন্য নারীর ক্ষমতায়নের কোনো বিকল্প নেই—ক্ষমতায়নই হচ্ছে নারীমুক্তির অন্যতম হাতিয়ার। প্রসঙ্গত একথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নারীর এই ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিদ্যাসাগর সরাসরি বলেননি, কিন্তু তাঁর চিন্তা ও উদ্যোগ নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে এ সত্যই প্রতিভাত হয়—বিদ্যাসাগর মনে-প্রাণে ছিলেন নারীর ক্ষমতায়নের একজন সমর্থক চিন্তাবিদ। বাঙালি সমাজে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মের মধ্যেই ক্ষমতায়নের ধারায় নারীকে জাগ্রত করার প্রয়াস আমরা প্রথম লক্ষ করি। বস্তুত, এই অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষারই অন্যতম প্রকাশ বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মধারা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মানবাধিকারের সর্বজনীন ধারণা দিয়ে নারীসমাজকে বিবেচনা করতেন। ন্যায্যতা এবং মানবাধিকারের চেতনায় স্নাত ছিলেন বলে বিদ্যাসাগর নারীর উপর নিক্ষেপ করতে পেরেছিলেন সমতার দৃষ্টি। বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর *The idea of Justice* (2009) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্বের যেকোনো স্থানে জন্মগ্রহণকারী একজন ব্যক্তি তার জন্মভূমি, জাতীয়তা, বসবাসের রাষ্ট্র, বর্ণ,

জেন্ডার, শ্রেণি, গোত্র, সম্প্রদায়, ধর্ম যাই হোক না কেন তার কিছু অধিকার মৌলিকভাবে থাকবে, যা সকলেই সম্মান করবে। এই অধিকারগুলোই মানবাধিকার (Amartya Sen, 2009 : 355)। শিক্ষা হচ্ছে মানবাধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় নারীর মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদানটিকে চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম ন্যায্যতা ও মানবাধিকারের অঙ্গীকার থেকে নারীশিক্ষার কথা ঘোষণা করলেন। বিদ্যাসাগর নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে পেরেছেন বলেই নারীর মানবাধিকারকে স্বীকার করেছেন, নারীকে সম্মান জানিয়েছেন এবং তাদের অধিকার-সচেতন করে তোলার জন্য গ্রহণ করেছেন নানামাত্রিক উদ্যোগ। নারীর জন্য ন্যায্যতা ও মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, ভারতবর্ষে তা ছিল রীতিমতো ঐতিহাসিক এবং বিপ্লবাত্মক। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিদ্যাসাগরের সমকালে পৃথিবী জুড়েই হাতে-গোণা কয়েকজন মানুষ মাত্র মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণে নারীশিক্ষার কথা বলতে পেরেছেন এবং এঁদের সকলেই ছিলেন বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। এঁদের মধ্যে মেরি ওলস্টোনক্রাফট, জন স্টুয়ার্ট মিল, রাজা রামমোহন রায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালি নারীর চেতনায় মানবাধিকারের ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। নারীদের মধ্যে এই যে বোধ ও অধিকার সৃষ্টির প্রয়াস এটাই নারীবাদী ভাবনার বিশিষ্ট দিক। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়, সমালোচকের এই ব্যাখ্যা—‘দার্শনিক দিক থেকে বলা যায় যে নারীবাদ কেবলমাত্র নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে বুঝায় না, নারীসত্তার বোধ ও স্বরূপ উন্মোচন করার দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। ... নারীর মাঝে স্বসত্তার চেতনা জাগ্রত করাই নারীবাদের অন্যতম লক্ষ্য’ (রাশিদা আখতার খানম, ২০০৬)। পৌনে দু’শত বছর পূর্বে এককভাবে এই কাজটাই করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সে-সূত্রে একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলায় নারীবাদী ধারণার সূত্রপাত ঘটে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মে।

ভারতবর্ষের সমাজ ঐতিহ্যিকভাবে শ্রেণিবৈষম্যের ধারণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ধর্মীয় অনুশাসন, পবিত্র-অপবিত্র এবং শুচি-অশুচির ধারণাকে কেন্দ্র করে এ ভূখণ্ডে যে আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তাতে অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্যের সাথে প্রবলভাবে যুক্ত হয়েছে জাতিবর্ণ বৈষম্য। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান হলো শূদ্র, পাপী এবং পশুর সাথে একাসনে। উচ্চবর্গের নারীরা এক্ষেত্রে সামান্য সুযোগ পেলেও নিম্নবর্গের নারীদের দুরবস্থা ছিল ভয়াবহ। শতাব্দী পরম্পরায় নিম্নবর্গের নারীরা কেবল নারী-পুরুষের বৈষম্যের শিকারই নয়, সেই সঙ্গে শ্রেণি ও জাতিবর্ণের বৈষম্যেরও শিকার হয়েছে (কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৬ : ৭-৮)। সমাজে নিম্নবর্গের নারীদের মানবাধিকার বলে কিছুই ছিল না। পুরুষানুক্রমে জন্মগত বর্ণভেদ ও শ্রেণিভেদ ক্রমশ জটিল আকার ধারণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলে নিম্নবর্গের দলিত নারীর শিক্ষাও থেকেছে উপেক্ষিত। এক্ষেত্রেই মানবতাবাদী শিক্ষাচিন্তক বিদ্যাসাগরকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। সংস্কৃত কলেজে তিনি যেমন ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণ ছাত্রদের পাশাপাশি সকল জাতিবর্ণের শিক্ষার্থীকে ভর্তির সুযোগ করে দিয়েছেন, তেমনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলোতেও সকল বর্ণের শিক্ষার্থীদের অনুপ্রবেশের অধিকার দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের কালে এ ঘটনা ছিল রীতিমতো বিপ্লবাত্মক। উদার মানবতাবাদী এই প্রয়াসের জন্য অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে বিদ্যাসাগরকে, কিন্তু কোনো সমালোচনাতেই তিনি নিজের সৎ উদ্দেশ্য থেকে পিছিয়ে যাননি। কেবল নিম্নবর্গের বাঙালি নারীর নয়, প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী নারীদের জন্যও তিনি বাধাহীন রেখেছিলেন তাঁর শিক্ষার দ্বার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সাঁওতাল পরগনার কার্মাটাড়ে আদিবাসী নারীদের জন্য তাঁর পাঠশালা স্থাপনের কথা।

নারীজাতির কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উদ্যোগের পাশাপাশি সকল মানুষদের চেতনায় সমতা, ন্যায্যতা ও মানবাধিকার চেতনা সঞ্চারের মানসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লেখনী ধারণ করেছেন, রচনা করেছেন একের পর এক গ্রন্থ। ধর্মশাস্ত্র যেখানে নারীকে করে রেখেছিল অধস্তন এবং মানবাধিকার-বঞ্চিত, সেখানে ধর্মশাস্ত্র থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিদ্যাসাগর খণ্ডন করেছেন ধর্মীয় অনুশাসন। বিধবাবিবাহ কেন চালু হওয়া উচিত, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ কেন বন্ধ করা উচিত, কেন নারীদের শিক্ষা দেওয়া জরুরি—এ বিষয়গুলো বিদ্যাসাগর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে উপাত্ত ও উদ্ধৃতি সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন—বাঙালির ভাবজগতের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছেন সাহিত্যিক উপাদানের মাধ্যমে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই সৃষ্টিশীল সত্তাও বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে এবং বাঙালি মানসে ইতিবাচক সদর্থক নারীচেতনা বিকাশে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং সকল প্রকার অধিকারের উত্তরাধিকারী। কিন্তু সমাজ প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি পদে তাকে পরাধীনতার শেকলে বন্দি করে ফেলে। নারীর ক্ষেত্রে এই বন্দিত্বের মাত্র জটিল এবং ভয়াবহ। নারীও জন্মসূত্রে পূর্ণ মানবসন্তান এবং স্বাধীন। কিন্তু পুরুষের সমাজের তৈরি প্রথা, নিয়ম, বিধি-বিধান, সংস্কৃতি, আইন, ধর্মীয় অনুশাসন নারীকে বানিয়ে ফেলে অর্ধ-মানুষ বা মেয়ে-মানুষ (আয়শা খানম, ২০১৫ : ৩৭-৩৮)। এই অর্ধ-মানুষ বা মেয়ে-মানুষকেই পূর্ণ মানুষ বানাতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর। বিরুদ্ধ সামাজিক বাস্তবতার কারণে বিদ্যাসাগর পূর্ণমাত্রায় সফলকাম হতে না পারলেও, তিনি যে প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন, বাঙালি নারীর সামূহিক মুক্তির ইতিহাসে তার রয়েছে ঐতিহাসিক এবং সুদূরসঞ্চারী প্রভাব।

ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান ছিল পুরুষের অনেক নিচে। অতীতের সে-ধারণা সমাজদেহে এখনো ক্রিয়াশীল আছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারী

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের তুলনায় শতাব্দী পরম্পরায় আছে অনগ্রসর। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত নারীরা অনগ্রসরতার প্রসঙ্গ। পাহাড়-প্রমাণ বৈরি ও বিপরীত অবস্থানে থেকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি নারীর জন্য শিক্ষা বিস্তারের কথা চিন্তা করেছেন, উদার নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতো নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। আধুনিক জেন্ডারচেনার আলোকে বিচার করলেও বিদ্যাসাগর ও তাঁর নারীশিক্ষা চিন্তাকে বর্তমান সময়ের জন্যও প্রাসঙ্গিক বলে স্বীকার করতেই হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত অভিমতসমূহ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য :

ক. ২ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী

বিদ্যাসাগরের সময় থেকে সমাজের অনেক দিকেই আমরা এগিয়েছি। কিন্তু তাঁর কালের নারীদের সঙ্গে একালের নারীদের দুরবস্থার খুব যে পার্থক্য ঘটেছে, তা বলা যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা এখনো পুরুষতন্ত্রের দাপটের শিকার। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথা বলা চলে। সে-বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের চিন্তাকে একালেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২০)।

খ. ৬ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী

উনিশ শতকের অবরুদ্ধ সমাজ প্রতিবেশে বসে বিদ্যাসাগর নানামাত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে নারীমুক্তির কথা ভেবেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নারীশিক্ষার জন্যও কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আজ তাঁর কার্যধারার প্রায় দুই'শ বছর পরে আমরা সমাজের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই ? আপনি এখনো সমাজের প্রায় সর্বত্র নারীর প্রতি বৈষম্য দেখতে পাবেন। নারীকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এখনো পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে চলেছে। নারীকে এখনো মানুষ হিসেবে দেখা হয় না, দেখা হয় উপভোগের সামগ্রী আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রে তার শিক্ষাকে এখনো পুরুষের মতো সমান চোখে দেখা হয় না। উন্নয়নের জায়গায় নারীকে এখনো পূর্ণমাত্রায় যোগ্য ভাবা হয় না, অনেক ক্ষেত্রেই তার সক্ষমতাকে খাটো করে দেখা হয়। এখনো বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ অবাধে চলছে। নারীর সার্বিক মুক্তির জন্য এখনো যুদ্ধ করতে হচ্ছে নারীবাদী সংগঠন এবং প্রগতিশীল দলগুলোকে। সে-প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষা চিন্তা এখনো প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করি (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২০শে জুন, ২০২১)।

গ. ১০ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী

উনিশ শতকের সমাজ প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর নারীর মুক্তির জন্য নানা ধরনের কাজ করেছেন। তাঁর সমকালে নারীসমাজের যে দুর্গতি, আমাদের সমাজে এখনো তা লক্ষ করা যায়। নারীশিক্ষায় এখনো অনেক বাধা। অনেক পরিবার কন্যা-সন্তানকে শিক্ষা দিতে অনাগ্রহী। অনেকেই মনে করে বিয়ে দেওয়াই তাদের মূল কাজ, তাই কন্যাশিশুকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার নেই। এমনও দেখা যায়, নারী শিক্ষা লাভ করতে চাইলেও তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন কিংবা স্বামী সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে এখনো প্রবলভাবে বিদ্যমান। আইন আছে বটে, তবে তা শোনার লোক নেই, প্রশাসনও অনেক সময় নিষ্ক্রিয়

ভূমিকা পালন করে। শহরে-গ্রামে নারীশিক্ষার্থীর উপরে বখাটে ছেলেদের উৎপাত আর অনাচারের কথা তো বলতে গেলে প্রতিদিনই পত্রিকায় দেখতে পাই। এ কারণেও নারীশিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা ও কর্মসূচি এখনো প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৪ঠা জুলাই, ২০২১)।

ঘ. ৭ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারী

বিদ্যাসাগর যেকালে নারীশিক্ষার কথা বলেছেন, একালে যদি সেদিকে তাকাই তাহলে বলতেই হবে তাঁর ভাবনা ও প্রয়াস ছিল অনেক প্রাগ্রসর। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষাকে মানবমুখীন করতে চেয়েছেন। নারী যে মানুষ—নারীর চেতনায় এই বোধ সঞ্চারের চেষ্টা বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষার চিন্তার প্রধান লক্ষণ। কিন্তু আমরা এত বছর পরেও সে-জায়গায় পৌঁছুতে পারিনি। বিদ্যাসাগর যে-সব সামাজিক অপপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, লেখনী ধারণ করেছেন, আমাদের সমাজে এখনো তা আছে। তাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা তথা নারীর মুক্তি-বিষয়ক চিন্তাকে এখনো প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করি (সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২১শে জুন, ২০২১)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের অবরুদ্ধ সামাজিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করেও শত বাধার মুখে বাঙালি নারীর মুক্তির জন্য নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক-নারী সংগঠকের অভিমত থেকে দেখা যায়, তাঁর এই উদ্যোগের সঙ্গে একালের নারীবাদী তাত্ত্বিক ও জেন্ডার-বিশেষজ্ঞদের ভাবনার মধ্যে বহু ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। উদার নারীবাদীদের ভাবনার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চিন্তার সাদৃশ্য সহজেই আবিষ্কার করা যায়। সে-সময়ের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের এই নারীমুক্তি চিন্তা ছিল একান্তই আধুনিক। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমালোচকের এই মন্তব্য : "সমগ্র বিশ্বে Modern Feminism-এর অবশ্যই একটি তাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে। অবশ্যই তা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়কাল উনিশ শতক। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকে বাঙালি নারীকে সামাজিক মুক্তি দিতে গিয়ে অবশ্যই সেদিনের প্রেক্ষিতকে বেশি জোর দেবেন এটাই স্বাভাবিক। কাজেই আমাদের মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের সমাজ পটভূমি বা সামাজিক সমস্যা ও একুশ শতকের আর্থ-সামাজিক পটভূমি কখনই এক নয়। সুতরাং সমকাল ও সময়ের নিরিখে সেদিনে বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যাধুনিক এবং তাঁর কর্মকাণ্ড অবশ্যই সেই প্রেক্ষিতে সেদিনেও ছিল অত্যাধুনিক' (১১ নম্বর সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৮ই জুলাই, ২০২১)।

এ কালের নারীবাদী তাত্ত্বিক কিরা কোচরানে তাঁর সুবিখ্যাত *All the Rebel Women : The Rise of the Fourth Wave of Feminism* (1913) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—উদার নারীবাদ নারীর প্রতি পুরুষের সকল ধরনের অমানবিক আচরণ বন্ধ করে নারীর অধিকার ও অধিকার আদায়ের চর্চার মাধ্যমে পূর্ণ মানুষ হবার আহ্বান জানায় (Kira Cochrane, 2013 : 67)। কোচরানের পূর্বসূরি নারীবাদী তাত্ত্বিক মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা জন স্টুয়ার্ট মিল সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধস্তনতার কারণগুলো শনাক্ত করে তা দূর করার আহ্বান জানান। সাম্প্রতিককালের জেন্ডার-বিশেষজ্ঞ জেন লোথিয়ান মারে (Jane Lothian Murray) উদার নারীবাদের মৌল প্রবণতা উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> Liberal feminism strives for sex equality through the elimination of laws that differentiate people by gender. ... Liberal feminism fight for better child-care options, a women's right to choose an abortion, and elimination of sex discrimination in the workplace. (Jane Lothian Murray and et. al., 2017 : 341)

বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন সমাজ-সংস্কারক। তিনি সংস্কারের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন—বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজকাঠামো বদলাতে চাননি। সে-কারণে উত্তরকালের র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (Radical Feminism), মার্কসীয় নারীবাদ (Marxist Feminism) বা উত্তর-আধুনিক নারীবাদের (Post-modernist Feminism) সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি ভাবনার তেমন কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে ব্যাখ্যার ভিন্নতা এবং কর্মধারায় ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও নারীবাদের সব শাখাই চূড়ান্ত পর্যায়ে নারীর সামূহিক মুক্তির কথাই বলে। নারী-পুরুষের মধ্যে সকল রকম বৈষম্য অস্বীকার করে নারীবাদ, যেমন অস্বীকার করেন এ কালের জেন্ডার-বিশেষজ্ঞরা। নারীর মানবাধিকার রক্ষার জন্য নারীবাদী সংগঠনগুলো এ কালে যে-সব কাজ করছে, এ ক্ষেত্রে জেন্ডার-বিশেষজ্ঞরা যে-সব তত্ত্ব দিচ্ছেন—তার মূল লক্ষ্য নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা। ২০০৭ সালে ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনে (Vienna Declaration) নারীর মানবাধিকার প্রসঙ্গে পরিষ্কারভাবে বলা হয় :

> All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, or the same footing and with the same emphasis. While the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgorunds must be borne in mind, it is the duty of states, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms. This universality extends naturally also to women's human rights, which have been solemnly recognized by states as 'an inalienable integral and indivisible part of universal human rights. (উদ্ধৃত : আয়শা খানম, ২০১৫ : ৪৭)

—আধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিক, জেন্ডার-বিশেষজ্ঞ কিংবা ভিয়েনা মানবাধিকার সম্মেলনের এইসব অভিমতের আলোকে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মের দিকে তাকালে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। সেই কত আগে তিনি নারীর মানবাধিকারের কথা বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে অস্বীকার করেছেন নারী-পুরুষের বৈষম্য, নারীর চেতনায় সঞ্চার করতে চেয়েছেন সমতার ধারণা, এবং তাকে দেখতে চেয়েছেন সামাজিক ক্ষমতায়নের অবস্থানে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীর মানবাধিকার রক্ষা ও সমতাচেতনা ব্যাখ্যার জন্য উত্তরকালীন জাতিসংঘের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। লক্ষ করা যাবে যে, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্কার ভাবনার সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের চিন্তার অনেক সাদৃশ্য আছে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই গঠিত হলো মানবাধিকার-বিষয়ক কমিশন এবং ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো নারীর মর্যাদা-বিষয়ক কমিশন (Commission on the Status of Women—CSW)। ১৯৬৭ সালে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হলো 'Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women'। এইসব কমিশন ও ঘোষণার ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয় নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ-সংক্রান্ত বৈশ্বিক সনদ 'Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women'—যা সংক্ষেপে CEDAW নামে পরিচিত। এই সনদে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয়—সকল ক্ষেত্রে নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি ঘোষিত হয় এবং এটি আইনগত ভিত্তি নিয়ে একটি কনভেশন হিসেবে রূপ লাভ করে (আয়শা খানম, ২০০৯ : ১২০)। নারী-পুরুষের সমতাবিধান লক্ষ্যে CEDAW সনদ প্রধানত তিনটি ক্ষেত্র শনাক্ত করে :

ক. নারীর নাগরিক অধিকার ও আইনি সমতা নিশ্চিতকরণ, যার মাধ্যমে নারী গণজীবনে ও সমাজে পুরুষের সমপর্যায়ে সকল সুবিধা ভোগ করতে পারবে ;

খ. নারীর প্রজনন ভূমিকাকে সামাজিক ভূমিকা হিসেবে গণ্য করা, যাতে করে প্রজননের কারণে নারীকে কোণঠাসা না করে এ ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় ; এবং

গ. আচার, প্রথা, সংস্কার ও বিধি যা নারীর জেন্ডার ভূমিকা নির্ধারণ করে, তা বাতিল করা—যাতে করে পরিবার ও সমাজে কেবল 'নারী' নয় পূর্ণ 'মানুষ' হিসেবে নারীকে গণ্য করে পুরুষের ক্ষমতাভিত্তিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় (United Nations, 1995 : 158 ; আয়শা খানম, ২০০৯ : ১২১-১২২)।

তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নীতির ভিত্তিতে প্রণিত হয়েছে সিডও (CEDAW) সনদ। এই নীতিত্রয় হচ্ছে :

Dhaka University Institutional Repository

ক. সমতার নীতি (Principle of Equality) ;

খ. বৈষম্যহীনতার নীতি (Principle of non-discrimination) ;

গ. রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার নীতি (Principle of State obligation)।

—এই তিনটি নীতিকে এককথায় সমতার নীতি বা The Priciple of Equality হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এখন এইসব নীতির আলোকে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও প্রয়াসের দিকে তাকালে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। প্রায় পৌনে দু'শত বছর আগে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসে এ কালের CEDAW সনদের অনেক নীতিই দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন সমতার নীতিতে, তিনি বিশ্বাস করতেন না নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য, সমাজ বা রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথাও তিনি বলেছেন—নারীকে সুযোগের সমতা (equality of opportunity) প্রদানের জন্য তিনি আন্দোলন করেছেন। কাজেই সিডও (CEDAW) সনদের পরিপ্রেক্ষিতে নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মকে প্রাগ্রসর এবং ঐতিহাসিক হিসেবেই বিবেচনা করা যায়।

১৯৯৫ সালের ৪ঠা থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত Beijing+25-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশ্বের ৬৪টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। CSW 64-এর সম্মেলনে Commission on the Status of Women গঠিত হয় এবং নারী-উন্নয়নের জন্য ঘোষিত হয় 'Beijing Declaration and Platform for Action for Women'। জাতিসংঘ আয়োজিত এই ঘোষণায় নারীর জন্য সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এই সম্মেলনের গৃহীত ঘোষণায় যা বলা হয়েছে, সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা যায় এভাবে :

> The 1995 Beijing Platform for Action flagged 12 key areas where urgent action was needed to ensure greater equality and opportunities for women and men, girls and boys. It also laid out concrete ways for countries to bring about change. UN women works with governments and partners to ensure such change is real for women and girls around the world. ... Education is essential for women to reach gender equality and become leaders of change. Educated women benefit entire societies, contributing to flourishing economics and the improved health, nutrition and education of their families. Education and training are also tools to help change harmful gender stereotypes (www.unwomen.org).

জাতিসংঘের Sustainable Development Goals-এর ৫ নম্বর ধারায় জেন্ডার-সমতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। SDG সনদে জেন্ডার-সমতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world. There has been progress over the last decade : more girls are going to school, fewer girls are forced into early marriage, more women are serving in parliament and positions of leadership, and laws are being reformed to advance gender equality (www. isb-global.com).

জাতিসংঘের Beijing+25, CSW64 এবং SDG-র জেন্ডারসমতা-বিষয়ক ধারাসমূহে নারীর উন্নতি ও শিক্ষা বিষয়ে যে-সব কথা বলা হয়েছে, উনিশ শতকের চিন্তাবিদ বিদ্যাসাগরের ভাবনায়ও আমরা তা লক্ষ করি। নারী-পুরুষের সমতার জন্য তিনি শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং এইকথা পৌনঃপুনিক বলেছেন নারী শিক্ষিত হলেই পরিবার শিক্ষিত হবে—পরিণতিতে শিক্ষিত হবে জাতি, যা আমরা 'Beijing Declaration and Platform for Action for Women'-এও বিশেষভাবে লক্ষ করি। ২০৩০ সালের মধ্যে SDG বাস্তবায়নের যে পরিকল্পনা জাতিসংঘ গ্রহণ করেছে সেখানেও জেন্ডারসমতার কথা বলা হয়েছে। উনিশ শতকে পুরুষতন্ত্রের যাঁতাকলে বন্দি বাঙালি নারীদের চেতনায়ও বিদ্যাসাগর ছড়াতে চেয়েছিলেন জেন্ডারসমতার ধারণা—যদিও তখন তাত্ত্বিকভাবে জেন্ডার কথাটারই প্রয়োগ ছিল না।

নারীমুক্তি এবং জেন্ডারসমতার ইতিহাসের ধারায় সর্বশেষ উদ্যোগের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। বিশ্বব্যাপী জেন্ডারসমতা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০২১ সালের ৩০শে জুন থেকে ২রা জুলাই প্যারিসে জেনারেশন ইকুয়ালিটি ফোরামের (Generation Equality Forum) অনলাইন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের পর থেকে এই সম্মেলনই লিঙ্গসমতার জন্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন হিসেবে চিহ্নিত। জেন্ডারসমতার জন্য জেনারেশন ইকুয়ালিটি ফোরামের কোয়ালিশন অ্যাকশন মোট ছয়টি বিষয় শনাক্ত করে। এই বিষয়গুলো এরকম :

১. লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (Gender-based violence) ;
২. অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং অধিকার (Economic justice and rights) ;
৩. শরীরী স্বাধিকার, যৌন ও প্রজনন-স্বাস্থ্য অধিকার (Bodily autonomy, sexual and reproductive health and rights (SHHR) ;
৪. জলবায়ু নীতির সাম্যতার জন্য নারীবাদী পদক্ষেপ (Feminist action for climate justice) ;
৫. জেন্ডারসমতার জন্য প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন (Technology and innovation for Gender Equality) ;
৬. নারীবাদী আন্দোলন ও নেতৃত্ব (Feminist movements and leadership)।

Dhaka University Institutional Repository

—এই ছয়টি মৌলনীতির আলোকে জেনারেশন ইকুয়ালিটি ফোরাম ২০২৬ সালের মধ্যে জেন্ডারসমতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ২০২১ সালে জেনারেশন ইকুয়ালিটি ফোরাম নারী-পুরুষ বৈষম্য বিলোপ বা জেন্ডারসমতার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে যেসব নীতির কথা বলেছে, বিস্ময়করভাবে উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের ভাবনায় তার প্রাথমিক প্রকাশ আমরা লক্ষ করি। তিনিও সমাজের সামূহিক এবং শান্তিময় উন্নতির জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বহুমাত্রিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং গ্রহণ করেছেন নানামাত্রিক উদ্যোগ।

শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর বাঙালি নারীদের অন্তর্চক্ষু উন্মিলনের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি ভেবেছেন, যথাযথ শিক্ষা পেলে নারী তার অব্যক্ত কথা প্রকাশ করার জন্য সাহসী হয়ে উঠবে—তার মধ্যে দেখা দেবে সাবলম্বী চেতনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় গবেষকের এই মন্তব্য : "Vidyasagar's range of perception and empathy about women developed and gradually had led him to repudiate customs oppressive to women. He thought that women should not be deprived of the facilities which are easily available to men. To put this idea in the context of defying tradition sounds like a challenge especially if we are to look at the tone of the time-period he was operating in. If men could get the literary education why must not that be given to the women in general ? The ideology as stated above made him a crusader for the cause of women's education. ...Being guided by human values and scientific temperament and at the same time practical experiences, it is likely that Vidyasagar devised many plans and means to develop self-strength and 'inner voices' among the Indian women and for this cause the remedy could be found nowhere other than educating the women" (Anjashi Sarkar, 2020 : 158-161).

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর (১৮৯১) পরে বিগত সময়ে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এখন বাংলাদেশে কিংবা ভারতীয় বাঙালি সমাজে প্রাথমিক থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত নারী-শিক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষ-শিক্ষার্থীর সমান—কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশিও। পরীক্ষার ফলেও অনেক সময় দেখা যায় পুরুষ শিক্ষার্থীর তুলনায় নারী-শিক্ষার্থীরা ভালো করেছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নারী-শিক্ষার্থীদের বৃত্তিসহ নানা ধরনের সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল/কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও নারী-শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং এখন তা শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ। নারীর সামূহিক মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এখন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনেক আইন প্রণীত হয়েছে—জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে তাদের দেওয়া হচ্ছে নানা ধরনের সহযোগিতা। তবু, সিডও সনদ কিংবা এসডিজি-র প্রেক্ষাপটে বাঙালি নারীরা এখনো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সমাজে এখনো নারীশিক্ষার বিরোধী লোকজন ক্রিয়াশীল আছেন। তারা নানাভাবে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

নারীরা নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন—পুরুষের তুলনায় নারী-শ্রমিকের মজুরি কম দেওয়া হচ্ছে, নারীর উপরে যৌন-নির্যাতন প্রতিদিনের বিষয় হয়ে উঠেছে, ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে পারিবারিক সহিংসতা। নারী-পুরুষের মধ্যে অসঙ্গত কোন ঘটনা সংঘটিত হলে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় নারীর উপর, তার পোশাকের উপর। বাংলাদেশের নারীবাদী সংগঠকদের এখনো অব্যাহতভাবে নারীমুক্তির জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হচ্ছে। যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ আইন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপদ্ধতি—ইত্যাদি আইন ও কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য নারী-সংগঠন ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে কাজ করতে হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goals (SDG)-এর লক্ষ্য পূরণ কিংবা CEDAW সনদ বাস্তবায়ন থেকে বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। নারীর সামূহিক মুক্তির জন্য, তার মানবাধিকার, সাম্যতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিচের অধিকারগুলো বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে :

ক. জীবনের অধিকার (The right to life),

খ. সমতার অধিকার (The right to equality),

গ. স্বাধীনতা ও ব্যক্তির নিরাপত্তার অধিকার (The right to liberty and Security of person),

ঘ. আইনের দৃষ্টিতে সমনিরাপত্তা ও অধিকার পাওয়া (The right to equal protection under the law),

ঙ. সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকার (The right to free from all forms of discrimination),

চ. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য অধিকার (The right to highest standard attainable of physical and mental health),

ছ. ন্যায্য ও সহায়ক কর্ম-পরিবেশের অধিকার (The right to just and favorable condition of work),

জ. নারীর প্রতি কোনো প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ, সভ্য-ভব্যতাহীন নিম্নরুচির আচরণ না করা ও শাস্তি না পাওয়ার অধিকার (The right not to be subject to torture or other cruel inhuman or degrading treatment and punishment against women)। (আয়শা খানম, ২০১৫ : ১৯৫-১৯৬)

—বাংলাদেশে নারীশিক্ষা তথা নারী-উন্নয়নের জন্য এখনো অনেক কাজ অবশিষ্ট আছে, জাতিগতভাবে আমাদের যেতে হবে আরও অনেক দূর। নারীমুক্তির সে-যাত্রায় এখনো প্রতিদিন প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

একথা ব্যক্ত হয়েছে যে, উনিশ শতকে বিদ্যাসাগর যখন নারীউন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন, তখন নারীবাদ বা জেন্ডারচেতনার জন্ম হয়নি। কিন্তু বিস্ময়কর প্রাগ্রসরতায় তিনি সেদিন নারীর কল্যাণ ও শিক্ষার জন্য যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, উত্তরকালীন নারীবাদী চিন্তা এবং জেন্ডারচেতনার সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করব, ব্রিটেনের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েরও আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম কোনো নারী-শিক্ষার্থী স্নাতক উপাধি লাভ করেন একমাত্র বিদ্যাসাগরের একরোখা চেষ্টা ও উদ্যোগের ফলেই (সনৎকুমার সাহা, ২০১১ : ৬৫)। বিশ্বব্যাপী নারীমুক্তি এবং নারীশিক্ষার আন্দোলনে বাঙালি চিন্তাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রকৃত প্রস্তাবেই, একজন পথিকৃৎ দার্শনিক, সমাজচিন্তা-নায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণার ফলাফল

'বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ' শীর্ষক বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া গেছে, তা নিম্নরূপ :

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা ও কর্ম উৎসারিত হয়েছিল উনিশ শতকে বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট থেকে।

২. উনিশ শতকে নারীশিক্ষা নিয়ে বাংলায় দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা প্রবহমান ছিল। একদিকে রক্ষণশীল ধারা, যারা নারীশিক্ষার ঘোর বিরোধী, এঁরাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি। অন্যদিকে ছিলেন উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ—সংখ্যায় কম হলেও এঁরা ছিলেন সেকালের আলোকিত মানুষ। এই ব্যক্তিবর্গই নারীশিক্ষা প্রচলনে অগ্রণী ছিলেন। নারীশিক্ষা বিস্তার বিষয়ে এই বিপরীতধর্মী দুই ধারার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলায় নারীশিক্ষার ধারণা একটা প্রবহমান রূপ পরিগ্রহ করে।

৩. সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন ও শিক্ষকতা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা, ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রশাসকদের সঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে ও কার্য-ব্যাপদেশে সংশ্লিষ্টতা ও অভিজ্ঞতা নারীশিক্ষা ব্যতীত যে বাঙালির আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি ঘটবে না—এই বোধে উপনীত হতে বিদ্যাসাগরকে সহায়তা করেছে। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছিলেন পুরুষপ্রধান বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাই নারীর মঙ্গল ও উন্নতির জন্য নারীশিক্ষার কথা তিনি ভেবেছেন এবং গ্রহণ করেছেন নানামাত্রিক উদ্যোগ।

৪. বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজস্থ মানুষের সামূহিক কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা। নারী ও পুরুষ—উভয়ের মঙ্গল প্রত্যাশা করেছেন বিদ্যাসাগর। তিনি লক্ষ করেছেন বাঙালি নারী শিক্ষায় ব্যাপকভাবে অনগ্রসর বলে নিজেদের কল্যাণ আর মঙ্গলের কথাও তারা ভাবতে পারে না। অচেতন এই নারীসমাজের মধ্যেই বিদ্যাসাগর চেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন এবং সে-উদ্দেশ্যেই নারীশিক্ষার জন্য গ্রহণ করেছেন নানামাত্রিক উদ্যোগ।

৫. নারী ও পুরুষকে বিদ্যাসাগর সমতার দৃষ্টিতে দেখেছেন। জন্মগত শারীরতাত্ত্বিক পার্থক্য ছাড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে তিনি আরোপিত কোনো বৈষম্যকে স্বীকার করেননি। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পার্থক্য ছাড়া নারী-পুরুষের মধ্যে যেসব পার্থক্যের কথা বলা হয়, তা একান্তই সমাজসৃষ্ট। সামাজিক পুরুষতন্ত্রই নারী-পুরুষের মধ্যে বহুমাত্রিক পার্থক্য আবিষ্কার করেছে। আধুনিক জেন্ডারচেতনার মতো এ সত্য উনিশ শতকে বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজ প্রতিবেশে অবস্থান করেও বিদ্যাসাগর যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সামাজিক বৈষম্যমূলক এই অবস্থাকে, উদার এবং জেন্ডারবাদীদের নারীবাদীদের মতোই, আঘাত করেছেন বিদ্যাসাগর। এই লক্ষ্যেই নারীশিক্ষার কথা খুব

Dhaka University Institutional Repository

জোরে-শোরে প্রচার করেছেন বিদ্যাসাগর, গ্রহণ করেছেন নানা উদ্যোগ, নারীশিক্ষার জন্য তৎকালীন সব প্রয়াসের সঙ্গেই নিজেকে গভীরভাবে করেছেন সংযুক্ত।

৬. নারীশিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কর্তৃকই বাধার সম্মুখীন হননি, ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রশাসনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ আচরণ করেছে। বিশেষত, নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর যে বালিকা বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন, তা পরিচালনার জন্য প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেও অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দেয় ঔপনিবেশিক প্রশাসন। কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার কারণে বিদ্যাসাগর নিজের অর্থ ব্যবহার করে স্কুলগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করেন। কেবল অর্থ দিয়ে সহযোগিতা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই নারীশিক্ষার প্রশ্নে বিদ্যাসাগর ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রশাসনের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। নিজের বিশ্বাসের প্রতি একনিষ্ঠ বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত তাঁর মতের প্রতি শাসকের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য ঔপনিবেশিক শিক্ষা-প্রশাসনকে স্বমতে নিয়ে আসাও ছিল বিদ্যাসাগরের এক উল্লেখযোগ্য অর্জন।

৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেতনায় সমাজসংস্কার ও নারীশিক্ষা একটি অপরটির পরিপূরকরূপে বিবেচিত হয়েছিল। এই দুটি বিষয়কে তিনি অভিন্ন উদ্দেশ্যে একই মোহনায় মিলিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য সমাজসংস্কারের উপর তিনি জোর দিয়েছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি সমাজসংস্কারের জন্য নারীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিদ্যাসাগরের কাছে সমাজসংস্কার ও নারীশিক্ষা প্রসার সমগুরুত্ব পেয়েছিল এবং একটি হয়ে উঠেছিল অন্যটির যথার্থই পরিপূরক।

৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিভার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনার মধ্যে সংহত রূপে প্রতিভাত। বিদ্যাসাগরের মানস-প্রবণতার ইহজাগতিকতা, মানবমুখিতা, বিজ্ঞানচেতনা, নারী-পুরুষের সমতাভাবনা এবং মানবকল্যাণচিন্তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তাঁর নারীশিক্ষা প্রসার-কার্যক্রমে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

৯. নারীকে বিদ্যাসাগর মানুষ হিসেবে দেখেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে কেবল নারী হিসেবেই বিবেচনা করেনি, বরং তারা নারীর মধ্যে এই ধারণা সঞ্চার করেছিল যে তারা কেবলি নারী—কখনোই তারা পুরুষের সমান হতে পারে না। বাঙালি নারীরাও পুরুষতান্ত্রিক এই ধারণা অবলীলায় মেনে নিয়েছিল, বিশ্বাস করেছিল। এখানেই বিদ্যাসাগরের মূল সংগ্রাম। তিনি নারীর চেতনায় সমঅধিকারের ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন—পুরুষের মতো তারাও যে মানুষ এই বোধ সঞ্চারের প্রয়াস পেয়েছেন। এ লক্ষ্যেই তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের উপর জোর দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর মনে করেছেন, যেমন মনে করেন একালের জেন্ডার-তাত্ত্বিকেরা, নারীকে শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত করতে পারলেই পুরুষতান্ত্রিক এই মানসিকতা থেকে মুক্তি পাবে নারী, পরিবর্তন ঘটবে পুরুষের সনাতন মানসিকতারও। এ উদ্দেশ্যেই তিনি নারীশিক্ষার কথা ভেবেছেন এবং গ্রহণ করেছেন নানামাত্রিক উদ্যোগ।

Dhaka University Institutional Repository

১০. বিদ্যাসাগর প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর (সাঁওতাল) জন্যও শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্তমান সময়ে প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা প্রসারের যে চিন্তা, সে-ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রয়াস বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

১১. নারীশিক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে তিনি শিক্ষয়িত্রী-প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে স্থাপন করেছেন শিক্ষয়িত্রী-প্রশিক্ষণ স্কুল। তিনি যথার্থই ভেবেছিলেন প্রশিক্ষিত শিক্ষয়িত্রী নারীশিক্ষা বিস্তারে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এ ধরনের চিন্তার যৌক্তিকতা রয়েছে।

১২. নারীশিক্ষা-কার্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন সক্রিয়তাবাদী ব্যক্তি (Activist)। নারী তথা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ এবং উন্নতির জন্য তিনি কেবল চিন্তাই করেননি, বরং সে-চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার সামাজিক আন্দোলন ও শিক্ষাবিস্তারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন।

১৩. রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার সতীদাহ প্রথা বিলোপের আইন পাশ করে। এই আইনের ফলে বিধবা নারীদের জীবন বাঁচলো বটে কিন্তু তারা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে রয়ে গেলেন অভিন্ন অমানবিক পরিস্থিতিতে। এইসব নারীকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া এবং সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষার উদ্যোগ আজকের জেন্ডারতত্ত্বের আলোকে বিবেচনা করলেও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ বলে স্বীকার করতেই হয়।

১৪. নারীশিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর বাঙালি নারীদের অধিকার-সচেতন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা পেলেই নারী পরিবারে ও সমাজে তার অবস্থা ও অবস্থান বুঝতে পারবে এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেন।

১৫. সামাজিক উন্নতি, ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক সক্ষমতা—এসবের জন্য পুরুষের যেমন শিক্ষার দরকার, তেমনি শিক্ষার দরকার নারীরও। শিক্ষার মধ্যেই নিহিত নারীর সার্বিক মুক্তি। বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাঙালি সমাজে এ বিষয়ে সামগ্রিকভাবে তেমন কেউ ভাবেননি। বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাবনা এ প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে গুরুত্ববহ।

১৬. বাঙালি সমাজে শিক্ষায় নারীর অধিকার ছিল অস্বীকৃত। বলা হতো, জন্মগতভাবেই নারী পুরুষের অধস্তন, নারীর পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব নয়—তাই তার শিক্ষারও প্রয়োজন নেই। বিদ্যাসাগর বললেন—সমাজে পুরুষের মতো নারীরও শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। নারী-পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্যের কথা বলা হয়, তা একান্তই সমাজসৃষ্ট। অধিকারের এই বৈষম্যনীতিটা যথার্থভাবে অনুধাবনের জন্য নারীদের যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি একই সঙ্গে প্রয়োজন পুরুষদের মানসিকতার পরিবর্তন। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকারকেও স্বীকার করতে হবে এবং সে-উদ্দেশ্যেই পুরুষের মতো নারীকেও শিক্ষা দিতে হবে। বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মের মাঝে এই ভাবনার প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি সমাজের নারী-পুরুষ নিরপেক্ষ সমন্বিত উন্নতি ও মঙ্গল। এ লক্ষ্যে তিনি সমাজবিজ্ঞানীদের মতো সমাজের মৌলিক একক পরিবার-সংগঠনের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। পরিবার-সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বিবাহ ব্যবস্থার উপর বিদ্যাসাগর জোর দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন বিবাহ ব্যবস্থার সংস্কারের (বিধবাবিবাহ চালু, বহুবিবাহ নিরোধ এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ) মাধ্যমে পরিবার-সংগঠনের পরিবর্তন সাধন। বিদ্যাসাগর মনে করেছেন, শিক্ষার মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে এই সংস্কার প্রয়াসের ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব। পরিবার ব্যবস্থায় সুস্থ ও স্বাভাবিক ধারা সৃষ্টির জন্য সমাজে শিক্ষা প্রসারের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি পরিবার ও শিক্ষার মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

১৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজদর্শনের ন্যায় শিক্ষাদর্শনেরও মূল বৈশিষ্ট্য বাস্তববাদিতা, প্রয়োগবাদিতা এবং মানবমুখীনতা। এই ত্রিমাত্রিক দর্শন দ্বারা পরিস্রুত ছিল তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনাও। এই ভাবনার প্রতিফলন আছে বলে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তাকে একালের জেন্ডারচেতনার সমগোত্রীয় হিসেবে শনাক্ত করা যায়। এইসব বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির কারণে তাঁকে রেনেসাঁস-উত্তর ইউরোপের আধুনিক মানুষ এবং আলোকিত শিক্ষাচিন্তকদের সঙ্গে একই সারিতে স্থান দেওয়া যায়।

১৯. বিদ্যাসাগর-রচিত পাঠ্যপুস্তক ও গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে বাঙালি সমাজে সার্বিকভাবে নারীশিক্ষা বিস্তারে যে স্রোতোধারা সৃষ্টি হয়, কালক্রমে তা নারীশিক্ষার বাতাবরণ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০. পুরুষের পাশাপাশি নারীদের শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা এদেশের জনশিক্ষার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তাঁর নারীশিক্ষামূলক কর্মধারা বাংলায় জনশিক্ষার ধারাকে প্রসারিত করেছে।

২১. বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগে সামগ্রিক ধারণার (Holistic approach) বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নারীশিক্ষার বিষয়টিকে তিনি বিবেচনা করেছেন সামগ্রিকতার প্রেক্ষাপটে। নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নতি, ক্ষমতায়ন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর এক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ। এ সূত্রেও বিদ্যাসাগরের এই প্রয়াসকে আধুনিক নারীবাদ ও জেন্ডারচেতনার সমগোত্রীয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

২২. জেন্ডারসমতা ও ন্যায্যতা বিষয়ে CEDAW, BEIJING, BEJING 30, SDG, CSW, ‘Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women’ এবং UNESCO-র মূল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মিল পরিলক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশসমূহ

বক্ষ্যমাণ গবেষণায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা ও কর্মের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার আলোকে বর্তমান বাংলাদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে সুপারিশসমূহ হলো :

১. নারীসমাজকে সামাজিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করে সামাজিক কাঠামোর অন্যান্য উপাদানের (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। এক্ষেত্রে নারীশিক্ষাকে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির (Holistic approach) আলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

২. সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি নারীশিক্ষার উপরও সমান গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে সফলতা পেতে হলে নারীশিক্ষা বিষয়ে সামাজিক বাধাসমূহ দূর করার যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. সমাজে নারীশিক্ষার পরিমাণগত এবং গুণগত বিকাশ সাধনের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। নারীশিক্ষার জন্য নানামাত্রিক উদ্যোগ গৃহীত হলেও বাঙালি সমাজে এখনো এক ধরনের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বাধা গোপনে-প্রকাশ্যে ক্রিয়াশীল আছে। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য এই সমাজমানসের পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

৪. নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও অন্যতম বাধা বাল্যবিবাহ। আইন থাকলেও বাল্যবিবাহের হার এখনো উদ্বেগজনক। বহুবিবাহও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে অন্তরায়। নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি করার জন্য বিবাহসংক্রান্ত আইনসমূহ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

৫. নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য নারীবান্ধব ও মানবতাবাদী সংগঠনগুলোকে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. নারীশিক্ষার জন্য সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্যাসাগর সে-আমলেই হাতে-লেখা প্রচারপত্র বিলি করেছেন। সমাজে জেন্ডারসমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় সকল স্তরে বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে নারী ও পুরুষ উভয়কে উদ্বুদ্ধকরণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে কার্যকর পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭. মেয়েদের শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নারীশিক্ষার জন্য প্রচলিত আর্থিক ও উপকরণগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিভাবকদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. নারীশিক্ষা প্রসার ও টেকসইকরণের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে আরও সক্রিয় অংশীদারিত্বের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নারীর সামাজিক মর্যাদা, অধিকার, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে। এ ধারায় কাজ করতে পারলে বাংলাদেশে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে নারীশিক্ষার পথ সুগম হবে।

৯. তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদানের সহায়তায় নারীশিক্ষার জন্য বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষাক্রম চালু করা প্রয়োজন। তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় কত সহজে এবং কত অল্প সময়ে পাঠ দেওয়া যায়, সে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের এগিয়ে আসতে হবে। আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে নারী-শিক্ষার্থীদের অভ্যস্থ করে গড়ে তুলতে হবে।

১০. অর্থনৈতিক, নৃতাত্ত্বিক, জাতিবর্ণ ভেদে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীতে নারীশিক্ষা ত্বরান্বিতকরণে পাঠসমূহ মাতৃভাষায় শুদ্ধ ও সহজ-সরলভাবে রচনা করা প্রয়োজন। শুদ্ধ ও সহজ বাংলার পাঠ নারীশিক্ষার্থীদের সহজেই আকৃষ্ট করবে।

১১. নারীশিক্ষার জন্য পরিবার-সংগঠনে ও পারিবারিক মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। মেয়ে সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে পিতা-মাতাকেই উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

১২. নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষতান্তিক নানামাত্রিক জেন্ডারবৈষম্য নারীর নিরাপত্তার প্রশ্নে ভয়ংকর বাধা হয়ে রয়েছে। এখনও অনেক সময়েই শিক্ষা লাভের জন্য বিদ্যালয়ে যেতে মেয়েরা নানারকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ ব্যাপারে সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটি, জনপ্রতিনিধি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসনে, বিশেষত হিন্দু ধর্ম-ব্যবস্থায় সম্পত্তিতে নারীর অধিকারগত বৈষম্য নিরসনে আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন।

১৪. নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কমিশন ঘোষিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জেন্ডারবৈষম্য নিরসন এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম-জেন্ডার নির্বিশেষে 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম বাস্তবায়নে যে দিকনির্দেশনা ও কর্মসূচি গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশে আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৫. বাংলাদেশে সর্বজনীন মানবতাবাদ, জেন্ডারচেতনা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের সমাজ-দার্শনিক গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উনিশ শতকের সংস্কারাচ্ছন্ন অবরুদ্ধ সমাজ-পরিবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন মুক্তচিত্তদ্রোহী ও মানবতাবাদী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কূপমণ্ডূক বাঙালি সমাজে তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবেই আলোকিত মানুষ। তিনি ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সমাজচিন্তক। বিদ্যাসাগর রক্ষণশীল সমাজ-প্রতিবেশে আবির্ভূত হয়েও অনেকটা একক প্রচেষ্টায় যে সামাজিক সংস্কার-আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, প্রায় দু'শ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও এখনো তা আধুনিক ও প্রাগ্রসর বলে বিবেচিত হয়। প্রগতিশীল মানবতাবাদী এই সমাজ-সংস্কারক প্রধানত বাঙালি নারীর নানামাত্রিক কল্যাণ ও উন্নতির কথা চিন্তা করে আরম্ভ করেছিলেন তাঁর সংস্কার আন্দোলন। উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা বা গৌরীদান প্রথা—এসব প্রথা ও প্রবণতার কারণে বাঙালি নারী ছিল আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এসব প্রথা ও প্রবণতার বিরুদ্ধে ছিল বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম। বাঙালি নারীর সামূহিক মুক্তিই ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের মূল লক্ষ্য। বিধবাবিবাহ চালু করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বলতে গেলে তাঁর একক প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকার বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন করেছিল। কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ প্রথা বন্ধের জন্যও তিনি গ্রহণ করেছিলেন নানামাত্রিক উদ্যোগ। নারীর কল্যাণ ও উন্নতির প্রশ্নে যেসব সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন, তার অনেক কিছু এখনও বাঙালি সমাজে লক্ষ্য করা যায়। সেই সূত্রে অনায়াসেই বিদ্যাসাগরের সংস্কারচেতনার সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা আবিষ্কার করা সম্ভব।

উনিশ শতকে নানামাত্রিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে বাঙালি নারীর সাংসারিক-পারিবারিক-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান ছিল খুবই দুর্বিষহ ও দুরবস্থা-আক্রান্ত। নারীসমাজের দুরবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট নানা প্রথার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গ। উনিশ শতকে রাজা রাজমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিক উদ্যোগে যে সমাজসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, তার কেন্দ্রে প্রধানত ছিল নারীর সামাজিক-পারিবারিক ক্ষেত্রে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। সমাজসংস্কারকদের এই লড়াইয়ে অনিবার্যভাবে মুখ্য হয়ে উঠেছিল নারীশিক্ষার বিষয়টি। সমকালে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের প্রভাবে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি সমাজে যে আলোড়ন উঠেছিল, তারও অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীশিক্ষার বিস্তার। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার জন্য পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছেন একের পর এক বালিকা বিদ্যালয়। নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রচুর সময় দিয়েছেন, অর্থ ব্যয় করেছেন, সরকারের সঙ্গে নানামাত্রিক যোগাযোগ করেছেন। বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যেসব উদ্যোগ এককভাবে গ্রহণ করেছেন, আজকের দিনে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন মহান মানবতাবাদী চিন্তাবিদ। মানবতাবাদী চিন্তা তাঁর মানসস্রোতে ক্রিয়াশীল ছিল বলে মানুষকে তিনি মানুষরূপে বিবেচনা করেছেন, নারীকেও দেখেছেন মানুষরূপে। নারীকে প্রাকৃতিক লৈঙ্গিক পরিচয়ে তিনি বিবেচনা করেননি, তাঁর ভাবনায় নারী আবির্ভূত হয়েছেন জেন্ডার দৃষ্টিকোণে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে রেখেই তিনি নারীকে বিবেচনা করেছেন। আচারনিষ্ঠ প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করলেও, আপন বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল সনাতন সংস্কারবিমুক্ত মন। একারণে সামাজিক স্রোতের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে নারীকে তিনি মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নারীর সামাজিক মুক্তির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগকে উদার নারীবাদী তত্ত্বের আলোকে অনায়াসেই বিশ্লেষণ করা যায়। কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ, বিধবাবিবাহ চালু এবং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধের জন্য বিদ্যাসাগরের আন্দোলন উদার নারীবাদী চিন্তার সঙ্গে একান্তই সাদৃশ্যপূর্ণ। নারীশিক্ষার জন্য তিনি যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন, তা উদার নারীবাদী চেতনার বিশিষ্ট উদাহরণ। প্রচলিত সমাজকাঠামোর মধ্যে থেকেই নানামাত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথা সংশোধন ও পরিবর্জনের কথা ভেবেছেন বিদ্যাসাগর। বহুবিবাহ বন্ধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ এবং নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্ম প্রকৃত প্রস্তাবেই উদার নারীবাদী চেতনার সঙ্গে একান্তই অভিন্ন এবং সাদৃশ্যপূর্ণ।

নারীশিক্ষা-বিষয়ক সনাতন ধারণাকেই পালটে দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একসময় ভাবা হতো গৃহস্থালি কাজ আর সন্তান লালন-পালনের শিক্ষাই হলো নারীশিক্ষা। সামান্য অক্ষরজ্ঞান শেখা, চিঠিপত্র লেখা ও পাঠ করতে পারা, সূচিশিল্প শিক্ষা—এসব কিছুকেই উনিশ শতক পর্যন্ত ভাবা হতো নারীশিক্ষার প্রধান বিষয়। তবু হাতে-গোণা দু'একজন আলোকিত মানুষ নারীমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উনিশ শতকেই আধুনিক নারীশিক্ষার কথা ভেবেছেন এবং নানা কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নারীশিক্ষাকে বিদ্যাসাগর বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করেছেন। বিদ্যাসাগর আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন নারীর স্বাভাবিক জীবনবিকাশ। পূর্বগামী মানুষ হলেও বিদ্যাসাগরের চেতনায় নারীশিক্ষা বিষয়ে আধুনিক শিক্ষাতাত্ত্বিকদের নানামাত্রিক ভাবনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে নারীশিক্ষাকে অপরিহার্য উপায় বলে মত প্রকাশ করেছেন বিদ্যাসাগর। তিনি বুঝেছিলেন, নারীর সামগ্রিক বিকাশ ব্যতীত সমাজের প্রত্যাশিত বিকাশ কখনো পূর্ণতা পেতে পারে না। তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনায় এটাই ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর সুচিন্তিত পাঠক্রম রচনা করেছেন এবং সে-পাঠক্রমের আলোকে পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বাঙালি নারী যাতে যথার্থ শিক্ষা পেতে পারে, সেজন্য স্কুলের শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর শিক্ষার্থীকে দেশের অতীত ইতিহাস জানাতে চেয়েছেন। তিনি শিক্ষার্থীর চেতনায় এইকথা সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন যে, অতীত না জানলে বর্তমানকে সম্যক অনুধাবন করা যাবে না। বিদ্যাসাগর নারীকে পূর্ণাঙ্গভাবেই শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

নারীশিক্ষাকে বিদ্যাসাগর সমাজ-উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। শিক্ষার অভাবেই যে নারী পারিবারিক-সামাজিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে—একথা শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি প্রায়শই বলতেন। শিক্ষা ও সমাজ-উন্নয়ন যে পরস্পর সম্পর্কিত, একশ' পঁচাত্তর বছর আগেও সে-কথা অব্যর্থভাবে বুঝেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নারীমুক্তির পূর্বশর্ত হিসেবে তিনিই প্রথম শিক্ষাকে শনাক্ত করেছিলেন। অনেকটা আধুনিক জেন্ডারচেতনায় বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন নারীশিক্ষার ফলে বৃদ্ধি পায় নারীর পারিবারিক-সামাজিক ক্ষমতায়ন, নারীকে দাঁড় করায় তার নিজের মৃত্তিকার উপর—পুরুষের চোখ দিয়ে নয়, সে নিজের চোখ দিয়ে জগৎ ও জীবনকে দেখতে পায়। বিদ্যাসাগর যে তাঁর সময়ের অগ্রবর্তী মানুষ ছিলেন, তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনার এসব বৈশিষ্ট্যই যেন সেকথাই প্রমাণ করে।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিষয়ে দুটো মত প্রবল হয়ে ওঠে। একদল মনে করতেন, গৃহিণীর গৃহস্থালি কর্মের প্রস্তুতি ও সন্তান পালনের প্রাথমিক জ্ঞানার্জনই নারীশিক্ষার মূল লক্ষ্য। অন্যদল মনে করতেন, নারী শিক্ষিত হবে পুরুষের সমান স্তরে এবং সমতার ভিত্তিতে। বিদ্যাসাগর ছিলেন দ্বিতীয় ধারার চিন্তাবিদ। একুশ শতকের জেন্ডারচেতনার কথা উনিশ শতকের রক্ষণশীল অবরুদ্ধ সমাজে কল্পনা করা যায় না ; তবু একথা বলা যায়, বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাবনায় জেন্ডারচেতনার অনেক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল। শিক্ষাকে তিনি গৃহকর্মে নারীর পারদর্শিতা কিংবা সন্তান প্রতিপালনে দক্ষতার সূচক হিসেবে বিবেচনা করেননি, বরং নারীশিক্ষাকে তিনি গ্রহণ করেছেন নারীর সামূহিক অগ্রগতির অপরিহার্য উৎস হিসেবে। বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় কেবল শিক্ষিত হলেই নারী পুরুষের পাশাপাশি মানুষ হিসেবে নিজের অধিকার আদায়ের দাবি উত্থাপন করতে সক্ষম হবে। যথার্থ শিক্ষা দিয়ে বাঙালি নারীর চেতনায় বিদ্যাসাগর এই বোধের আলো জ্বেলে দিতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ সমকালীন অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী-চিন্তাবিদ বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়াসকে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করেছেন। 'He is only a primer writer'[১০] —বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিরূপ সমালোচনা পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বিদ্যাসাগরকে সহ্য করতে হয়েছে। অথচ, প্রায় দুই শতাব্দী শেষে মূল্যায়ন করতে বসলে আজ পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বিদ্যাসাগরকে বাঙালি নারীর খুব আপনজন হিসেবে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠা করা যাবে। নারীশিক্ষার জন্য তিনি যেসব পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন, তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সচেতন বাঙালি মাত্রই স্বীকার করবেন। কেবল নারীশিক্ষাই নয়, সামগ্রিকভাবে গোটা জাতির শিক্ষার জন্য তিনি ভেবেছেন। জনশিক্ষার জন্য তাঁর সদর্থক ভূমিকা ইতিহাসখ্যাত। বাংলাদেশে জনশিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগর যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তাঁর বাস্তবনিষ্ঠ মনোবৃত্তি এবং সৃজনশীল চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। জনশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা থেকেও বিদ্যাসাগর একাধিক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ইতিহাসখ্যাত বই *বর্ণপরিচয়* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের কথা উল্লেখ করা যায়। জনশিক্ষার প্রশ্নেই বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন এমন কথা যেখানে শিক্ষা ও অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের মতে, শিক্ষা দারিদ্র্য দূর করে আর এই কথা যদি ভালোভাবে গ্রামীণ চাষিদের কাছে পৌঁছানো যায় তাহলে তারাও সন্তানদের পড়ালেখার জন্য স্কুলে পাঠাবে বলে বিদ্যাসাগর মতপ্রকাশ করেছেন।

নারীশিক্ষা তথা সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যাসাগর যা ভেবেছেন এবং করেছেন, চূড়ান্ত বিচারে তা প্রত্যাশিত মাত্রায় সফলকাম হয়নি। উত্তরজীবনে বিদ্যাসাগরও কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বলতে গেলে তিনি একক হাতে যুদ্ধ করেছেন। এই রক্ষণশীল গোঁড়া ব্রাহ্মণরা বিদ্যাসাগরকে স্বাভাবিক চোখে দেখতেন না। এরাই নারীশিক্ষা-বিষয়ক বিদ্যাসাগরের সমগ্র চিন্তা ও উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন। অনেকে নিজেদের শিক্ষিত ও নারীশিক্ষার সমর্থক বলে ঘোষণা দিলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা মেয়েদের গৃহবন্দি করে রেখে বিদ্যাসাগর-পরিকল্পিত নারীশিক্ষার বিরোধিতাই করেছিলেন। এ কারণেই যুগের পর যুগ বাঙালি নারীর শিক্ষা নানামাত্রায় ব্যাহত হয়েছে। সমাজের উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণির প্রভাবে মধ্যবিত্ত মানুষের মাঝেও নারীশিক্ষা বিষয়ে নানাবিধ দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে। তারাও তাদের কন্যাদের স্কুলে পাঠাতে অনাগ্রহী ছিলেন। এ কারণে নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েও শেষ পর্যন্ত তারা পিছিয়ে যায়। তাদের এ ধরনের বিরূপ আচরণে বিদ্যাসাগর মর্মাহত হন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসকদের আচরণেও তিনি হতাশ হন। সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তীকালে বহুবিবাহ নিষেধ আইন প্রণয়নে ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপণ তাঁর বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে। এই দ্বিবিধ কারণে বিদ্যাসাগর মর্মাহত হন—হতাশ ও ভারাক্রান্ত চিত্তে সকল উদ্যোগ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাঁওতাল-জীবনে খুঁজে নিতে চাইলেন জীবনের শেষ আশ্রয়। তবু একশত পঁচাত্তর বছর পূর্বে বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর যে চিন্তা করেছেন, এবং গ্রহণ করেছেন যেসব উদ্যোগ আজকের এই প্রাগ্রসর যুগেও তার ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য।

উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে যখন নারীশিক্ষা ছিল প্রায়-নিষিদ্ধ, তখন নারীশিক্ষার পক্ষে বিদ্যাসাগরের চিন্তার প্রাগ্রসরতা একুশ শতকের মানুষকেও বিস্মিত না করে পারে না। নারীশিক্ষা চিন্তায় গোটা এশিয়াতেই তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। উনিশ শতকের অবরুদ্ধ পরিবেশে বসে বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা বিষয়ে যে প্রাগ্রসর ভাবনা ভেবেছেন, একুশ শতকের নারীবাদী তাত্ত্বিকদের ভাবনার সঙ্গেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ নারীশিক্ষা ভাবনায় বিদ্যাসাগর অব্যাহতভাবে প্রাসঙ্গিক ও আধুনিক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনা রীতিমতো বিস্ময়কর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাবনা, প্রকৃত প্রস্তাবেই, আধুনিক, প্রাগ্রসর এবং সমকালস্পর্শী।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

সংস্কৃত কলেজ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্রের পূর্ণপাঠ ছিল নিম্নরূপ :

To

Baboo Russomoy Dutt.

Secretary to the Sanscrit College.

Sir,

Agreeably to your instructions dated 21 April, I now beg to submit my reasons for tendering the resignation of my appointment.

I studied the Sanscrit language and literature in the government Sanscrit College and there imbibed my respect and zeal for these subjects. Impelled by these feelings and without any other strong motive, I applied for this appointment. I had hopes that I might be enabled to remove the impediments which I knew existed to the pursuit of effectual study and that I might be instrumental in introducing new and efficient methods, but finding my hopes of being useful frustrated and that there were circumstances of disgrace superadded I thought it high time to resign. I now proceed to state in detail the principal reasons for this step.

I was well aware of the causes which had conduced to render the scholarship examination of 1845 so unsatisfactory and on my appointment in April 1846, I found all these causes existing in full vigor. There was no rule or method for securing the course of reading necessary for the Junior Scholarships. One of the subjects is Grammar but the students of the Kevya and Alankar classes (in the Junior Department) were almost, without exception, utterly unfit to stand the most superficial Examination on the subject. Again Arithmetic is another of the subjects : but the scheme then existing did not admit any of the Junior Department to the Jyotish class, of course, they failed in Arithmetic. The students of the senior Department only were directed to study Jyotish; this branch formed not part of their examination. Consequently with very few exception they paid no attention to this study. The badness of such an arrangement is self-evident. Again for Junior Scholarship, it is necessary to make translations from sanscrit into Vernacular and vice versa. But there were no proper arrangements for that constant and regular practice in these branches which is so absolutely... and Books fitted for the purpose were also entirely wanting. Again Kavya is another subject, but the late Professor,

Dhaka University Institutional Repository

about for two years previously to his death which occurred in May 1836, was quite unable from bodily to do justice to his class. He used to instruct three or four of his senior scholars and leave to them the duty of instructing the rest and the person whom he occasionally gave as a substitute sometimes for long periods was very deficient in the necessary qualifications. When I joined, the class was divided into 10 sections reading different lessons and such had been the state of things for a considerable period. These irregularities were no doubt the cause why the scholarship examination of the Junior Class for 1845 was so unsatisfactory.

The students of the senior class have always been through the efforts of the Professors well trained in the branches which...the subjects of their immediate study, viz. Smriti and Nyaya, but in the other subjects for a senior scholarship, viz. General Literature, Essays and Translations, they were generally with a few exceptions found deficient owing to the want of an arrangement for regular practice in these points. In short, from the above and other similar reasons the instruction given fell far short of the objects proposed. Therefore the necessity of a complete revision of the system struck me forcibly on my first joining my appointment, but as it only wanted five months to the annual examination I determined then to confine my efforts to those points alone which were most immediately concerned. I consequently commend daily to give to the Senior Department Bengali Papers to be translated into Sanskrit. In the Kavya and Alankara classes of the Junior Department I...to recise daily a fixed portion of grammar and by threatening to degrade into the grammar class those who were found deficient as examinations taken by me every fortnight, I induced them to pay so much attention to this subject as in a great degree to remove the deficiency in this subject as was apparent at the next examination. And as regards Jyotish I represented to you the Alankara classes to attend at fixed times the deficiency in this respect. The 10 sections of the Kavya class were also with your sanction rearranged and reduced to three sections. The appointment of well qualified and diligent professors to this class about that time finally removed all the impediments to effecting study which and about that time finally removed all the impediments to effecting study which had previously existed. In addition to all these, two months previous to the examination I put a step by authority to all new lessons and caused all the students of the Institution to employ themselves solely in revising their former studies. In these two months the Kabya and Alankara classes went entirely through the two textbooks of genital Literature in the Junior Scholarship Examination viz, "Roghuvansha and Kumar Sambhava" and at the same time laboured...at Translations, Arithmetic and Grammar. The Bengale Books necessary for College of Fort William and other sources and lent to the students. In all my efforts I was warmly supported by the able and zealous professors of these two classes and I felt confident that the next examination would show a marked improvement

in the junior department. In the senior department the chief efforts were directed to remedy the deficiency of the students in the higher books of Poetry. A number of works were revised and to meet the want of Books I was again obliged to apply for copies of Magha and Bharavy to the College of Fort William and other sources referred to. The dificiency on this point was thus in a great degree provided for. But for want of leisure so much attention could not be spent to composition and translation. Thus from the day of my appointment I devoted all my energies to the object producing a marked improvement by the next examination and I had hoped that if such should prove to be the result that I should be though deserving of approbation by my superious. The examination proved satisfactory and the examiner reported favourably and I naturally looked for the prais, I throught, I had deserved; but from your letter no. 239 dated 4th January 1847 to the address of the Secretary of the Council of Education forwadint the Draft of your General report, it is clear that you were not satisfied with the dergee of commendation bestowed by the Examiner and in fact you considered his laudatory remarks on the progress of the students as altogehter unfounded. My just hopes of commendation were thus at once quashed; but I can boldly affirm and I appeal to all the professors and students that the means and efforts which I employed in the four or five months which preceded the Examination of 1846 and the zeal and diligence with which these were seconded by the other parties concerned have never been equaliled since the scholarships were first instituted and this I will also venture to assert that if the former system had not undergone such serious alterations the Examination of 1846 would certainly have proved worse that that of 1845.

I cannot expect...your approval of my conduct from your personal observation as your heavy duties seldom allow of your visiting the college. I can therefore look only to the report of the Examiner, but third resource has been also cut off by the bad spirit which you have received the favourable sentiments of that officer. It cannot however be denied that the method of instruction has in the course to these points. It must be inferred that the state of the college as to instruction before my arrival and the changes introduced by me must both have been hidden from your knowledge. I would submit if a person receiving such a return for his disinterested exertions had no just cause to be dissatisfied and if he can be expected again to take so much trouble upon himself.

I now advert to a second subject in which my well meant endeavours have been similarly rewarded with disappointment. On my joining the college when I made provision for meeting the most pressing necessity of preparing the students for approaching examination, I

cherished designs for a more... I know that a through and constant rearrangement of the whole system of study was necessary to develop and keep in permanent activity the resources of the Institution. Accordingly during the months of April, May and June, I watched and revolved in my mind the working of the whole system and when I was obliged by sickness to go home on the subject and obtained to writing. On my return I consulted...five of the Pundits on the subject and obtained their entire approval of by Major Marshall who recommended me to transmit it to for submission to the Council of Education. Thus encouraged I put the plan in an official form into your hands requesting you to bring the matter at once before the authorities, so that during the 3 weeks vacation then commencing from Durga Poojas the matter might be taken into consideration and the need scheme if approved by the Council might be adopted when the collage re-opened. You read the whole and observed there was no necessity to submit it to the Council as you could yourself adopt the new arrangements. After the vacation when I had often urged you to put in force the provisions of my new Plan you one day remarked that you felf at liberty to adopt the changes recommended on the subject of the Grammar Classes but you are not empowered to carry into effect the other proposals without the permission of the Council. On a subsequent day you came to the College with my plan in your hand and observed to me it would not be advisable to make any change without consulting the Council and that you would apply for their sanction to the new scheme as far as it regarded the Grammar Classes. I suggested that as an application was to be made to the Council it might as well embrace the whole Plan, to which you replied that it was no use sending up so many subject for consideration as they would not be attended to not even read, the members would take fright at such a voluminous document and it would therefore be better to bring if forwarding separate portion. After all this the only report made by you on the bring it forward made by you on the subject was on dated 16th October 1846 embracing only the Grammar classes and even add regards them you omitted mention of 3 class Books recommended by me which formed a prominent of the scheme and in fact without one of the classes must be crippled and almost useless. Thus out of all my suggestions one only was submitted by you to Council and that even in form. All my other proposals have been treated as totalled of consideration. but I nevertheless feel confident that each of them is calculated in no way to injure the College but on the contrary to promote its efficiency. I am enabled to say on the coinciding judgment of others highly qualified to gived an opinion that if my scheme or some other very similar be not substitute for the present of defective system. the Institution will not fully answer its two purpose, namely of imparting Sanscrit Literature Primary and of teaching English Secondarily. At any rate it is highly unsatisfactory to find my evdeavours and labours frustrated without any due consideration of their merits.

Dhaka University Institutional Repository

There is another circumstance connected with this report of mine justly calculated I think to cause me much dissatisfaction.

Major Marshall at the close of his report on the Scholarship examinations recommended to the Council to adopt the suggestions made by me which has so often been alluded to. On this in the Annual Report of the Sanscrits College for 1846-47, you remark : "The report referred to by Major Marshall was prepared by direction of and mostly from data furnished by in it which accorded with his expressed views have already been submitted to and approved of by the Council of Education and are contained in the introductory portion of this report. "Now I respectfully deny even having received from you any data for the preparation of that report and the only thing in the shape of direction I can remember was your instruction to devise a plan for reducing the number of sessions in each class and introducing...Into the Grammar Classes. As to my chief recommendations. 'having been submitted to and approved of by the Council that is briefly answered by referring to what has been shown before namely that out of the numerous subjects referred to in my ling report only part of one has been thought by you worthy to be laid before superior authority.

From the length to which this paper extended I must bring it to a close, but I shall always be ready to meet any proper enquiry into the subject mentioned. I think have brought forward sufficient to show that my labours have not met and are not to meet with due application and this is the ground of my resignation.

I studied 12 years and 5 months in the Sanscrit College with some distinction. I was the next 5 years Head pundit of the College of Fort William. during which period my time was wholly devoted to Sanscrit studies, and my assistance was every year required by Major Marshall for preparing questions for the Sanscrit College Scholarship examination as for Examining the Replies given in. In ging up that appointment for my present one, I was clevated by the hope that I was entering on a sphere where my acquirements in Sanscrit College whole prove of great benefit but as I have already stated I consider my expectation to have been frustrated.

One point affecting the credit and comfort of the College I had almost omitted. I allude to the privilege assumed by the Principal of The Hindu College to take occasionally a portion of the stools and desks of the Sanskrit College for the accommodation of his own students at

particular Examination for 3 or 4 days together. Some of our students are abliged to sit on the ground and it must be remembered the rooms are not matted. This irregularity has been frequently reported to you and although you have frequently promised to take efficient steps for putting a stop to such unjust interference, yet you do not appear to have taken any such steps either because you approve of such conduct or because you are not impressed with the inconvenience and unseemliness of our half of a class sitting on the bare ground whilst the other half sit on stools. Such a disregard of the comfort of the students and of the rights of the institution is to me highly distasteful.

I have thus stated some of the principal reasons for tendering my resignation. The assigning of such reason in detail did not appear to me to be at all necessary; but in compliance with your especial requests I have frankly submitted them.

I must therefore... that allowances will kindly be made for any expressions which may carry an appearance of undue freedom.

I have the honour to be

Sir

your most obedient Servant

Sanscrit College. Ishwar Chandra Sharma

3rd May, 1847 Assistant Secretary, Sanscrit College.

[সূত্র : বিনয় ঘোষ, ২০১১। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ. ৫০৮-৫১৪]

পরিশিষ্ট-২

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর পত্রের পূর্ণপাঠ ছিল নিম্নরূপ :

Respectfully Sheweth,

That your memorialists beg to express their sincere regref leering that Ishwar Chandra Vidyasagore, Assistant Secretary to the Sanscrit College, has for reasons unknown to them resigned his situation as they are really afraid that his resignation at a time when the College is as it were being altogether remodelled. will prove very much prejudicial to its true interest.

The Assistant Secretary by his personal abilities and industrius habits, and zeal in the welfare of the College is already known to you, Introduced several beneficial changes and proposed such salutary innovations in the system of Education hitherto pursued their, as your memorializes expect, will soon place that Institution on a very soiled efficient footin. Your memorialists are of opinion that the appointment of the said Vidyasagore does great credit to your judgement, who determined on the last occasion of filling up the vacant of your assistant upon nominating one, intimately acuainted with the Sanscrit and tolerbly verse in the English language as they believe that the assistant Secretary has been in a great measure enabled by the above qualifications to plan the revised system already noticed. Under these circumstances your memorialists cannot but be sorry that he has tendered his resignation and they sincerely trust as his loose cannot easily by supplied that you will be pleased to adopt such measure as will induce Ishwar Chandra to continue his services at the college which will no doubt be greatly conducive to the prosperity of our Institution.

In conclution your memorialists beg to state for your information that the resingnation referrerd to, being tenderd to the secretary of the Council of Education your memorialists have with a view to prevent delay, presented a similar memorial to Dr. Mouat in the hope that he may not take hasty steps to accept the resignation of an office, who might otherwise be induced to continue his services to the college if not for his own, at least for the interest of the institution which he was appointed to look over.

And your memorialists as in duty bound shall ever pray.

Sanscrit College

10th April 1847.

[সূত্র : বিনয় ঘোষ, ২০১১। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ. ৫১৪-৫১৫]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

বিদ্যাসাগর প্রেরিত পরিকল্পনার পূর্ণপাঠ ছিল নিম্নরূপ :

To,

F. J. MOUAT, ESQ, M>D.

Secretary to the Council of Education.

SIR,

I have the honour to submit for the information of the Council of Education, a report on the Sanscrit College, drawn up agreeably to the instructions conveyed in tour letter No. 3538, dated the 5th instant.

I beg leave to remark that it has long been in my contemplation to submit a report of the nature now furnished, but circumstances deterred me from such a step. I am now, however, happy to have an opportunity of carrying out my wishes as a matter of duty, under the sanction of the Council.

Report.

1. Grammar Department : Under the present system this department consists of five classes. The works studied are Mugdhabidha, Dhatupatha, Amarakosha and Bhatti kavya. the fifth class studying 17 pages of Mugdhabdha, the fourth class, 42 pages of the same work; the third class. 100 pages; the second class, the remaining 90 pages of the same book, together with Dhatupatha and the first class, a few books of Bhatti kavya and a certain portion of Amarakosha. 2 Four years are the prescribed period for continuing in this department; but five years are necessary to enable a student to pass though the five grades. For want of a better system, the advantage gained is very little compared with the length of time spent by students in this department.

Mugdhabdha is a very short compendium of grammar. The author Vopadeva seems to have had brevity simply in view. Having had this for his object. he has consequently, made his work extremely difficult. The Sanscrit is in itself a very difficult language, and to begin its study with a difficult grammar seems, in my opinion, not to be a well-chosen plan. Experience

shows what difficulties one has to surmount when studying his grammar in this style Young lads, who begin to study Sanscrit, on account of the extreme difficulty of the Grammar Mugdhabdha, only learn by rote what their instructors say, without being able to themselves to understand the contents of the work they read. Thus 5 years pass in the study of grammar alone, without getting any essential introduction to the language itself. It seems to be an atounding fact that one should be studying a language for 5 years and scarcely understand a bit of it. Moreover, the Mugdhabdha, with all its voluminous commentaries, which last, howeover, are not reat in the college, is an imperfect grammar. So, under the present system, the first 5 years of a student of the Sanscrit College, is alomost lost to useless purpose. After all his toil and trouble, his acquirements in grammar are very imperfect. Again, Dhatupatha, another of the works studied in this Department, is a dictionary also in verse, Amarakosha the third work of study, is a dictionary also in verse. These two works when mastered, I admit, are of some assistance to the study of literary works. But the advantage gained is not all the commensurate to the time and labour required to get them by heart. Besides, almost all the standard Snacrit poetical works, which ate the main part of Sanscrit literature, brethren who "blance the obscure places and discourse upon the plain." Under the above considerations, I do not think it a good plan to spend the first 5 years of study in the Sanscrit College in reading Mugdhabdha, Dhatupatha and Amarakosha. Bhatt kavya, the fourth and last work of study in this department. is a poem, the theme of which Rama and his adventures. This work was purposely written to exemplity the rules of grammar. It is not altogether ill adopted for the grammar department.

After all these considerations, I beg leave to propose the following remodelled system of study for the grammar Department. Should the Council be pleased to adopt the suggestion. I do think, in my humble opinion, that in 4 years, the time prescribed now for grammar and tolerable proficiency in literature besides, and they will not experience the difficulty in the Sahitya class which they do now, being made all at once, just after finishing an imperfect grammar, to begin with the standard works, without having had an insight into the language.

The system I would propose is this : The boys instead of beginning the grammar at once in the Sanscrit language should learn some of the most fundamental rules dressed in the easiest Bengali; then they should go on with two of three Sanscrit "readers" to be compiled. These "Readers" should consist of easy selections from the *Panchatantra*, *Ramayana*, *Mugdhabdha*, and from other works suited for the purpose. This will take the students some two years. After this they should begin either Siddhanta Kaumudi, Bhattoji Dikhshita the study of which they

Dhaka University Institutional Repository

should continue to the highest class of the grammar department. Of all the Sanscrit grammars this is decidedly the best and the highest authority on the subject. It is at once complete and simple. Along with siddhanata Kaumudi the students also study Raguvansha ans selections from both Bhatti kavya, Dashakumara Charita etc, etc...I beg leave also to propose that instend of five classes there should be four, and the fifth be considered as a section of the fourth, both studying the same books, and the promotions from both the the classes being to the third. By this arrangement a year will be conveniently saved, and the period for the grammar department instead of being five shall be four years.

2. Sahitya of General Literature : The students coming from the grammar Department have to study in this class for 2 years. Whilist here, they read the following works :

1. Raghuvansha
2. Kumarsambhava
3. Meghaduta
4. Kiratarjuniya
5. Shishupalabadha
6. Naisadha Charita
7. Shakuntala
8. Vikramorvashi
9. Ratnavali
10. Mudrarakshasa
11. Uttara Charita
12. Dasakumara Charita
13. Kadambani

They also Practice translation from Bengali into Sanscrit and vice versa, and attend the mathematical class.

The first 6 of the 13 books abovementioned are the standard poetical works the seventh eighth, ninth, tenth and eleventh are daramas, the last two are prose compositions. Raghuvansha is a historical poem in 19 books. Its theme is the adventures of Rama, those of his four immediate ancestors, and the adventures of rama, those of his four immediate ancestors, and the adventures of his descendants down to Agnivama.

Dhaka University Institutional Repository

Kumar Samhbava, from the name, would appear to be a poem all celebrating the birth of Kartikeya, the Mars of the Hindus. But the 7 books that are extant embrace a certain portion of the intended theme. The poem, as is stands, describes the birth of Parvati, the mother of Kartikeya, the burning of Kamadeva, the god of love, by Shiva, the Tapasya (austerities) of Parvati and her marriage with Shiva, Meghaduta is a poem in 118 sloks, A Yaksha or demi-god, having excited the wrath of his master Kuvera, the god of wealth, was doomed, by the curse of the master deity, to remain in a state of separation away from his beloved wife, in a distant land, for the full length of one year. The lover in his distressed condition addresses a cloud, to bear his message to his wife at Alaka, the capital of Kuvera. The Shakuntala and Vikramorvashi are dramas; the first has for its subject the story of Shakuntala, the adopted daughter of a sage named Kanwa, and Dushmanta, a king; the plot of the second is the story of Pururava a king, and Urvashi, a nymph. All these are very excellent productions. They are by the immortal Kalidasa. Every one of them bears the stamp of his great genius. Shishupalabadha, Kiratarjuniya and Naisadha Charita are epic poem, the first by Magha in 200 books, and the second by Bharvari in 17 books, the third by Shriharsha in 22 books. Tha death of Shisupala by the hand of Krishna, his cousin, is the theme of Maghas poem. The Kiratarjuniya contains the tapasya of Aruna, his combat with Shiva in the disguise of a Kirata or barbarain, and finally his acquisition of certain weapons as rewards from Shiva, who was pleased woth his military prowess. The adventures of Nalaraja form the subject matter of Naisadha Charita. The first-mentioned two works possess all the attributes of good epics, only now and then there are some very tedious passages. The 7th, 8th, 9th, 10th books of Kiratarjuniya have in many places very obscence passages. Naisadha Charita from the beginning to the end is bombastic and hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste : there are occasional bursts, however, of fine passages Uttara Charita by Bhavabhuti is a drama, embracing the latter part of the career of Rama. Ratnabali is also a drama, Dhavaka is its author. He was paid by Rajah Shriharsha to write this work alone with another and attribute its authorship to him. The story of Rajah Udayana and Ratnabali is the plot of this drama. These two works are excellent in every respect. Mudrarakshasa by Vishakha Datt, may be called political drama. In its contents we find that Chanakya, the Prine Minister of Chandragapta, the Sanddracottus of the Greeks is applying his diplomatic skill to consolidate the newly acquired empire of his master, by baffling all the efforts of Rakshasa the royal Prime Minister of subvenrted Nanda family, to subven in ten the new dynasty. This also is a good piece of composition, Dasakumara Charita and Kadambari are in prose. In the first a certain number of friends are relating to each other the history of their travels. The style is pure and chaste. The are however, some objectionable passage. Dandi is its author.

Dhaka University Institutional Repository

Kadambari is a novel, or rather an epic poem in prose. It is in parts. The farst part is a masterpiece of Sanscrit composition. The author, Vanabhatta, did not live to complete his admirable work. His son wrote the second part. The production of the son is far inferior to that of the father.

Having laid all this before the Council, I beg leave to state there is not much alteration required in the purely literary studies if this classs, with regard to mathematical studies I will speak hereafter, when I report on the Jyotisha class. The change I would propose is this; Raghuvansha, as I have proposed in 1, report of the grammar department, should be trasferred to the first grammar class, and the Dashakumara Chatita, instead of being read entire here, be studid in selections in one of the grammar classes, and the Shishupalabadha, Kiratarjuniya and Naisaddha Charita, having many objectionable passages, as stated before, instead of being read entire. All the other works should be read entire. In addition of this I beg leave to propose that other works Vira Charita and Santishataka, be studied in this class. The former is the first part of that drama of which Uttara Charita is the second. being in no way inferior to it. The Santishataka is an excellent didactic poem. The students should practise translating as before. The should also write essays in Sanscrit and Bengali.

2. Alankara or Rhetoric Class : After Sahitya the students come to this class and continue in it for two years. They read in this class the following on rhetoric :

    1. Sahitya Darpana
    2. Kavya Prakasha
    3. Kavya Darshan
    4. Rasagangadhara

They also read those poetical works which from of time they cannot go on with in the Shaitya class. Besides this, they have for their exercise, translations and compositions. They also attend the mathematical class.

With regard to this class I beg leave propose to the following change. The text-books should be Kavya Prakasha and Dasharupaka. Generally Sahitya Darpana is the work read but I prefer Kavaya Prakasha and Dasharupaka on the following grounds. Kavya Prakasha is a much more profound work than Sahitya Darpana, and is acknowledged to be the highest authority on the

subject. The best commentators, such as Mallinatha, quote this work for their authority the Sahitya Darpana only dilates in very diffuse style what the Kavya Prakasha contains in essence. Kavya Prkasha, however, speak nothing of dramatical compositions. Dasharupaka treats of that portion of rhetoric. Besides, this is the highest authority in body own department. Kavya Prakasha and Dasharupaka could be read in less time than Sahitya Darpana. So the former two have every claim to be preferred to the latter, and after reading the two first, to read the last also would be waste of time. The purely literary works, should my suggestions regarding the studies of the grammar and Sahitya departments be adopted, will not require to be studied as class books in this (rhetoric) class. The hours that will thus be saved from the immediate objects of the class should be devoted to the study of mathematics and other works, of which I will make mention afterwards.

3. Jyotisha or Mathematical class : The students of the Sahitya and Alankara attend this class and study Lilavati and Vijaganita. Lilavati is a treatise on arithmetic and measuration by Bhaskaracharya, Vijaganita is a treatise on Algebra by the same author. Both of these works are very meagre. They are in a great measure without any method, and do not contain all that is contained in similar English books. From a curious taste they have been rendered needlessly difficult. The rules and questions are all inverse. On account of this students take so great a lenght of time as four years to study these two books. The examples are too few.

Great changes are required in this branch of study. For the present complete treatises on Arithmetic, Algebra and Geometry should be compiled from the best English works on those subject. After studying these, the students will be able to read Lilavati and Vijaganita with great facility. The higher branches of Mathematics should be attempted to be translated afterwards, and when ready should be adapted as class books. I would now propose that a popular treatise on Astronomy, such as Herehel’s be compiled in Bengali, and be read in the mathematical class. These works might have been studied in English; but then appearance in Bengali will be of great use also in the Vernacular schools. Besides the Sahitya and Alankara students, the students of the Smriti and Nyaya classes should attend the lectures of the Prosfessor of Mathematics.

Here the junior department of the Sanscrit College is considered to terminate.

I beg leave to propose that the study of Bengali books, treating of useful and entertaining subject, be introduced in the classes of the junior department. The works should treat of such subjects as the following :

For the Fourth Grammar Class : Pretty stories about animals.

For the third Grammar Class : Rudiments of knowledge, as in Chamber's Educational course.

For the second Grammar Class : Moral class Book, as in Chamber's.

For the First Grammar Class : Miscellaneous subject, such as Art of printing, Loadstone, Navigation, Earthquayke, Pyramids, Chinese Wall, Honey Bee, etc.

For the Sahity Class : Biography, as in Chamber's, and miscellaneous reading on useful and entertaining subjects, selected and translated from Telemachus, Rassaelas, Maahabharata etc.

For the Alankara Class : Essay of Moral, Political, and Literary Subjects, and a popular treatise on the Elements of Natural Philosophy.

Should the Counsil be pleased to introduce these Bengali Books, the students of Sanscrit College will, with little difficulty, acquire great proficiency in Bengali, and through the medium of the language, derive useful information, and thereby have their views expanded before commence their English studies.

Of the above mentioned Bengali works, the biography is already publised rudiments of knowledge and moral class book are in the press and almost all the other works are in the course of preparation. The adoption of these books will entail on the Council no expense whatsoever.

I beg also to state that the preparation and the publication of the rudimented of Sanscrit grammar in Bengali and that of the Sanscrit selections shall need no pecuniary assistance of the Council.

The preparation of the works for the Mathematical class, namely Arithmetic, Algebra, Geometry and a popular treatise on Astronomy, suitable for the use of the Sanscrit College, will need the patronage of the Council of Education, when the state of the education funds will admit of this being affored.

4. Smtriti or Law Class : After the Alankara the students come to this class, and continue in it for three years The works read are :

    1. Manusanghita
    2. Mitakashara, 2nd Section
    3. Vivada Chintamani
    4. Dayabhaga
    5. Dattaka Minangsa
    6. Dattaka Chandrika
    7. Ashtavinshati Tattwas.

The institute of Manu is the highest authority on the subject of Hindu Law. It treats of social, moral, political, religious and economical laws. It is in a manner an index of Hindu society in ancient times. Mitakasahara, by of civil and criminal laws, the former including the law of inheritance. Mitakasahara is acknowledged to be the highest authority in the North-Western Provinces. Vivada Chintamani, by Vachaspati Mishara, is a compilation of civil and criminal laws. This work is the authority in the province of Bihar. Dayabhaga, by Jimutavahana, is a treatise on inheritance. This work is the authority in Bengal. Dattaka Mimangsa and Dattaka Chandrika are treatise on the adoption of children and theire civil rights. The Mimangsa is the authority in the North-Western Provinces and the Chandrika in Bengal. The Ashtavinshati Tattwas are by Raghunadana. With the exception of the Daya and Vyavahara the other 26 Tattwas are treatise on the forms of religious ceremonies.

With reagard to this class I beg leave to observe the study of the 28 Tattwas ought to be discontinued. Though they are of use to the Brahmas as a class of preists, they are not at all fitted for an academical course. The other works should be allowed to keep their place. These study makes one conversant with the Hindu law of every part of India.

Dhaka University Institutional Repository

5. Nyaya Class : The Nyaya system of philosophy principally treats Logic and Metaphysics, and occasionally touches upon subjects relating to Chemistry, Optics, Mechanics etc. The same description applies more or less to the other systems, accepting Mimangsa and Patanjal, which treat of religious ceremonies and abstanct contemplation of the deity respectively. The years of study in this class are four the works studied are the following :

6. Bhashaparlcheda
7. Siddhanta Muktavali
8. Nyayasutras with Vritti of commentary
9. Kusumanjali
10. Aumana Chintamani and Didhiti
11. Shabdashaktiprakashika
12. Paribhasa
13. Tattwa Kaumudi
14. Khandana
15. Tattwa Viveka.

Bhashaoarichchheda, by Vishwan Natha Panchanana is an elementary treatise on all the departments of Nyaya. Siddhanta Muktabali is a commentary on the Bhashaoarichchheda by the auttor himself. Nyaya Sutras are by Goutama, the founder of this school of philosophy. Kusumanjali treats the existance of the deity and that of a future state. The line fargumentation on the whole is similar to what is to be found in modern Europe works on the same subject. The author is Duayanacharya. Aumana Chintamani is a work of the modern school of Nyaya philosophy on deductioin, by Ganeshopadhayaya. His reasoning is similar to that of the schoolmen of the middle ages of Europe. This treatise is what Bacon would call a "cobweb of learning". In the study of this works insurmountable difficulties are to be met with. Anumana Didhiti is its commentary, by Ragunath Shiromani. He is the dictator of the modern Nyaya school of Philosophy. Shabdasmtiprakashika, by Jagadisha, is a treatise on theimport of words. Paribhasha, by Dharmaraja, is a short treatise on the Vedantic doctrines. Tattwa Kaumudi, by Vachaspati Mishra, is a short but comprehensive treatise on the Sankhya system of philosophy. Khandana is by Shriharsha. The object of the author in this work is to refute all the then existing systems of philosophy, and to establish his favourite, the Vedantic. This work is of high repute. The author has handled the subject in the most abstruse style, and has actually made it what they call "muddy metaphysics." Tattwa Viveka, by Udayanachaya, aims at refuting the universe. The style of this work has the opposite faults of being abstruse and diffuse.

After the above observations, I beg leave to suggest that this class, instead of being called the Nyaya or Logic class, be called the Darshana or Philosophy class and that the study of Anumana Chintamani and Didhiti, Khandana and Tattwa Viveka be discontinued, and in their place be studied the following works on the other systerms of philosophy, excluding the mimangsa or rule of religious ceremonies :

1. Sankyapravachana
2. Pranjala Sutra
3. Panchadashi
4. Sarvadarsanasabgraha.

The period of study in the Sanscrit College is 15 years. One is expected to have a perfect knowledge of Sanscrit learning ion so long a period. But no one may be considered to have such knowledge who is not familiar with all the systems of philosophy prevalend in India. True it is that the most part of Hindu systems of philosophy do not dally with the advanced ideas of modern times, yet it is undemable that to good Sanscrit scholar knowledge is absolutely required.

Should the Council be pleased to adopt the suggestions that I will submit in the succeeding part of my report regarding the English department, by the time that students come to the Darshana or Philosoph class, their acquirements in English will enable them to study the modern philosophy of Europe. Thus they shall have an ample opportunity of comparing the systems of philosophy of Europe. Thus they shall have an ample opportunity of comparing the systerms of philosophy of their own, with the new philosophy of the western world. Young men thus educated will be better able to expose the errors of the ancient Hindu philosophy than if they were to derive their knowledge of philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all pevalent systems of philosophy in India, is that the students will clearly see that the propounders of different systems have attacked each other, and have pointed out each other’s errors and fallacies. Thus they will be able to judge for himself. His knowledge of European philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.

16. English Department : The present mode in which this very useful department is conducted is very unsatisfactory. There is no rule as to what students are expected to study English, but it

is entirely left to their own option. They commence the study English, but it is entirely left to their own option. They commence the study when they please, leave it off at their own option, and commence again when it suits their purpose. Many students on being attached to the grammar classes, at their first admission, immediately commence English, but from the difficulty of the first principles of both languages, the greater part being unable to carry on both at once, some after a short time neglect their English and others the Sanscrit. It is the case with many to retire from the English class just before the examinations. The session there is another circumstance while answers creat confusion, which is that one English class is constituted of students Sanscrit classes. Taka for instance, the components of the third and fourth classes. The third class consists of 13 boys, 4 of whom belong to the smriti class. I to the Nyaya, I to the Alankara, 3 to the thrid grammar class and 5 to the fourth grammar class. The fourth class consist of 33 boys, 2 of whom belong to the Alankara class, *5* to the Sahitya, 2 to the first grammar class. From the circumstances of students of various Sanscrit classes coming to attend the English class, it becomes altogether a difficult affair to secure regular attendance in the latter. Again, the study of English being optional some portions only of each Sanscrit class are students in the English department. Such students, particulary those from the lower classes, cannot to on with their Sanscrit studies with that degree of attention, which the non-English reading students can. But the studies of the class being the same with all, the progress is greatly impeded.

The English Department, if continued to be conducted in their irregular style, is not expected to be productive of any satisfactory results. After the creation of the English Department in this institution a similar irregular mode of conduction is rendered it useless, which caused its ablation by the late General Committee to Public Instruction. If better arrangements be not made, the present English Department will also become useless.

Under the above considerations. I beg leave to suggest the following arrangement, which I am persuaded, if steadily pursued, will be productive of beneficial results. The arrangent I would propose is as follows :

The students should not be allowed to commence English till they have acquired some proficiency in the Sanscrit language; the pupils of the same Sanscrit class shall go on whith same English studies the study of English instead of being optional be compulsory; should there be anyone very unwilling to be taught in English, he given to understand that he will not

be allowed to commence Enlgish at any subsequent stage of his Sanscrit study, as create for him alone a separate class is altogether out of the question.

Under the proposed system of Sanscrit study, the students of the Sahitya class, it is assumed, will be well-acquainted with the Sanscrit language. Therefore I beg leave to propose that the study of English be commenced in the Alankara class. In that case the students will be able to devote to the study of English nearly double the time they do how; and their minds, having received culture, they will not how to being with such trite subjects as young beginners are obliged to commernce with. From the Alankara class to the last year of study in the college is some 7 or 8 years and a diligent student of that period will have ample opportunity of making himself familiar with English language and literature.

17. Fifth grammar Class : Another very important circumstances I beg to bring to the notice of the Council. The fifth grammar Professor Pundit kashinath Tarkapanchanana is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.

From all these circumstances, his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, rupess 40 a month, and the present librarian, Pundit Girish Chandra Vidyaratna, a very distinguished ex-student of the institution, be appointed to the chair of the fifth grammar professor with his present salary rupees 30 a month to be raised to rupees 40 when a favourable opportunity offers.

18. Promotions—With regard to the promotion of boys from one class to another, the present practice of the college is to keep them in each class for the allotted number of years, and send them at the expiration of the time to the higher class, without any consideration as to the degree of their acquirements.

Under this arrangement if so happens that a students, no withstanding be may have finished his course in the class, is not allowed to join the higher one if he has not finished his allotted years, whilst another, let him be how deficient sever in the studies of the class is promoted to

the higher class, simply if he has merely completed the prescribed time, therefore I beg leave to propose that promotions take place on the principle of merit, not years : only with this limitation that no one will be allowed to remain in the college beyond the period prescribed by the scholarship rules. I am persuaded that under his arrangement all students above mediocrity will finish their collegiate course of study in less than the time now prescribed.

19. Discipline : The laxity of general discipline in the institution at present is notorious. It is highly desirable that strict and steady attention should be paid to ensure regularity of attendance to put a stop to students constantly leaving their classes on trivial pretences to prevent needless noise, taking and general confusion. There is inhere cause whatever why the discipline in this college should not be equal to that which obtains in any English institutions. The same methods require only to be enacted and enforced. In conclusion, I beg leave to onserve that the changes now proposed by me in the system of the college are the results of a long and anxious considerations of the subject. They are extensive but I have endeavoured to select only those which are absolutely necessary for the efficiency of the institution, and which are quite practicable. Should the Council be pleased to adopt these suggestions, I have sanguine hopes that the happy and speedy results, under an efficient and steady supervision, will be, that the college will become a seat of pure and profound Sanscrit leering, and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen.

I have the honour to be

SANSCRIT	Sir,
COLLEGE	Your most obedient servant
The 16th	Ishwar Chandra Sharma
December	Professor, Sahitya, Sanscrit College
1850	

[সূত্র : সফিউদ্দিন আহমদ, ২০০৮। *বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী, চিঠিপত্র ও উইল*, পৃ. ৭২-৮৮]

পরিশিষ্ট-৪

'Notes' On The Sanscrit College' শিরোনামে বিদ্যাসাগরের রিপোর্টটির পূর্ণপাঠ ছিল নিম্নরূপ :

'NOTES' ON THE SANSCRIT COLLEGE

1. The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrasted with the superintendence of Education in Bengal.
2. Such a Literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.
3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit scholars. Hence the necessity of making Sanscrit scholars well-versed in the English language and literature.
4. Experience prove that mere English scholars are altogether ineapabic of experessing their ideas in elegant and indeomative Bengali. They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make Sanscrit their after study, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.
5. It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.
6. Our next question is what sort of Instruction in the Sanscrit College is necessary for the purpose?
7. The students of the Sanscrit College should be throughly instructed in Grammar and Literature—the latter, including poems, dramas and prose works.
8. In Rhetoric they should be introduced in two or three capital work, such as kavya prokash and two or three chapters of Sahitya Darpana.
9. The study of these, that is grammar, Literature and Rhetoric will enable the student to acquired a complete mastery of the Samaj Language.
10. In law they should study the following works : The Institutes of Manu Metakeshara see, It Vivda Dayabhaga Duttaka minunce and Duttakachundrika. The study of these is sufficient to make one conversant with the Hindu Laws current in almost every part of India.
11. In mathematical, Lilavati and Vijaganita are textbooks. Lilavati treats of arithmetic and measuration and Vijaganita of Algebra. These two works are very meagre and from a curious perversion of Ingenuity and obsessed of a right sense of real value and object of such studies, the author has made them so difficult by putting the rules and questions all in verse that the students cannot go through them in less than three or four years. The examples are very few. The fact is, the interferes largely with other studies and engrosses a great deal of time and labor which might be employed in far more useful pursuits.

Dhaka University Institutional Repository

12. Hence the study of mathematical in Sanscrit should be discontinued.
13. It is not be understood from this that I undervalue a knowledge of mathematics as an essential element of a complete education. Far from it, I wish to substitute it in English, where in less than half the time now given to it an intelligent student will acquire more than double the amount of sound information that the could obtain by the most perfect acquaintance of all that exists in the Sanscrit langauge in the subject.
14. There are six prominent school in Hindu philosophy namely Nyaya Vaisheshika Sanklya, Patanjala, Vedanta and Mimangsa. The Nyaya systerm of philosophy principally treats of Logic and Metaphysics and occasionally touches upon subjects of Chemistry, Optics, Mechanics etc. The same description applies more or less to the other systems respecting Minangsa and Patanjala which treat, the former of religious ceremonies and the latter of abstract contemplation of the Deity.
15. As to the utility of the study of these in a college course I should quote the words of my report dated the 16th, December 1850.
16. True it is that the most part of the hindu system of philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable than to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required.
17. Another advantage is that students, so prepared wishing to transfer the philosophy of the West into a native dress will possess a stock of technical word, already in some degree familiar to intelligent natives.
18. A profound knowledge of these is not required. It will suffice if the students go through these works. In Nyaya Aphirisms of Goutama and Kassumanjali. In Vaisheshika, aphorisms of Kanda; in Sankyya, aphorisms of Kapila and Turra Koumndi in Patanjali, Aphorisms of Patanajala : in Vedcanta the Vedcnta Sara and the I and books of the Aphorisms of Vyasa; in Mimangsa, Aphorism of Jarnil. In addition to this the students should read the Sarbadarshana Sangraha being reivew of all the systems of Philosophy presented in India. The study of these works will make one familiar with Hindu Philosophy without loss of time.
19. The students of the Sanscrit College while they are in Grammar and Literature classes should direct their attention principally to Sanscrit studies devoting two-thrids of the time to the Sanscrit and one-third to the English. When they are in Rhetoric, Law and Philosophy classes their chief attention should be directed to English devoting two-thirds of the time to this important branch of education.
20. At present the following are the subject for the Senior Scholarship examination in the Sanscrit College : Literature, Rhetoric, Mathematics, Law and Philosophy, Sanscrit Prose, Essays. These should be modified, Literarure and Rhetoric should form one subject. Mathematics in Sanscrit and Sanscrit Essays should be dispensed with and in their stead three branches in English namely, History, Mathematics, and Natural Philosophy should form each a subject of Senior Philosophy,

Logic and Political Economy should from also subject of the same examination being in turn selected every suceeding year.

21. The English Department consisting of two teacher is quite inadequate to fulfil the object in contempation. Moreover, the present teacher are not sufficiently familiar with Mathematics and Natural Philosophy. I am fully convinced that they are not the class of teacher which the necessities of the Sanscrit College absolutely requires. They would do well if transferred to other Institution where they will not be required to teach more than the elementary portions of an educational course.
22. Tills department should therefore be remodelled and made to consist of four efficient teachers with studies of Rupes 100,90,60 and 50 respectively. With these remunerations the services of good teachers may be secured. This arrangement requires 300 Rupees per Month for the English Department.
23. By the discontinuance of the Sanscrit Mathematics class and the transfer of the two present teachers there will be a saving of 250 Rupees per month, the remaining 50 should be supplied from the founds appropriated to the Institution, which are Rupees 24,000 per annals and out of which only 19,00 and some add hundreds are at present expended.
24. But if the state of the Education founds would not at present in any way admit of this additional expense, the demand may be supplied in other ways. There are at present two writers who copy manuscripts, one in Bengali, one in Nagree, each receiving 16 Rupees per month. The menuscripts which they copy are quite useless. Manuscripts are generally very incorrect, and every time they are copied the mistakes and omissions get at least doubled. Thus manuscripts copied by mere copyists become almost unintelligible. Besides, the two writers employed in the Sanscrit College can copy in one month little more than 5 & 6 Rupees which they draw 32 Rupees for mensem. Their Sources therefore should be dispeased with and the 32 Rupees will be saved. There is a junior Scholarship of 8 Rupees per month allotted to the English Department. If History and other branches alluded to before be added to the Senior Scholarship Examination, there will be no use of alloting a separate scholarship for the English Department and the 8 Rs. thus saved together with the 32 Rs. saved by dispensing with the services of the two writers raises the amount to Rs. 40 per month. So only 10 Rs. will be required to be paid from the appropriated funds.
25. When I joined the Institution at the end of 1850 the views which I enterained respecting the course of studies to be adopted in the Sanscrit College I submitted to the Council of Education in report on the Institution. Since that time experience has made me modify my views on some few points. This will explain why these notes disagree in a few particulars explain why these notes disagree in a few particulars with my report.

Dhaka University Institutional Repository

26. It appears to me that unless the Sanscrit College remodelled according to the principles now stated, there exists no prospect of material improvement of fully carrying out the objects of the Institution.

Iswar Chandra Sarma

12th April, 1852

[সূত্র : Council of Education : *Copies of Correspondence between the Council of Education and the Principal of the Sanskrit College,* Benares, 1853. (Education Dept. Records, Govt. of West Bengal). উদ্ধৃত : বিনয় ঘোষ, ২০১১। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ. ৫১৬-৫২০]

পরিশিষ্ট-৫

সংস্কৃত কলেজ সংস্কার প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা সম্পর্কে ডক্টর জেমস আর ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট :

From

James R. Ballantyne,

Principal of the Benares College.

To

The Secretary of the Council of Education,

Calcutta.

Sir,

I have the honour to forward for submission to the Council of Education, the following observations suggested by the visit which

I have paid to the Calcutta Sanscrit College, by invitation of the Council, and under the sanction of the Government of the North West Provinces.

2. From my personal intercourse with the accomplished Principal, Pundit Eswar Chender Vidyasagur, I have derived the gratification which I was led to anticipate both by his reputation and by his report on the College, on which the Council some time ago, did me the honour to request my opinion.

3. With the arrangement of the classes in the Sanscrit College, and with the apparent zeal both of teachers and pupils, I have been much pleased. The course of studies (if the appliances of the institution suffice for its being completely carried out) is very full, especially in the English division of the course. On some points of detail in regard to the selection of class books I may have occasion to offer remarks in the sequel. Leaving out of consideration here various topics on which I shall hope to have opportunities of consulting with Pundit Iswar Chender by letter, I address myself to the question which I conceive the Council to have proposed to me, Vizt. is there anything in the working of the Calcutta Sanscrit College, of of the Benares Sanscrit College, which might be advantageously adopted by the one from the other? To reply briefly, I think there is, in both although in consequence of the difference of local circumstances, the two institutions may still judiciously be left to differ in several respects. The bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom, and uniformity is dearly purchased when purchased by the sacrifice of more serious interests.

Dhaka University Institutional Repository

4. A noticeable source of distinction between the two Institutions is the fact that the Benares Sanscrit College contains no Bengalis, while the Calcutta College contains nothing else. To prevent misconception here a misconception which has been sometimes turned to mischievous accounts it may be observed that it is the Sanscrit College of Benares, that is spoken of not the English School associated with it under the same roof. The English school is indeed mainly recruited by Bengalis, but the application of a Bengali for admission into the Sanscrit College of Benares is a thing scarcely known. The Bengalis who are students of Sanscrit College, participating in the general desire for the acquisition of English, which they see in those around them may advantageously be introduced to the study of English at that point, in the course which Pundit Eswar Chunder has fixed upon. It does not follow that the same arrangement would work well at Benares. To supply instruction to him who craves it and to force instruction on him who does not seek it, are very different things. At the same time I quite approve of its being compulsory, as it is now in the Calcutta Sanscrit College, to begin English at the stated date, whether the pupil feel inclined to it or not, this arrangement being rendered indispensible by the system of class teaching, the introduction of which, into the Calcutta Sanscrit College has been effected by its present Principal. On the advantage of the class system, in enabling the same teacher to take charge of a very much greater number of pupils, it is unnecessary to dwell. Of the difficulties in the way of adopting the system. to the same extent, at Benares, this is not the occasion to speak. It may suffice here to remark that the Bengali boys are in general more plaint (?) than those of the Upper Provinces, and that Calcutta is so far inoculated with Anglican feeling, consciously or unconsciously, that an argument from Calcutta to the Upper Provinces is very apt to mislead. This holds also conversely and therefore I would offer any suggestion, for the limitation of either College by the other, under this express proviso, that regard be had to the different circumstances of the two places.–

5. Holding, then generally, that the Sanscrit course, in the Calcutta Sanscrit College, is a good one and also with a competent staff of teachers the English course, I yet desiderate sufficient provision for obviating the danger that the two courses may end in persuading the learner that “truth is double”. This danger is no chimerical one. To take an example, I an acquainted with Brahmins who, being well versed in Sanscrit Literature and also familiar with English, are aware that the European theory of Logic is correct, and also the Hindoo theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other. If this be the case with the very best of those who have studied both Sanscrit and English independently, is it not likely that the case will be different with the general run of pupils similarly trained. One reason why this is to be regretted, is that men so educated cannot satisfactorily communicate to their educated fellow countrymen who are unacquainted with English much of that valuable knowledge which they themselves have gained through the English. They cannot show that our English sciences are really developments and expansions of truths the germs of which the Sanscrit

systems contain, and therefore, to the mind of their hearers those valued germs appear to be ignored by or opposed to, English Science, when they might easily be shown to be involved in it. It is unnecessary to dwell longer upon this consideration, because the very constitution of the present Sanscrit College, with its English course and its Sanscrit course implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe, and to interpret between the two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance & conciliating acceptance, for the advancing science of Europe by showing that European Science recognises all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation.

6. With the view of determining what points in the Hindu system corresponded with points in European science, some years ago I took up the system called the Nyaya, and (in a work now partly printed in Sanscrit and English, under the title of "Synopsis of Sciences" I showed the points, in that comprehensive system, from which our various sciences branch out–some portions of this work I have read and discussed with Pundit Iswar Chunder, in company with one of my co-adjutors, Pundit Vethala Sastri of the Benares College. Pundit Iswar Chunder promises to introduce it to the Notice of his classes, and to communicate to me by letter any doubts of difficulties that may arise in the course of the study, so that the crudenesses incidental to a first attempt of such a kind may be gradually eliminated in due time. The next volume will commence with the theory of Inductive Investigation. In dealing with this important branch I hope to enjoy the advantage of Iswar Chunder's co-operation. I observe that he places in his list mill's great work on the subject. –As introductory to the perusal of that work I have prepared an abstract of it, in which I have traced, to some extent, the correspondence between its technical terminology and that of the Nyaya system in its treatment of the same topics. This abstract (printed by order of Govt. N.W.P.) being from its price & ca. more suitable for a class-book than the entire work, I propose its adoption into the course. At the annual examinations, I should be glad to supply questions, on this and other works here suggested, the replies to which might not only furnish evidence as to the progress of the pupils, but might be so contrived as to lead to a still more complete determination of the way in which mind of the native literate might be best conciliated to Baconian speculations.–

7. Besides the Nyaya system, there are two other systems taught in the college, Vizt. the *Sankhya* and the *Vedanta,* a text book of each of the three has been printed, with English Version and Notes, for the use of the Benares College. – This might with equal advantage be read in the Sanscrit College here also lead to a more complete determination of the precise relation between the philosophical nomenclature of India and of Europe. As there is much in the two systems last named that finds its counterpart in the speculations of Bishop Berkeley, I have reprinted Berkeley's "Inquiry", with a commentary indicative of these correspondences ; I should like that the acuteness of the Calcutta Sanscrit College should be brought to bear upon this exposition also. Where speculation, in countries

Dhaka University Institutional Repository

so widely separated as India and Eurepe, has arrived at similar or indentical conclusions, the conviction of the fact should naturally tend to beget mutual respect ; and mutual respect must naturally tend to facilitate the reception, by the less advanced nation, of the science and philosophy of the more advanced one. –

8. In offering these remarks and suggestions, I have had in view almost exclusively the desirableness of bridging the chasm between the Sanscrit and the English–between the learning of India and the Science of England ; because the endeavour to bridge the chasm is what peculiarizes the measures introduced, within the last few years, into the Benares College, and it was this peculiarity (if I no mistake not) that attracted the attention of the Council–Pundit Iswar Chunder is perfectly competent to work the same system, and to aid me in improving it. As the Sanscrit College at presents stands, there is a good Sanscrit course, and a good English course, but the pupil is left to determine for himself whether the Pinciples inculcated in these correspond to one another, or altogether conflict, or correspond partly and if so how far. The pupil, left to determine this for himself does not, as we have seen, determine it satisfactorily at all and therefore not in the way of substitution for any part of the established course, but as an additional feature necessary to the completion of the design, I have suggested the employment of the treatises abovementioned. –

9. If the general principles of this report obtain the approval of the Council as I have reason to believe they have the concurrence of the intelligent Iswar Chunder. I hsall co-operative with him most gladly in the endeavour to complete the arrangements for such a course of Anglo-Sanscrit Education as shall raise up successive bands of men qualified thoroughly to interpret the mind of Europe to that of India ; for this is indeed the great end of such an institutions as we may hope for in the Sanscrit College.–

I Have & ca.

|Sd.| James R. Ballantyne

Principal of the Govt. College Benares.

|True Copy.|

Sd.|-F. Mouat

Secry. Council of Edut.

[সূত্র : বিনয় ঘোষ, ২০১১। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ. ৫২০-৫২৫]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

শিক্ষা পরিষদের সচিব এফ. আই. ময়েটের কাছে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্রের পূর্ণপাঠ :

From

The Principal of the Sanscrit Collge,

To

F. I. Mouat Esqr., M.D.,

Secry. to the Council of Educn.

Dated Fort William 7 Sepr. 1853.

Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter No. 1494 dated 29th Ultimo enclosing Report of this Institution from Dr. Ballantyne, Principal of the Government College, Benares and requesting me to report upon the same.—

2. In reply I beg leave to state that I am very happy to observe that all the measures lately introduced into this Institution have met with the entire approbation of a man of Dr. Ballantyne's talents and abilities.–

3. With regard do the adoption of class Books recommended by Dr. Ballantyne I regret to say I cannot agree with him on all points. He appears to recommend the adoption of his Abstract of Mill's Logic in substitution of the original. Under the present state of things the study of Mill's work in the Sanscrit College is, I am of opinion, indispensable. Dr. Ballantyne's principal reason for recommending the abstract seems to be the high price of Mill's work. Our students are now in the habit of purchasing standard works at high prices, so we need not to be deterred from the adoption of this great work ; on that consideration Dr. Ballantyne's abstract might be read, to quote his own words, "as introductory to the perusal of that work". But the great author himself, in his preface, strongly recommends Arch-Bishop Whatley's treatise on Logic as the best introduction to his work. I therefore leave the matter to the decision of the Council. Dr. Ballantyne also recommends to adopt as class Books three text books of each of the three systems of Philosophy, —Vedanta, Nyaya, and Sankhya, printed with the English Versions and notes. Of these the "Vedantasara". text book on Vedanta, is already a class book here and its version in English might be read with advantage. The two other text books recommended by him, the "Tarkasangraha", the text book on Nyaya, and the "Sattwasamasa", that on the Sankhya, are very poor treatises in our Curriculum. With regard to Bishop Berkeley's Inquiry I beg leave to remark

Dhaka University Institutional Repository

that the introduction of it as a class book would beget more mischief than advantage. for certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanscrit College. That the Vedanta (sio!) the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute. These systems false as they are, command unbounded reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanscrit course, we should oppose them by sound Philosophy in the English course to counteract their influence. Bishop Berkeley's Inquiry, which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of Philosophy, will not serve that purpose. On the contrary, when, by the persual of that book, the Hindu Students of Sanscrit will find that the theories advanced by the Sankhya and Vedanta system are corroborated by a Philosopher of Europe, their reverence for these two systems may increase instead of being diminished. Under these circumstances I regret I cannot agree with Dr. Ballantyne in recommending the adoption of Bishop Berkeley's work as a class-book. –

4. I also beg leave to state that I cannot quite agree with Dr. Ballantyne when he admits that both the Sanscrit & English Courses in the Calcutta Sanscrit College are good and yet desiderates sufficient provision for obviating the danger that the two courses may end in persuading the learner that "truth is double". "This danger", says Dr. Ballantyne "is no chimerical one". "To take an example" he continues "I an acquainted with Brahmins who being well versed in Sanscrit Literature and also familiar with English, are aware that the European theory of Logic is correct, and also the Hindu Theory, while at the same time they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the others". I believe, the danger that Dr. Ballantyne apprehends is not so inevitable in the case of an individual who has intelligently studied both English and Sanscrit sciences and literatures. Truth is truth if properly perceived. To believe that "truth is double" is but the effect of an imperfect perception of truth itself, the effect which I am sure to see removed by the improved courses of studies we have adopted at this Institution. It must be considered as a singular. circumstance if an intelligent student cannot perceive identity of truths where there is real identity. Suppose students read Logic or any other department of science or philosophy both in Sanscrit and English. If they be found to assert, "that the European Theory of Logic is correct and also the Hindu Theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other", the hearer is naturally led to conclude that either they could not comprehend the subject with sufficient clearness or that their familiarity with the language, in which they are found unable to express themselves, is not sufficient. It must be confessed however that there are many passages in Hindu Philosophy which cannot be rendered into English with ease and sufficient intelligibility only because there is nothing substantial in them.

Dhaka University Institutional Repository

5. I further beg to state that I regret I cannot but differ a little from Dr. Ballantyne when he observes "that the very constitution of the present Sanscrit College with its English course and its Sanscrit course implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe and to interpret between the two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance, and conciliating acceptance for the advancing science of Europe by shewing that European Science recognizes all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation." It is not possible in all cases I fear that we shall be able to shew real agreement between European Science and Hindu Shastras. –Even if we take it for granted that we shall be able to point out agreement between the two, it appears to me to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing science of Europe. They are a body of men whose longstanding prejudices are unshakeable. Any idea when brought to their notice either in the form of a new truth or in the form of the expansion of truths the germs of which their Shastras contain they will not accept. It is but natural they would obstinately adhere to their old prejudices. To characterize them as a class I can do no better than quote the words of Omar. When Amru, the Arab General, the Conquerer of Alexandria wrote to Omar about the disposal of the Alexandrian Library, the Caliph replied, "The contents of those books are in conformity with the Koran or they are not. If they are, the Koran is sufficient without them ; if they are not, they are pernicious. Let them therefore be destroyed." The bigotry of the learned of India, I am ashamed to state is not in the least inferior to that of the Arab. They believe that their Shastras have all emanated from Omniscient Rishis and therefore, they cannot but be infallible. When in the way of discussion or in the course of conversion any new truth advanced by European Science is presented before them, they laugh and redicule. –Lately a feeling is manifesting among the learned of this part of India, specially in Calcutta and ist neighbourhood, that when they hear of a Scientific truth, the germs of which may be traced out in their Shastras, instead of shewing any regard for that truth, they triumph and the superstitious regard for their own Shastras is redoubled. From these considerations, I regret to say that I cannot persuade myself to belive that there is any hope of reconciling the learned of India to the reception of new scientific truths. Dr. Ballantyne's views may be successfully carried out in the North West Provinces where his experience has made him arrive at his conclusions with regard to the learned of India. –

6. But in Bengal the case is very different. His remarks that "regard be had to the different circumstances of the two places" and that "the bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom" are very judicious. The local circumstances of this part of India compel us to pursue a different course for the dissemination of sound knowledge. I have with care and attention observed the state of things here, and my impression is, that we should not at all interfere with the learned of the country. We do not require to get them reconciled because we do not require their assistance in any shape. We need not fear the opposition of a body declining in their reputation. Their voice is

Dhaka University Institutional Repository

gradually becoming more and more feeble. There is little chance of their regaining their former ascedancy. To whatever part of Bengal is the influence of education extending, there the learned of the country are losing their ground. The natives of Bengal appear to be very eager to receive the benefit of education. The establishment of Colleges and Schools in different parts of the country has taught us what we can do, without attempting to reconcile the learned of the Country. What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular schools, let us prepare a series of Vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object object is accomplished. The qualification of these teachers should of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. To raise up such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of our Sanscrit College should be directed. That the students of our Sanscrit College, when they shall have finished their College course will prove themselves men of this stamp we have every reason to hope. Nor is this hope an illusive one. That the students of the Sanscrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt. If the contemplated new organization of the English department be sanctioned there is every probability of their being able to attain considerable proficiency in the English language and Literature and thereby acquire a considerable amount of useful information. It is very gratifying to observe that they have lately began to think in such a way as to promise that hereafter every qualified student will be found free from all the prejudices of his countrymen. As a specimen of what may be expected from the Sanscrit College here, I beg leave to enclose here-in English translation of a Bengali Essay of the past Session by a senior student of this Institution who has still about three years to fininsh his collegiate course and has yet made but little progress in the English language and literature.–

7th. In conclusion I beg most respectfully to state that if I may be so fortunate as to be permitted to carry out the system introduced, I can assure the Council with great confidence that the Sanscrit College will become a seat of pure and profound Sanscrit learning and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to dissemiate that literature amongst the masses of theri fellow countrymen.

8th. The Report of Dr. Ballantyne in original which accompanied your communication is returned herewith.–

[Signed] Eshwar Chunder Sharma

Principal, Sanscrit College.

[সূত্র : বিনয় ঘোষ, ২০১১। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ. ৫২৫-৫৩০]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

শিক্ষা সংসদের রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসারের মূলপাঠ ছিল নিম্নরূপ :

Extract form the *Proceedings of the Council of Education*

dated 14th September 1853.

No. XXI.

Read letter from Dr. Ballantyne submitting observation on the Sanscrit College of Calcutta suggested by his visit to the institution at the invitation of the Council and under the sanction of the Government, North West Provinces.–

Read letter from Pundit Iswar Chunder Vidyasagar Principal of the Sanscrit College, No. 901 dated 7th September submitting his report on the above.–

Ordered. That the Council are gratified to find that Dr. Ballantyne reports generally so favorably on the present course of instruction and state of progress in the Sanscrit College, and that the Principal of the College be informed that he will be expected by the Council to continue that course, the success of which must however obviously depend on the competency of the Teachers employed to give instruction in the most advanced works of Mental philosophy by English as well as by Sanscrit authors ; that for the attainment of such success, the Council relies mainly on the great zeal and ability of the Principal himself and that they would at the same time desire the Principal freely to avail himself of the Abstracts and Treatises compiled by Dr. Ballantyne the use of which must be in the highest degree valuable in explanation and illustration of the subjects of his own Lectures and those of the Instructors under him ; all students of these subjects would indeed in the opinion of the Council derive essential and form a familiarity with Dr. Ballantyne's works. The Principal will, also, be in frequent communication with Dr. Ballantyne on the progress of his classes, and the Council would wish to see a free interchange of suggestions between the Heads of the two important Institutions at Benares and in Calcutta with a view to the continuing improvement of their several courses of instruction and to the establishment as far as possible of a common terminology in the rendering from English into Sanscrit or vice versa of the original expressions, in use in each language respectively, in the exposition or discussion of Philosophical subjects. –

No. 1437

Copy forwarded to the Principal, Sanscrit College for information. –

The 22nd Sep. 1853

By order

Sd|- F. Mouat
Secry. Co. of Ed.

[সূত্র : বিনয় ঘোষ, ২০১১। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ. ৫৩০-৫৩১]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

শিক্ষা সংসদের সচিব এফ. জে. ময়েটের কাছে লেখা বিদ্যাসাগরের চিঠির মূলপাঠ :

My dear sir,

After the most attentive consideration of the orders of the Council in reference to Dr. Ballantyne's report on the Sanscrit College I feel compelled to inform you that those orders if carried out in their integrity will involve a degree of interference with the scheme of study lately adopted by me with the sanction of the Council that will not only make my position in the College somewhat unpleasant but will tend I am convinced to impair the usefulness of the Institution itself.–

In the hurry and bustle of closing the College and of preparing to go home, I am unable to write officially on the subject. But before I leave Calcutta I am anxious to state to you briefly some of the more important objections to the carrying out of Dr. Ballantyne's plan which have occurred to me.

For the present at least I am unwillingly (sic) to mix up with the discussion of an important matter any question of a personal character in being forced to adopt a plan of study which I cannot approve of or in being obliged to communicate to a fellow Principal in the same position in the service with myself on the progress of my classes, conditions which I suspect few educated Englishmen will be found to submit to. Waiving such personal considerations I will come at once to the real question at issue. –

Dr. Ballantyne's suggestions seem to me to be based upon the assertion that without their adoption the danger of the Anglo-Sanscrit scholar being a follower of "double truth" cannot be avoided. I will not pretend to question the Doctor's experience among his learned friends at Benares. But of this I am certain that not a single instance can be pointed out in Bengal of any sensible man who has studied English as well as Sanscrit being persuaded that "truth is double".

Leave me to teach Sanscrit for the leading purpose of thoroughly mastering the Vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of English and you may rest assured that before a few years are over I shall be enabled if supported and encouraged by the Council to furnish you with a body of young men who will be better qualified by their writings and teaching to disseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of the Educated clever of any of your Colleges whether English or oriental. to enable me to carry out this great, this darling object of my wishes I *must* (excuse the strong word) to a considerable extent be left unfettered, so far as I can approve of Dr. Ballantyne's abstracts and treatises such for instance as his excellent Edition of the Novum Organan in English, I will avail myself of them most readily and cheerfully. But if compelled to adopt all his

Dhaka University Institutional Repository

compilations without any reference to my own humble judgement as to their utility and value or to their adaption to the peculiar wants of the Institutions over which I have the honor to preside, my occupation is gone–such a system would break in upon and interrupt my own plan of instruction and in spite of my sense of duty as a servant of the Council the responsibility which I now keenly feel will be assuredly weakened if not destroyed.

I hope these hints somewhat ramblingly and hastily thrown out, will receive the kind and indulgent consideration of the Council so as to induce them to modify their Resolution of the 14th Ultimo so far as not to make the course of study in the Sanscrit College a compulsory one. –

If required I shall be happy to send in an official and consequently a more formal letter on the subject after the termination of the holidays. –

I remain,

My dear Sir

Yours Very truly

Sd|- Eswar Chunder Surma

the 5th Octr., 1853

[সূত্র : বিনয় ঘোষ, ২০১১। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, পৃ. ৫৩১-৫৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯

কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহের তথ্য বিদ্যাসাগর *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর উল্লেখিত তথ্য নিম্নরূপ :

নাম	বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
ভগবান্ চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালী
মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	ঐ
তিতুরাম গাঙ্গুলি	৫৫	৭০	ঐ
রামময় মুখোপাধ্যায়	৫২	৫০	তাজপুর
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০	৬০	ভুঁইপাড়া
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৫০	৬০	পাখুড়া
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০	৫২	ক্ষীরপাই
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪	৫২	আঁকড়ি-শ্রীরামপুর
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১	৪৭	চিত্রশালী
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪০	৪৫	তীর্ণা
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	কোন্নগর
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০	৫০	চুঁচুড়া
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	৪০	৫৫	দণ্ডিপুর
নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬	৪৪	গৌরহাটী
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০	৪০	খামারগাছী
শশিশেখর মুখোপাধ্যায়	৩০	৬০	ঐ
তারাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩০	৩৫	বরিজহাটী
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮	৪০	গুড়প

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীচরণ মুখোপাধ্যায়	২৭	৪০	সাঙ্গাই
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫	৪০	খামারগাছী
ভবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৩	৪০	জাঁইপাড়া
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৫	খামারগাছী
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২২	৩৪	কুচুণ্ডিয়া
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১	৩৫	কাপসীট
পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়	২০	৪০	ভৈটে
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	২০	৩৭	মাহেশ
কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২০	৪৫	বসন্তপুর
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২০	৪০	রঞ্জিতবাটী
রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	২০	৫০	গরলগাছা
অন্নদাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০	৪৫	ভৈটে
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	১৯	২৮	বসন্তপুর
রামরত্ন মুখোপাধ্যায়	১৭	৪৮	জয়রামপুর
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭	৩২	মাহেশ
দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়	১৬	২০	চিত্রশালী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৬	৩৫	মহেশ্বরপুর
অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	৩০	মালিপাড়া
অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	গোয়াড়া
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	সোঁতিয়া
জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৪০	খামারগাছী
অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৬	ভুঁইপাড়া
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৫	৩২	মোগলপুর

Dhaka University Institutional Repository

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৪	পাতা
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২২	ঐ
দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫	২৫	বেলেসিকরে
ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	১৫	২০	ভৈটে
কালীপ্রসাদ গাঙ্গুলি	১৫	৪৫	পশপুর
সূর্যকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৫	৩৫	ভৈটে
রামকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	৩২	ক্ষীরপাই
কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৪	৪৫	মধুখণ্ড
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪	২১	সিয়াখালা
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৩	৫০	বৈঁচী
হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩	৪০	গরলগাছা
কার্ত্তিকেয় মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	দেওড়া
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	তাঁতিসাল
মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩০	মালিপাড়া
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৪০	ঐ
ব্রজরাম চট্টোপাধ্যায়	১২	২৫	চন্দ্রকোনা
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	৩২	কৃষ্ণনগর
রামতারক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	২৮	জয়রামপুর
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	ভুঁইপাড়া
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	১২	৩০	বলাগড়
তিতুরাম মুখোপাধ্যায়	১২	৪০	নতিবপুর
প্রসন্নকুমার গাঙ্গুলি	১২	৩৬	গজা
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	১১	৬৫	ভঞ্জপুর

Dhaka University Institutional Repository

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১	১৮	তাঁতিসাল
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	১১	৩০	গরলগাছা
লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১০	২৫	বিদ্যাবতীপুর
শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	বিদ্যাবতীপুর
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০	৩০	ভৈটে
রামকমল মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	নিত্যানন্দপুর
কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৮	বৈঁচী
দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১০	২৫	ঐ
মতিলাল মুখোপাধ্যায়	১০	৪৫	ঐ
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	ধসা
দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৫০	শ্যামবাটী
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৪৫	আনুড়
প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	১০	৩৫	বেঙ্গাই
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	৩০	বৈতল
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০	৪০	বসন্তপুর
কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০	৪০	সিয়াখালা
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৯	৩৬	যদুপুর
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯	৩০	নপাড়া
সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	বৈঁচী
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	ঐ
চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩২	ঐ
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৪০	মোল্লাই
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	২০	দেওড়া

Dhaka University Institutional Repository

দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৩৫	গুড়প
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৮	৪০	মালিপাড়া
যাদবচন্দ্র গাঙ্গুলি	৮	৩৫	বহরকুলী
মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	২৫	সিকরে
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	৮	৩২	বরিজহাটী
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	পতুল
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	৮	৪৫	জয়রামপুর
হরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮	৬০	শ্যামবাটী
রামচাঁদ চট্টোপাধ্যায়	৮	৪০	ভঞ্জপুর
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭	৩২	ঐ
দিগম্বর মুখোপাধ্যায়	৭	৩৬	রত্নপুর
কুড়ারাম মুখোপাধ্যায়	৭	৩২	নতিবপুর
দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৬২	মথুরা
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৪	বসন্তপুর
শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭	৩৫	ভুরসুবা
রামসুন্দর মুখোপাধ্যায়	৭	৫০	আঁটপুর
বেণীমাধব গাঙ্গুলি	৭	৫০	চিত্রশালী
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	মোগলপুর
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৬	২২	চন্দ্রকোনা
যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	৬	৩০	বাখরচক
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬	৩০	বসন্তপুর
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৬	৪০	রঞ্জিতবাটী
গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	গৌরহাটী

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	পশপুর
কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০	সুলতানপুর
মনসারাম চট্টোপাধ্যায়	৫	৪৫	তারকেশ্বর
গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	২২	আমড়াপাট
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	বালিগোড়
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫	৩৫	তারকেশ্বর
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	তালাই
ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫	২৬	টেকরা
হরশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০	মাজু
নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩২	সন্ধিপুর
কালীদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩০	বালিডাঙ্গা
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩৬	গৌরাঙ্গপুর
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৩০	কৃষ্ণনগর
সীতারাম মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	চন্দ্রকোনা
রামধন মুখোপাধ্যায়	৫	৪০	চন্দ্রকোনা
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	৪৩	বরদা
ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়	৫	৩৫	নারীট
সূর্যকুমার মুখোপাধ্যায়	৫	২৬	বরদা
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	১৯	নপাড়া
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫	১৮	দণ্ডিপুর

অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর ও যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কুলীনদিগের বিবাহসংখ্যা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইল। সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে, আরও অনেক বহুবিবাহকারীর নাম পাওয়া যাইতে পারে। ৪।৩।২ বিবাহ করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি অনেক, এ স্থলে তাঁহাদের নাম নির্দেশ করা গেল না। হুগলী জিলাতে বহুবিবাহকারী কুলীনের যত সংখ্যা,

Dhaka University Institutional Repository

বর্ধমান, নবদ্বীপ, যশর, বরিসাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলাতে তদপেক্ষা ন্যূন নহে ; বরং কোনও কোনও জিলায় তাদৃশ কুলীনের সংখ্যা অধিক। কুলীনদিগের বিবাহের যে সংখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহা ন্যুনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিকসংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না। সুতরাং, অন্যের তাহা অবধারিত জানিতে পারা সহজ নহে। বিবাহের যে সকল সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যদি কোনও স্থলে প্রকৃত সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক হয়, তাহাতে কোনও কথা নাই ; যদি ন্যূন হয়, তাহা হইলে কুলীনপক্ষপাতী আপত্তিকারী মহাশয়েরা অনায়াসে বলিবেন, আমি ইচ্ছাপূর্বক সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া নির্দেশ করিয়াছি। কিন্তু, আমি সেরূপ করি নাই ; অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই নির্দেশ করিয়াছি ; জ্ঞানপূর্বক কোনও বৈলক্ষণ্য করি নাই।

প্রসিদ্ধ জনাই গ্রাম কলিকাতার ৫/৬ ক্রোশ মাত্র অন্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের যে সকল ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইতেছে।

নাম	বিবাহ	বয়স
মহানন্দ মুখোপাধ্যায়	১০	৩৫
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০	২৯
আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলি	৭	৬৫
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	৫	৩২
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	৫	৫০
চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	৫	৬৪
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	১৮
দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	৪	২৬
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	৪৫
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৪	২৭
নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	৫০
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	২৯
ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
কালিদাস গাঙ্গুলি	৩	২৬

Dhaka University Institutional Repository

দীননাথ গাঙ্গুলি	৩	১৯
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩	৪০
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৩	৪০
কালীপদ মুখোপাধ্যায়	৩	৫০
মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩	৩৫
নবকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৪৩
নীলমণি গাঙ্গুলি	৩	৪৮
কালীকুমার মুখোপাধ্যায়	৩	৫৫
চন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি	৩	৫০
শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩	৪৩
হারানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩	৬০
প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়	২	৪০
সূর্যকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৪০
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৫
চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	২	৬০
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৫
রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৫
হরিনাথ মুখোপাধ্যায়	২	৬২
রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫৭
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়	২	৫০

Dhaka University Institutional Repository

রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৫০
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
কালীকুমার গাঙ্গুলি	২	২৫
আশুতোষ গাঙ্গুলি	২	২০
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩১
নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩৩
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
ভগবান্‌চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	৩২
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	২	৩০
কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২	৩২
হরিহর গাঙ্গুলি	২	৩৫
কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়	২	২৮
প্যারীমোহন গাঙ্গুলি	২	৩৩
কালিদাস মুখোপাধ্যায়	২	৩৫
চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	২	২৮
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২	২৪
নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৮
দীননাথ মুখোপাধ্যায়	২	৩০
যদুনাথ গাঙ্গুলি	২	২৭
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়	২	২৭
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২৭

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্রকুমার গাঙ্গুলি	২	২১
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২	২১
প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২২
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২	২০

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিবাহবিষয়ে কুলীনদিগের অত্যাচারের নিবৃত্তি হইয়াছে কি না।”

[সূত্র : *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*-২য় খণ্ড (সম্পাদক : তীর্থপতি দত্ত), ১৯৯৪। পৃ. ৮৭৩-৮৮০]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১০

বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভের গবেষণা পদ্ধতি নিচে সূত্রাকারে এবং রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হলো :

গবেষণা পদ্ধতি

↓

সমাজবিজ্ঞান গবেষণার প্রধান দুটি তাত্ত্বিক কাঠামো

↓

Qualitative Research (গুণগত বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা) — Interpretative Perspective

↓

Subjective
(Verstehen)
Deeper understanding

Quantative Research (সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা) — Positivist Perspective

↓

Objective
(Value neutrality)

Qualitative Research
গুণগত বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা

↓

১. তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতিসমূহ :

ক. ঐতিহাসিক শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গি (Historical Education Sociology)
খ. ঐতিহাসিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Historical Documents Analysis Method)

২. তথ্যের উৎসমূহ : –

২.১ প্রাথমিক উৎস (Primary source)

২.২ মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source)

ক. বিদ্যাসাগর লিখিত গ্রন্থ, পুস্তিকা, চিঠিপত্র ইত্যাদি ;

খ. সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন : – (বিষয় বিশেষজ্ঞ)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিশেষজ্ঞ | নারীশিক্ষা বিশেষজ্ঞ | জেন্ডার বিশেষজ্ঞ | শিক্ষা বিশেষজ্ঞ

ক. বাংলায় নারীর সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণাগ্রন্থ, স্মৃতিকথা

→ বদরুদ্দীন উমর, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, রোমিলা থাপার, Humaun Kabir, Usha Chakraborty, David Kopf., A. S. Alterkar, William Adam, Gulam Murshid প্রমূখ

খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ

→ বদরুদ্দীন উমর, গোলাম মুরশিদ, বিনয় ঘোষ, অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, সফিউদ্দিন আহমদ, Ashok Sen, Subol Chandra Mitra, Ashim Mukhopadhyay প্রমুখ

গ. নারীবাদ ও জেন্ডারচেতনা বিষয়ে লেখা গ্রন্থ

→ আয়েশা খানম, মাহমুদা ইসলাম, সেলিনা হোসেন, কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, Clara Zetkin, Estelleb. Freedman, John Stuart Mill, Kira Cochrane, Mary Wollestonecraft, Shulamith Firestone, Semone De Beauvoir, Suzanne Marilley, Ti-Grace. Atkinson প্রমূখ

ঘ. নারীশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ

→ আবদুল লতিফ, বিনয়ভূষণ রায়, শরীফা খাতুন, শ্যামলী আকবর, জাহান আরা বেগম, William Adam, James Long, Sunanda Ghosh, Humaun Kabir প্রমূখ

৩. তথ্য বিশ্লেষণ :

৩.১ Content Analysis — বই/প্রবন্ধ ইত্যাদির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা

৩.২ Interpretative Approach — সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন (প্রাথমিক উৎসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ)

Conceptual Frame Work (ধারণাগত কাঠামো)

Understanding Bidya Sagar's thoughts and social contribution
(বিদ্যাসাগরের চিন্তা সামাজিক কর্মকাণ্ড অনুধাবন)

গবেষণার বিষয় (Study Subject) → বিদ্যাসাগর ও নারীশিক্ষা (Vidyasagar & Women Education)

বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান (Intellectual Contribution) → দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক চিন্তা (Philosophical and Theoritical Thought)

- দুর্জয় সাহস ও বীরত্ব
- অন্তহীন মানবিক করুণা
- মানবতাবাদী চিন্তা
- বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা
- বিজ্ঞানমনস্কতা
- বাস্তববাদিতা
- ইহজাগতিকতা
- আধুনিকতা
- মানবমুখিনতা
- নারী-পুরুষের সমতা ভাবনা
- জেন্ডারসমতা, নারী-অধিকার, ন্যায্যতা ইত্যাদি

নারীশিক্ষা ও সমাজসংস্কারমূলক অবদান (Women Education & Social reforming contribution) → প্রায়োগিক চিন্তা (প্রাক্সিস) Applied Thought (Praxis)

- বিধবা বিবাহ প্রচলন;
- বহুবিবাহ রোধ;
- কৌলীন্য প্রথাবিরোধী আইন;
- বাল্যবিবাহ রোধ;
- নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান;
- নারী-শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা;
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শিক্ষা-প্রশাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ;
- শাস্ত্রজ্ঞ রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে শাস্ত্রের মাধ্যমে যুক্তি খণ্ডন;
- পাঠ্যপুস্তক রচনা;

↓

নারীর সার্বিক মুক্তি

↓

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মোদ্যোগ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১১

নির্বাচিত সাক্ষাৎকার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য এবং জেন্ডারচেতনার আলোকে তার মূল্যায়ন ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আমরা বাংলাদেশ ও ভারতের এগারো জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ/সমাজচিন্তক/সাহিত্যিক/নারী-সংগঠকের কাছে কয়েকটি নির্বাচিত প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। এসব সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও অভিমত বর্তমান গবেষণায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখপূর্বক ব্যবহৃত হয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের কাছে নির্বাচিত যে পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ :

১. নারীর উন্নতি ও সার্বিক মুক্তির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে-সব প্রয়াস গ্রহণ করেছেন, সে-সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী ?

২. নারীর সামূহিক মুক্তির জন্য বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, না কি বিবাহপ্রথা সংস্কারের উপর জোর দিয়েছেন ?

৩. বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী কী ?

৪. আধুনিক নারীবাদ ও জেন্ডারচেতনার আলোকে বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন ?

৫. বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার কথা বলেছেন উনিশ শতকে, আজ একুশ শতকে এসে তাঁর নারীশিক্ষা চিন্তা ও কর্মোদ্যোগের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় ?

এইসব প্রশ্ন নিয়ে আমরা যাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি তাঁরা হলেন :

বাংলাদেশ

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-১

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-২

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৩

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৪

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৫

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৬

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৭

Dhaka University Institutional Repository

ভারত

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৮

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৯

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-১০

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-১১

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-১ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৫ই নভেম্বর, ২০১৯)

১. বিদ্যাসাগরের প্রধান পরিচয়—তিনি ছিলেন সমাজসংস্কারক। উনিশ শতকের বাংলাদেশে বহু কীর্তিমান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্য সহজেই ধরা পড়ে। এই স্বাতন্ত্র্যের একটা বড় জায়গা, তিনি বাঙালি নারীর সার্বিক মুক্তির জন্য চিন্তা করেছেন, বিবাহপ্রথা সংস্কারের চেষ্টা করেছেন, নারীশিক্ষার জন্য গ্রহণ করেছেন অনেক উদ্যোগ। তাঁর কালে বাঙালি নারীর মুক্তির জন্য তাঁর মতো কেউ ভাবেননি। এটাই বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম অনুষঙ্গ।

২. বিদ্যাসাগর দুটো বিষয়কে সমন্বিতভাবে দেখেছেন। তিনি একটিকে অপরটির পরিপূরক হিসেবে দেখেছেন বলেই আমার মনে হয়। তবে সন্দেহ নেই, তিনি প্রধানত সমাজসংস্কারের উপর জোর দিয়েছেন, আর তার অনুষঙ্গী হিসেবে ভেবেছেন নারীশিক্ষার কথা। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের এবং পরে বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলনের সূচনা করেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারেও ব্রতী হন।

৩. বাঙালিসমাজে স্ত্রীশিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না। উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের কালে নারীকে গৃহের মধ্যেই অতি সামান্য শিক্ষা দেওয়া হতো। বিদ্যাসাগরই প্রথম নারীদের স্কুলে এসে শিক্ষা লাভে উৎসাহী করে তোলেন, এবং এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেন নানা উদ্যোগ। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে পরবর্তী সাত মাসের মধ্যে বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর ও নদিয়ায় তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরমধ্যে নিজের বীরসিংহ গ্রামেও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসব স্কুলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েরা শিক্ষালাভ করত।

৪. বিদ্যাসাগরের সমকালে নারীবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হয়নি। তবে নারীবাদী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যকে সহজেই মেলানো যায়। বিশেষত তাঁর অনেক ধারণার সঙ্গে একালের উদার নারীবাদীদের চিন্তার মিল আছে। বাংলায় তাঁর হাত ধরেই নারীমুক্তির কথা জোরে-শোরে বিকাশ লাভ করে। বাংলায় নারীমুক্তির ইতিহাসে এটাই বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক অবদান।

Dhaka University Institutional Repository

৫. বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষার কথা আজো প্রাসঙ্গিক। তাঁর অনেক ধারণা একালের জন্যও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। বিশেষত, বাল্যবিবাহের কথা বলা যায়। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সামাজিক ধারণার পরিবর্তন সাধন। সেদিক বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও প্রয়াস বর্তমান কালের জন্যও প্রাসঙ্গিক।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-২ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২০)

১. বিদ্যাসাগরকে আমি একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবেই বিবেচনা করি। সমাজকাঠামো ও সামাজিক মনোভাব বিদ্যাসাগর খুব ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিপাতে তিনি নারীর কল্যাণের জন্য বাঙালি সমাজের বিবাহপ্রথাকে সংস্কারের কথা বলেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নারীশিক্ষার কথাও চিন্তা করেছেন। নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

২. বিদ্যাসাগর প্রধানত সমাজসংস্কারক। সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি হিন্দুসমাজের বিবাহপ্রথা সংস্কারের কথা ভেবেছেন। তিনি বিধবাবিবাহ চালু, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। এই আন্দোলনের সহায়কশক্তি হিসেবেই তিনি নারীশিক্ষার কথা ভেবেছেন এবং সে-ক্ষেত্রে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

৩. বিদ্যাসাগর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর শিক্ষাদানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কেবল গৃহস্থালী কাজের শিক্ষা নয়, বিদ্যাসাগর নারীকে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি নারীকে নারীর সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ করে তুলতে চেয়েছেন, তাকে করে তুলতে চেয়েছেন অধিকারসচেতন।

৪. একালের জেন্ডারচেতনার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অনেক ভাবনাকেই মেলানো যায়। তবে বিদ্যাসাগর যে সচেতনভাবে এক্ষেত্রে এগিয়েছেন, তা বলা ঠিক হবে না। কেননা, তাঁর সময়ে জেন্ডারচেতনা বিকশিতই হয়নি। তবু তাঁর ভাবনার সঙ্গে একালের জেন্ডারচেতনাকে যে মেলানো যায়, এটা তাঁর চিন্তার প্রাগ্রসরতাকেই প্রমাণ করে।

৫. বিদ্যাসাগরের সময় থেকে সমাজের অনেক দিকেই আমরা এগিয়েছি। কিন্তু তাঁর কালের নারীদের সঙ্গে একালের নারীদের দুরবস্থার খুব যে পার্থক্য ঘটেছে, তা বলা যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা এখনো পুরুষতন্ত্রের দাপটের শিকার। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথা বলা চলে। সে-বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের চিন্তাকে একালেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৩ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২রা এপ্রিল, ২০২১)

১. নারীমুক্তির জন্য বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও প্রয়াসকে আমি এককথায় ঐতিহাসিক বলে মনে করি। তিনি যে যুগে বসে নারীশিক্ষার কথা বলেছেন, আমরা এযুগে তা কল্পনাও করতে পারি না। অথচ তিনি একাকী সেদিন এই কাজে নেমেছেন এবং অনেকাংশে সফল হয়েছেন।

২. বিদ্যাসাগর একজন সমাজসংস্কারক। সমাজকে সংশোধন করে তিনি মানুষের কল্যাণ প্রত্যাশা করেছেন—একই সঙ্গে প্রত্যাশা করেছেন নারীর মুক্তি। এজন্য তিনি প্রধানত বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিবাহপ্রথা সংস্কারের কথা ভেবেছেন এবং সে-উদ্দেশ্যে অনেক বই লিখেছেন। তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনা ঐ উদ্দেশ্য থেকেই পরিচালিত হয়েছে।

৩. নারীর মুক্তি, তার সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, তার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, তার সক্ষমতার স্বীকৃতি—এসবই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাবনার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। উপর থেকে দেখা না গেলেও এগুলোই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

৪. আধুনিক নারীবাদ ও জেন্ডারচেতনার আলোকে বিদ্যাসাগরের দিকে তাকালে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়। কত আগে তিনি উদার নারীবাদীদের মতো নারীমুক্তির কথা বলেছেন। আজ পৃথিবীজুড়ে নারীমুক্তির যে-সব প্রয়াস পরিচালিত হচ্ছে, বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসে আমরা তা সুপ্ত অবস্থায় বিরাজমান দেখি। আমার বিবেচনায় তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারীবাদী চিন্তাবিদ।

৫. সমাজের উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষের যৌথ অনুশীলন প্রয়োজন। কেউকে বাদ দিয়ে সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু এই ভাবনা এদেশে এখনো পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করেনি। তবে আমরা বিশ্বাস করি সংস্কৃতির হাজার রকমের জঞ্জাল থেকে বাঙালি নারী একদিন মুক্ত হবে। নারীর বেঁচে থাকা মানবিক ও রুচিশীল হবে। সে-ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর আমাদের সঙ্গে থাকবেন। বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও প্রয়াস এত বছর পরেও তাই আমার কাছে অতি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৪ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১১ই জুলাই, ২০২০)

১. মানবসমাজের একটি অংশ প্রকৃতির নিয়মে নারী। সমাজ বিকাশের ধারায় এক পর্যায়ে এসে সমাজ ও মানবসৃষ্ট প্রথা নিয়মের বেড়াজালে আটকে নারীসমাজ পিছিয়ে পড়লো। পূর্ণ মানবসন্তান হিসেবে জন্ম নিয়েও অর্ধমানব বা মেয়ে-মানুষ হয়ে গেল। বাঙালি সমাজেও এই প্রবণতা দেখা দিয়েছিল ব্যাপকভাবে। উনিশ শতকে বাংলায় এই প্রথার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নারীর উন্নতি ও সার্বিক মুক্তির জন্য

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার ও নারীশিক্ষা বিস্তারে যে-সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তা সময়ের প্রেক্ষাপটে ছিল ঐতিহাসিক প্রয়াস।

২. বিদ্যাসাগর প্রধানত সমাজ সংস্কারের প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজে নারীর সার্বিক দুরবস্থা দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। তাদের উন্নতির প্রয়াস গ্রহণই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান কাজ। তিনি প্রধানত বাঙালি সমাজে চলমান বিবাহপ্রথা সংস্কারের চেষ্টা করেছেন। এ জন্য তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর আন্দোলনের কারণেই ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তন করে। তিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্যও সামাজিক আন্দোলন করেছেন। এই আন্দোলনের সহায়কশক্তি হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন নারীশিক্ষা-বিষয়ক নানা উদ্যোগ।

৩. নারী যে মানুষ, তারও যে আছে পুরুষের মতো অধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা—আমার মতে এটাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। নারীর চেতনায় বিদ্যাসাগর আলো ছড়াতে চেয়েছেন—সঞ্চার করতে চেয়েছেন মানবাধিকার চেতনা—এটাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার উল্লেখযোগ্য দিক।

৪. মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি পদেই তাকে পরাধীনতার শেকল ভেঙে অগ্রসর হতে হয়। নারীও জন্মসূত্রে পূর্ণ মানবসন্তান। কিন্তু মানুষের সমাজেরই তৈরি প্রথা, নিয়ম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আইন, ধর্ম ইত্যাদির নামে তাকে অর্ধমানব বা মেয়ে-মানুষ বানিয়ে ফেলা হয়। তখন নারীকে, নারীর সমর্থনকারী সমাজচিন্তক ও গোষ্ঠীকে সেই প্রথা, নিয়ম, ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এর নাম হয় নারীমুক্তি আন্দোলন বা নারীর পূর্ণ মানব হয়ে ওঠার আন্দোলন। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ও রক্ষার আন্দোলন। নারীবাদ বলি বা জেন্ডারচেতনা বলি—এটাই হচ্ছে তার মূল কথা। এখন বিদ্যাসাগরের দিকে তাকালে আমরা কী দেখতে পাই। আমরা দেখি সেকালে বাঙালি নারী যখন নানা প্রথা ও নিয়মকানুনে পুরুষতন্ত্রের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে, বিদ্যাসাগর তখন সে-জাল থেকে নারীকে মুক্তি দেবার জন্য অনেক প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। যখন সমাজে কেউ জাগেনি, তখন জেগে উঠেছেন বিদ্যাসাগর। আমি তো বিদ্যাসাগরকে বাংলার আদি নারীবাদী সমাজচিন্তক হিসেবেই বিবেচনা করি।

৫. একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের কাজে যুক্ত হয়েছে সিডও সনদ বাস্তবায়ন, বেইজিং, বেইজিং+১০, আজকের বিশ্ব ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া, বিশ্বায়নের ভালোমন্দ, জেন্ডার ইকুয়ালিটির ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভূমিকা, রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবারের দায়িত্বকে তাই আজ নতুন করে নারী আন্দোলনের কাজে দেখতে হবে। সন্দেহ নেই, এই দেখায় আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাঙালি সমাজে নারীমুক্তির পথিকৃৎ হিসেবে পাই। বিদ্যাসাগর,

রোকেয়া, সুফিয়া কামাল প্রমুখের আন্দোলন ও চিন্তা আজকের নারীবাদী চিন্তা ও নারীশিক্ষার জন্য যে-সব প্রয়াস গৃহীত হচ্ছে সেক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৫ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৫ই জুলাই, ২০২১)

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন activist মানুষ। তিনি কেবল চিন্তাই করতেন না, সে-চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যথাযথ কাজও করতেন। নারীর উন্নয়নকে তিনি সমাজ-উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী—তাই উন্নয়নের পথে নারী পিছিয়ে থাকলে সমাজের উন্নয়ন কিছুতেই হতে পারে না। উন্নয়নের পথাযাত্রায় নারীকে যথাযথ শিক্ষা নিয়ে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিদ্যাসাগর এবং সে-লক্ষ্যেই গ্রহণ করেছেন বহুবিধ উদ্যোগ। এসব উদ্যোগের মধ্যে সমাজসংস্কার এবং নারীশিক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

২. একজন সকর্মক বা activist মানুষ হিসেবে বিদ্যাসাগর উভয় ক্ষেত্রেই জোর দিয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন নারীর শিক্ষা ছাড়া সমাজ-উন্নয়ন সম্ভব নয়, আবার সমাজ-উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নারীর শিক্ষালাভ প্রসঙ্গ। একটি ছাড়া অপরটি কিছুতেই সম্ভব নয়।

৩. নারীকে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে, তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার মূল কথা। নারীকে তিনি অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন বটে, কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য শিক্ষার মাধ্যমে তার চেতনায় অধিকারবোধ সৃষ্টি করা।

৪. বিদ্যাসাগরের সময় নারীবাদের সৃষ্টি হয়নি, কিংবা দেখা দেয়নি জেন্ডারতত্ত্ব। তবু তাঁর রচনা এবং কর্মপ্রয়াসে একালের নারীবাদ ও জেন্ডারচেতনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। নারীর মানবাধিকার রক্ষায় একালের নারীবাদীদের মতো বিদ্যাসাগর অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সেসব উদ্যোগ নারীমুক্তির পথে একালের নারী-সংগঠকদের কাছে অনেক শক্তি জুগিয়েছে।

৫. বিদ্যাসাগরের ভাবনা একালেও আছে সমান প্রাসঙ্গিক। সিডও সনদ, বেইজিং+১০, মিলেডিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্রভৃতি ধারণা ও উদ্যোগ নানাভাবে নারীর উন্নয়নের কথা বলে। ২০২১ সালের ৩০শে জুন থেকে ২রা জুলাই পর্যন্ত প্যারিসে জেনারেশন ইকুয়ালিটি এ ধারার সর্বশেষ উদ্যোগ। মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট থেকে আরম্ভ করে জেনারেশন ইকুয়ালিটি লিঙ্গ-সমতার বিষয়টিকে নানাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমাজে এখনো লিঙ্গ-সমতা দৃশ্যমান নয়। বিদ্যাসাগরও মূলত লিঙ্গ-সমতার কথা বলেছেন। তবে সময়ের পশ্চাৎবর্তিতার কারণে তাঁর পক্ষে হয়তো বিষয়টি একালের মতো সরাসরি বলা সম্ভব হয়নি। তবু একালের দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করলেও বিদ্যাসাগরের কাজকে অবশ্যই লিঙ্গ-সমতার স্বপক্ষীয়

কাজ বলেই মনে হবে। যেহেতু সমাজে এখনো নারীর মানবাধিকার প্রত্যাশিত মাত্রায় স্বীকৃত হয়নি, তাই বিদ্যাসাগর এখনো আমাদের কাছে অতি প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় একটি নাম।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৬ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২০শে জুন, ২০২১)

১. বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর নারীমুক্তির জন্য পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছেন। সমাজসংস্কার ও শিক্ষার মাধ্যমে তিনি নারীমুক্তির কথা ভেবেছেন। তিনি যেসব সামাজিক অপপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, বাঙালি সমাজে এখনো তা অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব একালের মানুষের উপর পড়েছে।

২. নারীর মুক্তির জন্য বিদ্যাসাগর দুই ক্ষেত্রেই জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন, সমাজে প্রচলিত বিবাহপ্রথার পরিবর্তন ঘটলে নারীর মুক্তির পথ সুগম হবে। আবার নারীশিক্ষা বিস্তার লাভ করলে এই পথ সহজ হয়ে উঠবে। মোটকথা দুটো প্রয়াসকে আমরা পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করতে পারি এবং বিদ্যাসাগর সে-ভাবেই বিবেচনা করেছেন।

৩. বিদ্যাসাগর সমাজ ও পরিবারে বন্দি নারীদের চেতনায় অধিকারবোধ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর নারীশিক্ষা ভাবনার এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। নারীকে তিনি নারী হিসেবে নয়, পূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। নারীর শিক্ষালাভের বিষয়টা তিনি সেভাবেই কল্পনা করেছেন।

৪. আধুনিক নারীবাদ ও জেন্ডারতত্ত্ব মূলত নারীর সামাজিক মুক্তির কথাই বলে। এক একজন তাত্ত্বিক এক এক ভাবে তাঁদের চিন্তা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ভাবনার মধ্যে অনেক বিরোধ ও বৈপরীত্যও আছে। তবে মূলকথা তাঁদের অন্তিম লক্ষ্য নারীর সামগ্রিক মুক্তি, যা আমরা বিদ্যাসাগরের ভাবনার মধ্যেও লক্ষ করি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াসকে আধুনিক নারীবাদ ও জেন্ডারচেতনার আলোকে ইতিবাচকভাবেই গ্রহণ করতে হবে।

৫. উনিশ শতকের অবরুদ্ধ সমাজ প্রতিবেশে বসে বিদ্যাসাগর নানামাত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে নারীমুক্তির কথা ভেবেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি নারীশিক্ষার জন্যও কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আজ তাঁর কার্যধারার প্রায় দুইশ' বছর পরে আমরা সমাজের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই ? আপনি এখনো সমাজের প্রায় সর্বত্র নারীর প্রতি বৈষম্য দেখতে পাবেন। নারীকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এখনো পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে চলেছে। নারীকে এখনো মানুষ হিসেবে দেখা হয় না, দেখা হয় উপভোগের সামগ্রী আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রে তার শিক্ষাকে এখনো পুরুষের মতো সমান চোখে দেখা হয় না। উন্নয়নের জায়গায় নারীকে এখনো পূর্ণমাত্রায় যোগ্য ভাবা হয় না, অনেক ক্ষেত্রেই তার সক্ষমতাকে খাটো করে দেখা হয়। এখনো বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ অবাধে চলছে। নারীর সার্বিক মুক্তির জন্য এখনো যুদ্ধ

করতে হচ্ছে নারীবাদী সংগঠন এবং প্রগতিশীল দলগুলোকে। সে-প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করলে বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষা চিন্তা এখনো প্রাসঙ্গিক বলেই আমি মনে করি।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৭ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২১শে জুন, ২০২১)

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকে একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে নারীমুক্তির বিষয়ে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তখন এমন কোনো সামাজিক সংগঠন ছিল না, যা তার উদ্যোগকে সহায়তা করতে পারে। বরং বলা যায়, সমাজে তখন ক্রিয়াশীল ছিল বিদ্যাসাগরের চিন্তার বিরোধী সংগঠন। সেদিক বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি-বিষয়ক চিন্তা ও কর্মকে ঐতিহাসিক বলতেই হবে।

২. বিদ্যাসাগর উভয় ক্ষেত্রেই জোর দিয়েছেন। প্রত্যয় দুটিকে তিনি দেখেছিলেন পরিপূরক হিসেবে। নারীর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য তিনি বিবাহপ্রথা সংস্কার এবং নারীশিক্ষার উপর সমভাবেই প্রয়াসী ছিলেন।

৩. নারীশিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর সমাজমানসের পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছেন। সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং নারীদের অবচেতন সত্তা—উভয় ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর প্রত্যাশা করেছেন পরিবর্তন। তিনি মনে করেছেন, নারীশিক্ষা বিস্তার লাভ করলে উভয় ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। শিক্ষা লাভ করলে নারী অধিকার-সচেতন হয়ে উঠবে—তার মধ্যে জাগ্রত হবে নিজ সামর্থ্যবোধ—এটাই ভেবেছিলেন বিদ্যাসাগর।

৪. আধুনিক নারীবাদ ও জেন্ডারচেতনার আলোকে বিদ্যাসাগরের প্রয়াসকে ইতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করতে হয়। একথা স্বীকার করতেই হবে এ ধারায় আমাদের সমাজে কাজটা প্রথম শুরু করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি শুরু না করলে হয়তো আমরা আজ এতটা অগ্রসর হতে পারতাম না। পরিবর্তনটা আসে আস্তে-ধীরে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তনটা এখন সুস্পষ্ট। নারীশিক্ষার হার এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই নারী এখন তার সক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে। সন্দেহ নেই, এসব ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের সুদূরসঞ্চারী প্রভাব রয়েছে।

৫. বিদ্যাসাগর যেকালে নারীশিক্ষার কথা বলেছেন, একালে যদি সেদিকে তাকাই তাহলে বলতেই হবে তাঁর ভাবনা ও প্রয়াস ছিল অনেক প্রাগ্রসর। বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষাকে মানবমুখীন করতে চেয়েছেন। নারী যে মানুষ—নারীর চেতনায় এই বোধ সঞ্চারের চেষ্টা বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার প্রধান লক্ষণ। কিন্তু আমরা এত বছর পরেও সে-জায়গায় পৌঁছতে পারিনি। বিদ্যাসাগর যে-সব সামাজিক অপপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন, লেখনী ধারণ করেছেন, আমাদের সমাজে এখনো তা আছে। তাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তা তথা নারীর মুক্তি-বিষয়ক চিন্তাকে এখনো প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করি।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৮ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২২শে জুন, ২০২১)

১. বিষয়টিকে দুটো দিক থেকে বিবেচনা করা যায়। প্রথমত, নারীর কল্যাণের জন্য বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ চালু, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য আন্দোলন করেছেন; অন্যদিকে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বই লিখেছেন, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের কথা ভেবেছেন। বিদ্যাসাগরের এই দু'ধরনের প্রয়াসই ছিল কালের বিচারে অনেক অগ্রবর্তী ভাবনা।

২. প্রথমেই তো বললাম, বিদ্যাসাগর উভয় দিকেই জোর দিয়েছেন। বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে দু'টো প্রয়াসকে অভিন্ন সূত্রে দেখা প্রয়োজন। কেননা, দুটো বিষয় মূলত একটি অপরটির পরিপূরক।

৩. বাঙালি নারীর চেতনায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকারবোধ জাগ্রত করাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর অন্তর্গত সক্ষমতাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ভেবেছেন, লেখাপড়া জানা থাকলে নারী আত্মনির্ভর হতে পারবে—তার মধ্যে দেখা দেবে দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণতা। এটাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার মূল কথা।

৪. নারীর অধিকার নিয়ে বাঙালি সমাজে প্রথম সোচ্চার হয়েছেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর আন্দোলনের ফলে বিধবা নারীর জীবন বাঁচলো বটে, কিন্তু সে গিয়ে পড়লো পুরুষতন্ত্রের ভিন্ন এক বন্ধনে। বিদ্যাসাগর এই বিধবা নারীদের বিয়ের জন্য আন্দোলন করলেন। ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বলে বিদ্যাসাগরের রক্ষণশীলতার দিকে যাবার সম্ভাবনা ছিল বিপুল—কিন্তু তিনি রক্ষণশীলতার পথে না গিয়ে নারীর সার্বিক মুক্তির জন্য বাংলার বিবাহপ্রথা সংস্কারের জন্য আন্দোলন করলেন। তাঁর সময়ে নারীর মুক্তির জন্য এভাবে কেউ এগিয়ে আসেননি। বলতে গেলে বাংলাদেশে আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে বিদ্যাসাগরের হাতে। সে-বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের প্রয়াসকে আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনের সমগোত্রীয় বলেই আমি মনে করি।

৫. প্রায় পৌনে দু'শ বছর আগে বাংলার নারীদের সার্বিক মুক্তির জন্য বিদ্যাসাগর নানামাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আজ একুশ শতকের চোখ দিয়ে বিদ্যাসাগরের কাজের দিকে তাকালে তাঁর আন্দোলনকে ঐতিহাসিক উদ্যোগ বলে স্বীকার করতেই হয়। একালের নারীবাদীদের মতো বিদ্যাসাগর নারীর চেতনায় দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণতা আনয়নের চেষ্টা করেছেন। শাস্ত্র দিয়ে তিনি শাস্ত্রকে খণ্ডন করে নারীমুক্তির পথ দেখিয়েছেন, বিস্তার লাভের চেষ্টা করেছেন নারীশিক্ষা। সময়ের প্রেক্ষাপটে এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না বিদ্যাসাগরের। বিদ্যাসাগর যে-সব কারণে বাঙালি নারীর জন্য আন্দোলন করেছেন, আমাদের সমাজে তা এখনও বহমান। এখনো বাঙালি নারীর শিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত, নারীমুক্তির পথে অনেক সামাজিক বাধা ক্রিয়াশীল। সে-বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি-বিষয়ক সমস্ত কর্মধারা এখনো প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি বলেই আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-৯ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১০ই জুলাই, ২০২১)

১. বাঙালি সমাজে যখন নানামাত্রিক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং সামাজিক-পারিবারিক অপপ্রথায় আচ্ছন্ন, তখন আলোকিত মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর কাজ প্রধানত ছিল সমাজসংস্কারমূলক। আবার গভীর অর্থে তা ছিল প্রধানত নারীর কল্যাণধর্মী। যে-সময়ে নারীর মুক্তির জন্য কেউ জেগে ওঠেনি, তখন জেগেছেন বিদ্যাসাগর। সমাজের উন্নতির জন্য নারীর মুক্তিকেই তিনি তাঁর মূল কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

২. বিদ্যাসাগর দুটো ক্ষেত্রেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে প্রধানত তিনি বাংলার বিবাহপ্রথা সংস্কারের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৩. নারীর সার্বিক মুক্তিই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা ভাবনার মূল লক্ষ্য। বাঙালি নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ছিল একেবারে অচেতন। পারিবারিক-সামাজিক বাধা ও বিধানকে তারা অবলীলায় মান্য করে আসছিল। শিক্ষার মাধ্যমে নারীর চেতনায় এ সূত্রেই বিদ্যাসাগর অভিঘাত তুলতে চেয়েছেন। নারীদের বিদ্যাসাগর অধিকার-সচেতন এবং আত্মমর্যাদাশীল মানুষ হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। আমার বিবেচনায় এটাই বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য।

৪. নারীবাদ বা জেন্ডারধারণা বিদ্যাসাগরের সময় ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ নিজের ভাবনা থেকে নারীর কল্যাণের জন্য বাংলার বিবাহপ্রথা পরিবর্তনের কথা বলেছেন, গ্রহণ করেছেন নারীশিক্ষা প্রসারের বহুমাত্রিক উদ্যোগ। এখন একালের নারীবাদ বা জেন্ডারধারণার চোখ দিয়ে তাকালে বিদ্যাসাগরকে অবশ্যই নারীবাদের সমর্থক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। এ কালের নারীবাদীদের কাজের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের কাজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

৫. এ কালেও বিদ্যাসাগর তাঁর কালের মতোই আছেন প্রাসঙ্গিক। তাঁর উদ্দেশ্যসমূহ এখনো অপূর্ণই আছে অনেক ক্ষেত্রে। বাঙালি হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ এখনো প্রায় অসম্ভব একটি বিষয়। যদিও বিধবাবিবাহ আইন আছে, তবু সামাজিক বাধার জন্য এদিকে কেউ অগ্রসর হতে চায় না। বহুবিবাহ চলছে, আছে বাল্যবিবাহেরও ব্যাপক প্রবণতা। করোনার এই মহামারীর সময় প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনেক বাল্যবিবাহের খবর পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা নিরোধ আইন প্রণয়নে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর এই বিধবাদের বিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও পদে পদে বাধা। সামাজিক পুরুষতন্ত্র কিছুতেই নারীর শিক্ষালাভকে ভালো চোখে দেখছে না। বিদ্যাসাগর যেসব সামাজিক অপপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, আমাদের সমাজে এখনো তা চালু আছে। সে-

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনায় উনিশ শতকে বসে বিদ্যাসাগর যা ভেবেছেন এবং যে-সব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা এখনো প্রাসঙ্গিক।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-১০ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৪ঠা জুলাই, ২০২১)

১. বিদ্যাসাগর সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে বাঙালি নারীর দিকে তাকিয়েছেন। সামাজিক নানা বাধা নারীকে যেভাবে অবমূল্যায়ন করেছে, বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। বাংলায় বিবাহপ্রথার নানামাত্রিক কুফল তিনি শনাক্ত করেছেন। প্রচলিত শাস্ত্র-বিধিকে তিনি শাস্ত্র দিয়েই খণ্ডন করেছেন। সে-সময়ের প্রেক্ষাপটে এছাড়া বিদ্যাসাগরের আর কোনো উপায় ছিল না। বাঙালি নারীর সার্বিক মুক্তিই ছিল বিদ্যাসাগরের সকল চিন্তা ও সাধানার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য।

২. দুটো দিকেই বিদ্যাসাগর সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজসংস্কার তথা বিবাহপ্রথা সংস্কার নারীশিক্ষার পথ সুগম করবে, আবার নারীশিক্ষা সমাজসংস্কারের পথকে সহজ করবে—এভাবেই ভেবেছিলেন বিদ্যাসাগর। দুটো ধারণাই ছিল বিদ্যাসাগরের কাছে সহায়ক-শক্তি।

৩. নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনই ছিল বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা চিন্তার মূল লক্ষ্য। নারীর অবচেতনায় যে কুসংস্কার এবং অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে, বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষার মাধ্যমে তা দূর করতে চেয়েছেন। নারীকে শিক্ষা দিয়ে তিনি মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছেন। এটাই তাঁর নারীশিক্ষা চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য।

৪. বিদ্যাসাগরের সময় আজকের নারীবাদী চিন্তার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এ কালের নারীবাদীদের ধারণার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চিন্তার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কালে বাঙালি নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান ছিল খুবই শোচনীয়। নারীর আত্মমর্যাদা বলে কিছু ছিল না। নারী যে মানুষ, তারও যে আছে সবকিছুতে অধিকার—এ কথা সমাজে ছিল অস্বীকৃত। বিদ্যাসাগর নারীর এইসব দুরবস্থা লাঘবের জন্য আন্দোলন করেছেন, নারীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। তাই এ কথা বলতেই পারা যায় যে, এ কালের নারীবাদীদের কাজের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কাজের মধ্যে রয়েছে অনেক অন্তর্গত সাদৃশ্য।

৫. উনিশ শতকের সমাজ প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর নারীর মুক্তির জন্য নানা ধরনের কাজ করেছেন। তাঁর সমকালে নারীসমাজের যে দুর্গতি, আমাদের সমাজে এখনো তা লক্ষ করা যায়। নারীশিক্ষায় এখনো অনেক বাধা। অনেক পরিবার কন্যা-সন্তানকে শিক্ষা দিতে অনাগ্রহী। অনেকেই মনে করে বিয়ে দেওয়াই তাদের মূল কাজ, তাই কন্যাশিশুকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার নেই। এমনও দেখা যায়, নারী শিক্ষা লাভ করতে চাইলেও তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন কিংবা স্বামী সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজে এখনো

প্রবলভাবে বিদ্যমান। আইন আছে বটে, তবে তা শোনার লোক নেই। প্রশাসনও অনেক সময় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। শহরে-গ্রামে নারীশিক্ষার্থীর উপরে বখাটে ছেলেদের উৎপাত আর অনাচারের কথা তো বলতে গেলে প্রতিদিনই পত্রিকায় দেখতে পাই। এ কারণেও নারীশিক্ষা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এসব বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা ও কর্মসূচি এখনো প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী-১১ (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৮ই জুলাই, ২০২১)

১. উনিশ শতকে বেথুন সাহেবের পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলাদেশে নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা নিয়েছেন, তা শুধু বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার নয়, বাঙালি জাতিসত্তার শিক্ষা বিস্তারে পরিপূর্ণতার প্রথম ও সার্থক প্রয়াস। তাঁর উদ্যোগে উনিশ শতকে একদল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অর্থাৎ দক্ষিণাচরণ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ-এর সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলার জাতি সংস্কৃতির প্রগতি হল, প্রগতি হল নারী জাতির, সমাজের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেল নারী সমাজ।

২. নারীর সামাজিক মুক্তির জন্য দু'টি কাজই মহৎ ও যুক্তিযুক্ত এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাল্যবিধবাদের বিবাহ প্রথা চালু করে (১৮৫৬-আইন করে) হিন্দু বিধবা মেয়েদের নতুন করে সমাজ-সংসারে বাঁচার পথ দেখালেন তিনি। তেমনি সমাজে স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করবার জন্য তথা পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার অপব্যবহারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য নারীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কাজেই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ত্যাগ ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠা করায় অবশ্যই তাঁর গুরুত্ব বেশি ছিল।

৩. আমি মনে করি, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙালি নারীদের শিক্ষার অঙ্গনে এনে গ্রাম থেকে শহরের বোবা নারীর মুখে ভাষা দিলেন। নারীর সামাজিক ও মানসিক মুক্তির পথ উন্মোচন করে দিলেন। নারী-পুরুষের সমাজ-সংসারে সমমর্যাদায় অবতীর্ণ করলেন। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হবার সুযোগ তিনি করে দিলেন—এই স্ত্রীশিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে।

৪. সমগ্র বিশ্বে Modern Feminism-এর অবশ্যই একটি তাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে। অবশ্যই তা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়কাল উনিশ শতক। বিদ্যাসাগর উনিশ শতকে বাঙালি নারীকে সামাজিক মুক্তি দিতে গিয়ে অবশ্যই সেদিনের প্রেক্ষিতকে বেশি জোর দেবেন এটাই স্বাভাবিক। কাজেই আমাদের মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের সমাজ পটভূমি বা সামাজিক সমস্যা ও একুশ শতকের আর্থ সামাজিক পটভূমি কখনই

Dhaka University Institutional Repository

এক নয়। সুতরাং সময়কাল ও সময়ের নিরিখে সেদিনে বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যাধুনিক এবং তাঁর কর্মকাণ্ড অবশ্যই সেই প্রেক্ষিতে সেদিনেও ছিল অত্যাধুনিক।

৫. অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। কারণ, সেদিনে বিদ্যাসাগর ও সমকালের ব্রাহ্মসমাজের যুবকরা ও অন্যান্য প্রগতিশীল সমাজ গঠনের পক্ষের মানুষজনের যে মহৎ কর্মপ্রচেষ্টা তারই ফলশ্রুতি তো আজকের তথা একুশ শতকের আধুনিক শিক্ষিতা নারী ও আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা। নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, কর্মজগৎ সামাজিক সম্মান ও সমাজ সংস্কৃতি সবই আজই বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কাজের প্রাসঙ্গিকতা ও সার্থকতা।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

মূলগ্রন্থ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪। *রচনাবলী*—১-২ খণ্ড (সম্পাদক : তীর্থপতি দত্ত), কলকাতা : তুলি-কলম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯৯৮। *অপূর্ব্ব ইতিহাস* (সম্পাদক : বিজিতকুমার দত্ত), কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২০০৪। *রচনাসংগ্রহ* (সম্পাদক : মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান), ঢাকা : সময় প্রকাশন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২০০৮। *আত্মজীবনী, চিঠিপত্র ও উইল* (সম্পাদক : সফিউদ্দিন আহমদ), ঢাকা : রাফাত পাবলিকেশন্স।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২০০৯। *বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী* (সম্পাদক : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য), কলকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২০১০। *রচনাসম্ভার* (সম্পাদক : প্রমথনাথ বিশী), কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২০১১। *নির্বাচিত রচনা : সাহিত্য ও সমাজ* (সম্পাদক : অশ্রুকুমার সিকদার ও দেবেশ রায়), শিলিগুড়ি : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২০১১। *রচনাসম্ভার—১-৩ খণ্ড* (সম্পাদক : গোপাল হালদার), কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২০১২। *রচনাবলী*—১-২ খণ্ড (সম্পাদক : প্রফুল্লকুমার পাত্র), কলকাতা : নবপ্রভা পাবলিকেশন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ২০১৩। *রচনাসংগ্রহ* (সম্পাদক : মিলন দত্ত), কলকাতা : ইউনিভার্সাল বুক ডিপোর্ট।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক-গ্রন্থ

অতুল সুর, ১৯৮৪। *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, কলকাতা : সাহিত্যলোক।

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১। *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশনা।

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ, ১৯৭৩। *যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর*, কলকাতা : তুলি-কলম।

অমিয়কুমার সামন্ত, ২০১২। *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, ১৯৭১। *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা : এম. সি. সরকার।

অরবিন্দ পোদ্দার, ১৯৭৩। *ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঠক*, কলকাতা : গ্রন্থবিতান।

অরুণ চক্রবর্তী, ১৯৭৮। *শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসার*, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংঘ।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭০। *বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর*, কলকাতা : মণ্ডল বুক হাউস।

আনিসুজ্জামান, ২০০০। *বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ।

আবুল মোমেন, ২০১৪। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*, ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন।

আবু হামিদ লতিফ, ২০০৩। *শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা*, ঢাকা : প্যাপিরাস।

আব্দুল মালেক, ১৯৯২। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ* (অপ্রকাশিত এম. এড. অভিসন্দর্ভ), ঢাকা : শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আব্দুল মালেক, ২০১২। *বাঙালির সমাজচিন্তায় শিক্ষা প্রসঙ্গ*, ঢাকা : বাংলা প্রকাশ।

আব্দুল মালেক, মরিয়ম বেগম, ফখরুল ইসলাম ও শেখ শাহবাজ রিয়াদ, ২০০৭। *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

আমিনুল ইসলাম, ১৯৮৯। *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

আয়শা খানম, ২০০৯। *বাংলাদেশের নারী আন্দোলন : প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, ঢাকা : ঐতিহ্য।

আয়শা খানম ও সীমা মোসলেম (সম্পাদক), ২০১১। *সুফিয়া কামাল স্মারক বক্তৃতা*, ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

আয়শা খানম, ২০১৫। *নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের পথে*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

ঈশ্বর গুপ্ত, ১৯৬৯। *কবিতাসংগ্রহ* (সম্পাদক : মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা), ঢাকা : বর্ণমিছিল।

এস. কে. বোস, ১৯৭২। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*, নয়াদিল্লী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

ঋষি দাস, ১৯৭১। *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা : অশোক প্রকাশন।

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০০। *নারী শ্রেণী ও বর্ণ : নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান*, কলকাতা : ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া।

কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, ১৯৭৮। *আত্মজীবনচরিত*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

কৈলাসবাসিনী দেবী, ১৭৮৭ শকাব্দ। *হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি*, কলকাতা : শিক্ষা সংসদ।

খন্দকার রেজাউল করিম, ২০১৬। *বিদ্যাসাগর*, ঢাকা : মুক্তধারা।

গোলাম মুরশিদ (সম্পাদক) ২০১১। *বিদ্যাসাগর*, ঢাকা, শোভা প্রকাশ।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০। *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা, স্টান্ডার্ড পাবলিশার্স।

চিত্তরঞ্জন কানদার, ১৯৯৭। *আগ্নেয় পুরুষ বিদ্যাসাগর*, মেদিনীপুর : শুভেন্দুবিকাশ রায়।

জয়ন্তী মণ্ডল, ২০১৪। *উনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা : দে পাবলিকেশন্‌স।

দীনেশচন্দ্র সেন, ১৯৯৩। *বৃহৎবঙ্গ*-১ম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৪৭। *ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বছরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত*, কলকাতা : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

দৌলত উজির বাহরাম খান, ১৯৮৭। *লায়লী-মজনু* (আহমদ শরীফ সম্পাদিত), ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

ধনঞ্জয় ঘোষাল (সম্পাদক), ২০১৫। *নবচেতনায় বঙ্গনারী : প্রাক্‌-স্বাধীনতা পর্ব*, কলকাতা : আশাদীপ।

নমিতা চক্রবর্তী, ১৯৮০। *বঙ্গদেশে শিক্ষাপ্রসার*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা।

Dhaka University Institutional Repository

নির্মল দাশ (সম্পাদক), ২০১৪। *মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ,* কলকাতা : পারুল প্রকাশনী।

নীহাররঞ্জন রায়, ১৯৯৫। *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব,* কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

প্রদীপ রায়, ১৯৮৬। *বিদ্যাসাগর : সামাজিক ব্যক্তিত্ব,* কলকাতা : বুক ট্রাস্ট।

বদরুদ্দীন উমর, ১৯৯০। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ,* ঢাকা : চলন্তিকা বইঘর।

বিনয় ঘোষ, ২০১১। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ,* কলকাতা : ওরিয়েন্ট ব্লাকসোয়ান।

বিনয় ঘোষ, ১৯৯১। *বাদশাহী আমল,* কলকাতা : মডার্ন পাবলিকেশন্স।

বিনয় ঘোষ, ১৯৬৮। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,* ঢাকা : বুক ক্লাব।

বিনয় ঘোষ, ২০০০। *বাংলার বিদ্বৎসমাজ,* কলকাতা : প্রকাশ ভবন।

বিনয়ভূষণ রায়, ১৯৯৮। *অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা,* কলকাতা : মডার্ন পাবলিশার্স।

বিপ্রদাস বড়ুয়া, ১৯৮৮। *বিদ্যাসাগর,* ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।

বিশ্বনাথ দে (সম্পাদক), ১৯৮৯। *বিদ্যাসাগর স্মৃতি,* কলকাতা : সাহিত্যম্।

বিহারীলাল সরকার, ২০১৬। *বিদ্যাসাগর,* কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৫। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর* (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—২য় খণ্ড), কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৫। *মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা,* কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৭। *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*—২য় খণ্ড, কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৭। *কলিকাতা কমলালয়,* কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

মাহমুদা ইসলাম, ২০০২। *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন,* ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ১৯৫৮। *কবিকঙ্কণ চণ্ডী,* কলকাতা : বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড।

Dhaka University Institutional Repository

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৭৭। *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

মো. আব্দুল্লাহ আল মাসুম, ২০০৮। *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা : সমস্যা ও প্রসার (১৮৭১-১৯৪১)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, ২০০৭। *বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি (১৮৮৫-১৯২১)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

মোঃ মতিউর রহমান, ২০০০। *বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৭৬। *চারিত্রপূজা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

রমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক-অনুবাদক), ১৯৮৬। *ঋগ্বেদ*, কলকাতা : ঈশ্বরচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৯৪।

রামমোহন রায়, ১৯৮৭। *রামমোহন-রচনাবলী*-১ম খণ্ড, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

রামশরণ শর্মা, ১৯৮৯। *প্রাচীন ভারতে শূদ্র*, কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী।

রাসসুন্দরী দেবী, ১৯৮১। *আমার জীবন* (নরেশচন্দ্র জানা, মানু জানা, ও কমলকুমার সান্যাল সম্পাদিত *আত্মকথা* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সংকলিত), কলকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং।

রোখসানা পারভীন চৌধুরী, ২০১৮। *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, হুমায়ুন আজাদ এবং সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্যে নারীবাদী ভাবনার প্রতিফলন*, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রোমিলা থাপার, ২০০২। *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান।

শরীফা খাতুন, ১৯৯৯। *দর্শন ও শিক্ষা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

শিপ্রা সরকার, ২০২১। *বাংলাদেশের একটি গ্রাম : জাতিবর্ণ ব্যবস্থা*, ঢাকা : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী, ২০০৩। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা : রত্নাবলী।

শিবরতন মিত্র, ১৯১৭। *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহ্‌মিনা আখতার, জাহান আরা বেগম, ১৯৯৮। *নারীশিক্ষা : উদ্ভব ও বিকাশ*, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ।

সনৎকুমার গুপ্ত, শঙ্খমালা বসাক, সোমা চক্রবর্তী, ১৯৯৮। *বিদ্যাসাগর নাই*, কলকাতা : বিশ্বকোষ পরিষদ।

সন্তোষকুমার অধিকারী, ১৯৮৭। *বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি ও বর্ণপরিচয়*, কলকাতা : অনন্যা।

সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, ২০১০। *অন্দরে অন্তরে : উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা*, কলকাতা : স্ত্রী।

সফিউদ্দিন আহমদ, ২০১৫। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা*, ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), ১৯৯৩। *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

সুকুমার সেন, ১৯৯৮। *বাংলা সাহিত্যে গদ্য*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সুকোমল সেন, ১৯৯৩। *ভারতের সভ্যতা ও সমাজ বিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ*, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

সুনন্দা ঘোষ, ২০০১। *শিক্ষাতত্ত্বের ভূমিকা*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ।

সুধীরকুমার ঘোষ, ১৯৮৫। *দর্শন-জিজ্ঞাসা*, কলকাতা : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

সুশীল রায়, ২০০৩। *শিক্ষাতত্ত্ব*, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী।

সুশীল রায়, ২০০৩। *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন*, কলকাতা : সোমা বুক এজেন্সী।

সুশোভন সরকার, ২০০৪। *বাংলার রেনেসাঁস*, কলকাতা : দীপায়ন।

সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদক), ২০০৮। *জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

সোনিয়া নিশাত আমিন, ২০০২। *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন (১৮৭৬-১৯৩৯)*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, ১৯৭৬। *বাঙালি জীবনে বিদ্যাসাগর*, কলকাতা : সাহিত্যশ্রী।

Dhaka University Institutional Repository

স্বপন বসু, ২০০১। *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭১। *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর*, নয়াদিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি

হুমায়ুন আজাদ, ২০০৪। *নারী*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

সহায়ক-প্রবন্ধ

অলোক রায়, ২০১৪। "মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহচর-সহযোগী", *মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদক : নির্মল দাশ), কলকাতা : পারুল প্রকশনী।

অশোককুমার রায়, ২০১৪। "স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তারে বেথুন-মদনমোহন সহযোগ", *মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদক : নির্মল দাশ), কলকাতা : পারুল প্রকাশনী।

আব্দুল মালেক, ২০০৯। "উনিশ শতকে বাংলার শিক্ষাচিন্তা ও সমাজসংস্কার ভাবনার র‍্যাডিকেল ধারা : পর্যালোচনা", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* (সম্পাদক : আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী), সংখ্যা ৯০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গোপাল হালদার, ১৯৯৪। "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর", *পশ্চিমবঙ্গ* (সম্পাদক : দিব্যজোতি মজুমদার), বিদ্যাসাগর সংখ্যা, বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ১২-১৫, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৪, কলকাতা : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত।

তপতী বসু, ১৯৯১। "বাঙালি মেয়েদের লেখাপড়া", শারদীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা।

নীলকণ্ঠ মজুমদার, ১৮৮৯। "নারীধর্ম্ম", *বেদব্যাস*, বৈশাখ ১২৯৬, কলকাতা।

পবিত্র সরকার, ২০২০। "কতটুকু আছেন, কতটুকু নেই : বিদ্যাসাগর", *কালি ও কলম* (সম্পাদক : আবুল হাসনাত), সপ্তদশ বর্ষ : নবম-দশম সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০, ঢাকা।

প্রবোধচন্দ্র সেন, ১৯৯৪। "শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়", *পশ্চিমবঙ্গ* (সম্পাদক : দিব্যজোতি মজুমদার), বিদ্যাসাগর সংখ্যা, বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ১২-১৫, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৪, কলকাতা : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রীতিকুমার মিত্র, ১৯৯৩। "হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৭০৪-১৯৭১*—৩য় খণ্ড, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

ভূদেব চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৯। "সম্পাদকীয়", *বেদব্যাস*, বৈশাখ ১২৯৬, কলকাতা।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ২০১৪। "স্ত্রীশিক্ষা", *মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদক : নির্মল দাশ), কলকাতা : পারুল প্রকাশনী।

মৃণালকান্তি চক্রবর্তী, ২০১৪। "মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও তৎকালীন পল্লিসমাজ", *মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদক : নির্মল দাশ), কলকাতা : পারুল প্রকাশনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬৩। "বিদ্যাসাগর", *বিশ্বভারতী পত্রিকা* শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, শান্তিনিকেতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০২। "হিন্দুবিবাহ", *রবীন্দ্র-রচনাবলী-ষষ্ঠ খণ্ড*, কলকাতা : বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৯৪। "বিদ্যাসাগর ও বিদ্যাসাগর-স্মৃতি", *পশ্চিমবঙ্গ* (সম্পাদক : দিব্যজোতি মজুমদার), বিদ্যাসাগর সংখ্যা, বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ১২-১৫, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৪, কলকাতা : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত।

রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৯৪। "সংস্কৃত পণ্ডিত ও বাংলার নবজাগরণ", *পশ্চিমবঙ্গ* (সম্পাদক : দিব্যজোতি মজুমদার), বিদ্যাসাগর সংখ্যা, বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ১২-১৫, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৪, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত।

রাধারমণ মিত্র, ১৯৯৪। "কলিকাতায় বিদ্যাসাগর", *পশ্চিমবঙ্গ* (সম্পাদক : দিব্যজ্যোতি মজুমদার), বিদ্যাসাগর সংখ্যা, বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ১২-১৫, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৪, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত।

রাশিদা আখতার খানম, ২০০৬। "নারীবাদী চিন্তা ও মতিজানের মেয়েরা", *উলুখাগড়া* (সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন), প্রথম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, ঢাকা।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, ২০১৪। "বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি", *মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদক : নির্মল দাশ), কলকাতা : পারুল প্রকাশনী।

Dhaka University Institutional Repository

লীনা সেন, ২০১৪। "মদনমোহন তর্কালঙ্কার : সংস্কৃত কলেজ ও বেথুন স্কুল-সম্পর্ক", *মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদক : নির্মল দাশ), কলকাতা : পারুল প্রকাশনী।

শক্তি মণ্ডল, ২০১৪। "একুশ শতকে পশ্চিমবঙ্গে নারী সাক্ষরতা", *মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদক : নির্মল দাশ), কলকাতা : পারুল প্রকাশনী।

সনৎকুমার নস্কর, ২০১৪। "মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা", *মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারকগ্রন্থ* (সম্পাদক : নির্মল দাশ), কলকাতা : পারুল প্রকাশনী।

সনৎকুমার সাহা, ২০১১। "রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর সমঅংশীদারিত্ব : রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি", আয়শা খানম ও সীমা মোসলেম সম্পাদিত *সুফিয়া কামাল স্মারক বক্তৃতা* শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ, ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

সরস্বতী রানী পাল, ২০১৬। "ভগবতী দেবী : বিদ্যাসাগর জননী", *ভারত বিচিত্রা*, জুলাই সংখ্যা, ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা।

সুদিন চট্টোপাধ্যায়, "অধমর্ণ বিদ্যাসাগর", *পশ্চিমবঙ্গ* (সম্পাদক : দিব্যজ্যোতি মজুমদার), বিদ্যাসাগর সংখ্যা, বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ১২-১৫, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৪, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত।

সোনালী রায়, ২০১৫। "ব্রাহ্ম সমাজ ও বাঙালি মেয়ে", *নবচেতনায় বঙ্গনারী : প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব* গ্রন্থভুক্ত (সম্পাদক : ধনঞ্জয় ঘোষাল) প্রবন্ধ, কলকাতা : আশাদীপ।

হরিশচন্দ্র কবিরত্ন, ১৯২৫। "সেকালের সংস্কৃত কলেজ", *প্রবাসী*, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৩২, কলকাতা।

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Alice Abel Kemp, 1994. *Women's Work : Degraded and Devalued,* London : Prentice-Hall.

A. F. Salahuddin Ahmed, 1987. *Bangladesh : Tradition and Transformation,* Dhaka : University Press Limited.

A. S. Altekar, 1991. *The Position of Women in Hindu Civilization,* Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited.

Amatya Sen, 1999. *Development as Freedom,* New York : K. Knopf.

Arabinda Poddar, 1970. *Renaissance in Bengal, Quests and confrontations–1800-1860,* Simla : Institute of Advanced Study.

Ashim Mukhopadhyay (editor), 1993. *The Golden Book of Vidyasagar,* Culcutta : All Bengal Vidyasagar Death Centenary Committee.

Asok Sen, 2016. *Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones,* New Delhi : Permanent Black.

Carol Hanisch, 1970. *The Personal is Political,* New York : Ballentine Books.

Clara Zetkin, 1948. *Towards a Socialist Feminism,* Moscow : Progress Publishers.

C. H. Colley, 1981. *Social Organization,* Bombay : Oxford University Press.

David Kopf, 1979. *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind,* Princeton : Princeton University Press.

Eleanor Flexner, 1996. *Century of Struggle : The Woman's Rights Movement in the United States,* New York : The Belknap Press.

Estelle B. Freedman, 2003. *No Turning Back : The History of Feminism and the Future of Women,* New York : Ballantine Books.

Friedrich Engels, 1970. *The Origin of the Family, Private Property, and the State* (Editor : Eleanor Burke Leacock), New York : International Publishers.

Ghulam Murshid, 1983. *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization (1849-1905),* Rajshahi : Sahitya Samsad.

Humaun Kabir, 1959. *Education in New India,* London : Allen and Unwin.

James Long (editor), 1968. *Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar,* London : Macmillan and Company.

Dhaka University Institutional Repository

Jame Lothian Murray, Rick Linden, and Diana Kendall, 2017. *Sociology in Our Times,* Toronto : Nelson Education Ltd.

J. K. Mazamder, 1973. *Raja Rammohan Roy and Progressive Movements in India,* Bombay : Popular Prokashan.

John Dewey, 1916. *Democracy and Education,* New York : Simon and Schuster.

John McLeod, 2000. *Beginning Postcolonialism,* Manchester : Manchester University Press.

John Stuart Mill, 2012. *The Subjection of Women,* London : Longmans, Green, Reader and Dyer.

Judith Butler, 2004. *Undoing Gender,* New York : Routledge.

Karl Marx, 1990. *Capital*-Vol. 1 (translated by B. Fowkes), London : Penguin Classics.

Kate Millet, 1978. *Sexual Politics,* London : Abacus.

Kira Cochrane, 2013. *All the Rebel Women : The Rise of the Fourth Wave of Feminism,* London : Guardian Books.

Leela Gandhi, 1998. *Postcolonial Theory : A Critical Introduction,* New Delhi : Oxford University Press.

Martin Heidegger, 1964. *Discourse of Thinking,* London : Routledge.

Mary Wollestonecraft, 1983. *A Vindication of the Rights of Woman* (edited by Miriam Brody), London : Penguin Books.

Muhammad Abdur Rahim, 1967. *Social and Cultural History of Bengal*-Vol. II, Karachi : Pakistan Publishing House.

Nelson Mandela, 1994. *Long Walk to Freedom,* London : Little Brown and Co.

R. C. Dutt, 1962. *Cultural Heritage of Bengal,* Calcutta : Punthi Pustak.

R. C. Dutt, 1977. *A History of Civilization of Ancient India*—vol. 1, New Delhi : Oxford India Limited.

Shulamith Firestone, 1982. *The Dialectic of Sex : The Case for Feminist Revolution*, New York : William Morrow and Company.

Simone de Beauvoir, 1974. *The Second Sex* (edited by H. M. Parshley), London : Penguin Books.

Subal Chandra Mitra, 1975. *Iswar Chandra Vidyasagar : A Story of His Life and Work*, New Delhi : Oxford University Press.

Sumit Sarkar, 1979. *On the Bengal Renaissance*, Calcutta : Papyrus.

Sunanda Ghosh, 2006. *Bethune : His School and Nineteenth Century Bengal*, Calcutta : Progressive Publishers.

Suzanne Marilley, 1996. *Women's Suffrage and the Origins of Liberal Feminism in the United States–1820-1920*, Harvard : Harvard University Press.

Syed Nurullah and J. P. Naik, 1949. *A Student's History of Education in India*, London : Macmillan and Co. Limited.

S. Gemie, 1996. *Anarchism and Feminism : A Historical Survey*, London : Longman, Green, Reader and Dyer.

Ti-Grace Atkinson, 2000. *Radical Feminism*, New York : NewYork University Press.

United Nations, 1995. United Naitons & The Advancement of Women (1945-1995). New York : United Nations Blue Book Series.

Usha Chakraborty, 1973. *Conditon of Bengali Women around 2nd half of the 19th Century*, Calcutta : The Author.

Vincent A. Smith, 1961. *The Oxford History of India*, London : Oxford University Press.

William Adam. 1995. *Peoples of the State of Education in Bengal*, Kolkata : University of Calcutta.

সহায়ক ইংরেজি প্রবন্ধ

Anjashi Sarkar, 2020. "The Polymath Verrus Tradition : Iswar Chandra Vidyasagar and His Tryst with Humanism", Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), vol. 65(2), Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh.

Asit Kumar Bandyopadhyay, 1993. “Vidyasagar and Bengali Prose” in *The Golden Book of Vidyasagar* (editor : Ashim Mukhopadhyay), Calcutta : All Bengal Vidyasagar Death Centenary Committee.

Barbara Ehrenreich, 1976. “What is Socialist Feminism?” in *WIN Magazine*, New York.

B. Cassidy, R. Lord and N. Mandell, 2001. “Silenced and Forgotten Women : Race, Poverty, and Disability” in *Feminist Issues : Race, Class, and Society* (editor : Nancy Mandell), Toronto : Prentice Hall.

Jo-Anne Dillabough and Madeleine Arnot, 2001. “Feminist Sociology of Education : Dynamics, Debates and Directions” in J. Demaine (editor), 2001. *Sociology of Education Today,* London : : Palgrave Macmillan.

Judith Butler, 1988. “Performative Acts and Gender Constitution : An Essay in Phenomenology and Feminist Theory, *Theatre Journal,* Vol. 40, No. 4, London.

Julie Bindel, 2017. “Kate Millett Obituary”, London : *The Guardian,* Dated : 09.07.2017

Madeleine Arnot, 2007. “Education Feminism, Gender Equality and School Refrom in Late Twentieth Century England” in R. Teese, S. Lamb and M. Durn-Bellet (eds.), 2007. *International Studies in Educational Inequality : Theory and Policy*—vol. 2, London : Springer.

Miriam Williford, 1975. “Bentham on the Rights of Women”, *Journal of the History of Ideas*, London.

P. A. Cain, 1993. “Feminism and the Limits of Equality” in *Feminist Legal Theory : Foundation* (editor : D. K. Weisberg), Philadelphia : Temple University Press.

Ruby Maloni, 1993. “Iswar Chandra Vidyasagar and the Changing Status of Women in Bengal” in *The Golden Book of Vidyasagar* (editor : Ashim Mukhopadhyay), Calcutta : All Bengal Vidyasagar Death Centenary Committee.

Rabindra Kumar, 2017, “Ishwar Chandra Vidyasagar, Women’s Education and Empowerment : An Overview”, *Bisiness Economics,* Kolkata.

Dhaka University Institutional Repository

Sudhir Kumar Gongopadhyay, 1993. "*The Long Walk*" in *The Golden Book of Vidyasagar* (editor : Ashim Mukhopadhyay, Calcutta : All Bengal Vidyasagar Death Centenary Committee.

Dictionary

Cambridge Dictionary, 2017. London : Cambridge University Press.

Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2000. London : Oxford University Press.

ওয়েব-সূত্র

www.businesseconomics. in

https : // www. definitions.net

www.tandfonline.com

www.quora.com

www.unesco.org

www. unwomen.org

www.isb-global.com